বৈজ্ঞানিক জল-চিকিৎসা

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জল-চিকিৎসকগণের পদ্ধতি অনুযায়ী
জল, মাটি, উত্তাপ, বায়ু, আলো, পথ্য ও উপবাস
প্রভৃতির সাহায্যে বিনা খরচে ঘরে বসিয়া
সকল রোগ চিকিৎসার বই

দ্বিতীয় সংস্করণ

'দৈনন্দিন রোগের জল চিকিৎসা' ও 'পুরাতন রোগের
জল-চিকিৎসা' প্রণেতা এবং বৈজ্ঞানিক
জল-চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠাতা

শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

মূল্য—১।০

প্রকাশক—

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন,

বৈজ্ঞানিক জল-চিকিৎসালয়,

১১৪।২ বি, হাজরা রোড, কালীঘাট, কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান—

১। গ্রন্থকারের নিকট,

১১৪।২ বি, হাজরা রোড, কালীঘাট, কলিকাতা

২। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যাণ্ড সন্স,

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ও কলিকাতার সকল প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়

প্রিণ্টার—শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনাথ ঘোষ,

জুবিলী আর্ট প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,

১৩ নং গোমেশ লেন, কলিকাতা।

নিবেদন

আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব ৺কৌশিকী রঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমেরিকা হইতে একখানি জল-চিকিৎসার বই আনাইয়াছিলেন। প্রাকৃতিক চিকিৎসার সাহিত্যে বইখানার আসন আজও অনেক উচ্চে। এই বইখানার নির্দেশ অনুসারে আমার পিতা আমাদের বাড়ীর সকলকে চিকিৎসা করিতেন। তাহাতে অতি বাল্যকালেই জল-চিকিৎসার সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হইবার আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তাহারপর বড় হইয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক চিকিৎসকগণের প্রায় সকলের পুস্তক পড়িয়াছি এবং তাঁহাদের প্রধান নির্দেশগুলি বহু ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া আশ্চর্য সাফল্য লাভ করিয়াছি। বাংলা দেশে জল-চিকিৎসা সম্বন্ধে যাহারা অভিজ্ঞ, তাঁহাদের কয়েকজনের চিকিৎসা-পদ্ধতি কার্যক্ষেত্রে দেখিবার সুবিধাও আমার হইয়াছে।

প্রাকৃতিক প্রণালীগুলির ভিতর যাহা বহু পরীক্ষিত এবং নিঃসন্দেহ-রূপে ফলদায়ক সেইগুলিই এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছি। প্রত্যেকটি পদ্ধতি হাতে কলমে করিতে গেলে, পর পর যেরূপ করা উচিত, প্রথম শিক্ষার্থীর সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া, তাহা বিশেষ সরল করিয়া লিখিতে চেষ্টা করিলাম।

এই পুস্তকের নাম জল-চিকিৎসা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহার নাম প্রাকৃতিক চিকিৎসা দেওয়াই উচিত ছিল। কারণ জল, মাটি, উত্তাপ, বায়ু, আলো, পথ্য ও উপবাস প্রভৃতি সকল প্রকার প্রাকৃতিক উপায়ের দ্বারা রোগ আরোগ্যের পদ্ধতিই এই পুস্তকে বিবৃত করা হইয়াছে। এ-দেশের লোকে প্রাকৃতিক চিকিৎসাকে জল-চিকিৎসা বলিয়া বোঝে। এই জন্য বাধ্য হইয়াই পুস্তকের এই নাম দিতে হইল।

দ্বিতীয় সংস্করণে বইখানি প্রায় সম্পূর্ণ ই নূতন করিয়া লিখিলাম। এই

পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হইবার পর বহু দুরারোগ্য রোগী চিকিৎসার জন্য আমার নিকট আসিয়াছে। এই সকল রোগীর চিকিৎসা ও আরোগ্যের বিবরণ কতকাংশে এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলাম। পুস্তকের শেষে একটা বিস্তৃত স্থচীও যোগ করিয়া দেওয়া হইল। এই সকল কারণে এই সংস্করণে বইখানি আকারে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং প্রায় ৪০ পৃষ্ঠা বড় হইয়া গেল। তথাপি মূল্য পূর্বের ন্যায় পাঁচসিকাই রাখিলাম।

এই চিকিৎসা বিধি আয়ত্ত করিতে এবং এই পুস্তকখানিকে ভাল করিতে, আমি কঠোর পরিশ্রম করিয়াছি। আমার এই পুস্তক দ্বারা দেশে প্রাকৃতিক চিকিৎসা প্রবর্তিত হইবার যদি অণুমাত্রও সাহায্য হয়, তবেই আমার শ্রম সার্থক হইবে। ইতি—

১৫ই ফাল্গুন, ১৩৪৫,
বৈজ্ঞানিক জল-চিকিৎসালয়,
১১৪।২বি, হাজরা রোড,
কালীঘাট, কলিকাতা।

শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বিষয়-সূচী

মা, তোমাকে দিলাম

বৈজ্ঞানিক জল-চিকিৎসা

.৭৫

—:০:—

প্রথম অধ্যায়

ঔষধের বিষক্রিয়া

[১]

মহাত্মা গান্ধী দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন,—আমরা দূরের জিনিসের বিষয় যতটা জানি, নিকটের জিনিস সম্বন্ধে ততটা খবর রাখি না। ইংলণ্ডের নদ, নদী ও পাহাড়ের নাম আমাদের কণ্ঠস্থ, কিন্তু নিজ জিলার বিষয় আমাদের কিছুই জানা নাই। আমরা চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্রাদির সংবাদ রাখি, কিন্তু আমাদের যে-দেহটি একান্ত কাছে, তাহার সম্বন্ধে আমরা খুব কম কথাই জানি।

অথচ পৃথিবীতে এই দেহ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান জিনিস কিছুই নাই। আমরা সকলেই দীর্ঘদিন এই দেহখানিকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাই। কিন্তু কেমন করিয়া দীর্ঘদিন বাঁচিয়া থাকা যায় আমরা তাহা জানি না। যে যন্ত্র চালায়, যন্ত্র সম্বন্ধে তাহার অনেকটা জ্ঞান থাকে। কিন্তু দেহ-যন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। আমরা জানি না, কেমন করিয়া দেহখানিকে সুস্থ রাখা যায়। রোগ তাড়াইবার জন্য প্রকৃতি আমাদের

দেহের ভিতর কি বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছে, সে-সম্বন্ধেও আমাদের কোন ধারণা নাই। দেহ সম্বন্ধে আমরা একান্ত অসহায়।

আমরা নিজেদের সর্বাপেক্ষা অসহায় মনে করি, যখন আমাদের রোগ হয়। তখন নিজেদের সাহায্য করিবার মত আমরা কিছুই করিতে পারি না। নিজের ভিতর যে ভগবান রহিয়াছেন, তাঁহাকে ভুলিয়া বাহিরে বাহিরে দেবতা খোঁজার মত আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির উপর নির্ভর না করিয়া বাহিরে বাহিরে তখন আমরা রোগ-মুক্তির উপায় খুঁজিয়া বেড়াই।

কিন্তু ভগবান এই দেহখানিকে এমন বিচিত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, ইহার ভিতরই আত্মরক্ষা ও রোগ আরোগ্য করিবার সকল ব্যবস্থা রহিয়াছে।

আমাদের চোখ, কান, নাক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি যেমন সর্বদাই আমাদিগকে পাহারা দেয়, আমাদের রক্তের ভিতর শ্বেতকণিকাগুলি শিকার-লোলুপ ব্লাড্‌-হাউণ্ডের মত অনুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কোন রোগ জীবাণু দেহে প্রবেশ করা মাত্রই তাহাকে ধরিয়া তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলে। দেহের ভিতর যে-আবর্জনা জমিয়া আমাদের সমস্ত রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা বাহির করিবার জন্য প্রকৃতি বহু পথ রাখিয়াছে। প্রকৃতি যে-পথে নিজেকে ভারমুক্ত করে, মলের সেই নির্গমন পথগুলি মুক্ত করিয়া আমরা সমস্ত রোগ হইতে অনায়াসে অব্যাহতি পাইতে পারি।

কিন্তু ছেলেবেলা হইতে আমরা শুনিয়া আসিয়াছি, ঔষধে রোগ আরোগ্য হয়। রোগ হইলেই আমরা মোটা দাগে ঔষধ খাই। আমরা ঔষধের বিষয় কিছুই বুঝি না। আমরা জানি না, তাহা বিষ কি অমৃত। ঐ-সমস্ত ঔষধ রোগ আরোগ্য করিবে কি চাপা দিবে, তাহার সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা নাই। দুর্বোধ্য লাটিন ভাষায় বিজাতীয় কতগুলি ঔষধের নাম দেখিলেই আমরা খুশি। যাহা আমরা না বুঝি তাহাতেই আমাদের বিশ্বাস বেশী হয়। সরল বিশ্বাসী লোকেরা না বুঝিয়া যেমন মাদুলি নেয়,

আমরাও ঠিক তেমনি কেবল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া ঔষধ ব্যবহার করি।

কিন্তু বর্তমানে ঔষধ ব্যবহার করাও খুব সহজ কথা নয়। ইচ্ছা করিলেই সহজে চিকিৎসা আরম্ভ করা যায় না। কোন জটিল রোগের চিকিৎসা আরম্ভ করিবার পূর্বেই প্রথমে যে খরচ করিয়া লইতে হয়, সাধারণ লোকের পক্ষে সে অর্থ ব্যয় করা একরূপ অসম্ভব।

একটু কঠিন ব্যাধি হইলেই ডাক্তারেরা প্রথম ঔষধ দেন না। তাঁহারা প্রথম রক্ত পরীক্ষা করেন। রক্তে হয় তো কিছু পাওয়া যায় না। তখন মল ও মূত্র পরীক্ষা করিতে হয়। কখন কখন থুথু পরীক্ষারও আবশ্যক হয়। কিন্তু একজনের রক্ত প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়াই বিভিন্ন ডাক্তার বিভিন্ন মত দেন। সুতরাং তিন চার বার পরীক্ষা না করিলে সত্যকার রোগ বোঝা যায় না। অনেক সময় ইহাতেও যথেষ্ট হয় না। কোন কোন সময় দুই তিন বার এক্স-রে তোলার দরকার হয়। এই সকল বৃহৎ ব্যাপার করার পর রোগীর ধন ও পরমায়ু যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে সে ঔষধ লাভ করে!

ঔষধ লাভ করিয়া রোগী ভাবে, সে অমৃত লাভ করিয়াছে,—ইহাতে তাহার স্থায়ী কল্যাণ হইবে। কিন্তু সত্যই সে কি অমৃত লাভ করে? সত্যই কি উহাতে তাহার স্থায়ী কল্যাণ হয়? রোগ আরোগ্যের জন্য সাধারণত পারদ, রসকর্পূর, কষ্টিক, আইওডিন, অহিফেন, কুইনাইন ও সালফিউরিক এ্যাসিড প্রভৃতি মারাত্মক বিষসমূহ ব্যবহৃত হয়। উহারা কি অমৃত? এই সকল বিষ ব্যবহার করিয়া সত্য সত্যই কি রোগীর কল্যাণ হয়?

অধ্যাপক এলোনজো ক্লার্ক, এম-ডি, (Prof. Alonzo Clark, M. D.) বলিয়াছেন, 'আমাদের সকল আরোগ্যকারী ঔষধই বিষ এবং তাহার ফল স্বরূপ প্রত্যেক মাত্রা ঔষধই রোগীর জীবনীশক্তি ক্ষয় করে' (F. E. Bilz—The Natural Method of Healing, P. 981)।

ডাঃ ট্রল, এম-ডি বলিয়াছেন, 'ঔষধ দ্বারা রোগ আরোগ্য করিবার যে

প্রত্যেক চেষ্টা, তাহা মনুষ্য দেহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ব্যতীত আর কিছুই না' (K. L. Sarma—Judgment on medicine, p. 13)।

ঔষধ মনে করিয়া রোগী বিষ খাইতে উদ্যত হয়, কিন্তু প্রকৃতি প্রবল ভাবে বাধা দান করে। দেহের তোরণ দ্বারে ভগবান সদা জাগ্রত প্রহরী জিহ্বাকে বসাইয়া রাখিয়াছেন। তাহাকে ফাঁকি দিয়া কোন কিছুরই ভিতরে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। অনভিপ্রেত কিছু মুখে আসা মাত্র সে থুৎকার করিয়া ফেলিয়া দেয়।

কিন্তু বিষ-প্রয়োগকারীরা বিষ-প্রয়োগকারীর মতই আসে। মেষ-চর্মে ঢাকা নেকড়ে বাঘের মত তিক্ত বিষের উপর চিনির প্রলেপ দিয়া ভগবানের বিশ্বস্ত প্রহরীকে তাহারা ফাঁকি দেয়।

কোন কোন সময় দস্যুর মত রোগীর উপর আক্রমণ চলে। প্রকৃতি বিষ গ্রহ কারিতে চায় না। সতী নারীর মতই সে প্রাণপণে বিদ্রোহ করে। কিন্তু সে অব্যাহতি পায় না। জোর করিয়া প্রকৃতি দেবীর উপর বলাৎকার করা হয়।

পুরাতন পদ্ধতির চিকিৎসকগণ বলেন,"রক্তের ভিতর জীবাণু রহিয়াছে। সুতরাং রক্তে বিষ ঢালিয়া এই জীবাণু মারিয়া ফেল। হয়তো তাঁহাদের প্রদত্ত বিষে রোগ জীবাণু মরে, কিন্তু বিষ রক্তের ভিতর ছাড়িয়া দিলে রক্তের স্পর্শ এড়াইয়া পাশ কাটিয়া কাটিয়া রোগ জীবাণুকেই কেবল তাহা আক্রমণ করে না। ঔষধের বিষে যে-পরিমাণ রোগ-জীবাণু মরে, সেই পরিমাণে রোগীর জীবনীশক্তিও তাহাতে ধ্বংস হয়।

[২]

কিন্তু দেহের অপরিমিত ক্ষতি করিয়াও কি ঔষধ সত্যি সত্যি রোগ সারায়? ডাক্তারদের প্রিয় ঔষধ কুইনাইন, আইওডিন বেলেডোনা আর্সিনিক, পারদ, গন্ধক, অহিফেন সার,—ইহারা কি সত্য সত্যই রোগ

আরোগ্য করে? আমরা দেখি, রোগ হইলে ডাক্তারেরা আসেন ; তাঁহারা আসিয়া এই সব ঔষধ প্রয়োগ করেন। অমনি পেটের অসুখ বন্ধ হইয়া যায়, জ্বর থামে, ফোড়া বসিয়া যায়, পাঁচড়া শুকায়, কিন্তু রোগের যাহা মূল কারণ তাহা কি ইহাতে নষ্ট হয়? আমাদের দেহে যখন অত্যধিক দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হয়, প্রকৃতি তখন ফোড়া, জ্বর, সর্দি, পেটের অসুখ প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া সেই বিষ দেহ হইতে বাহির করিয়া দিতে চায়। প্রকৃতির সেই চেষ্টার নামই রোগ। প্রকৃতির ভারমুক্ত হইবার এই শুভ চেষ্টা ঔষধ জোর করিয়া বন্ধ করে। তাহাতে রোগের প্রকাশ বন্ধ হয়, কিন্তু রোগ নষ্ট হয় না। রোগকে ঔষধ দ্বারা প্রকৃত পক্ষে ভিতরেই প্রেরণ করা হয় মাত্র। কিছু দিন তাহা ভিতরে সুপ্ত থাকে, তাহার পর যাহা সহজ ছিল তাহাই কঠিন আকারে অথবা অন্য মূর্তিতে শতগুণ ভয়ঙ্কর হইয়া দুরারোগ্য ব্যাধির আকারে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে।

পারদ, সীসা ও দস্তা প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত বিষাক্ত ঔষধ চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রোগ তাহাতে দমিত হয় না। পরে তাহাই দুরারোগ্য পেটের অসুখ, মস্তিষ্কের পীড়া ও অন্যান্য রোগের মূর্তি লইয়া দেখা দেয়।

অহিফেন ঘটিত বিভিন্ন বিষাক্ত ঔষধ দ্বারা পেটের অসুখ বন্ধ করা হয়। ঐ-ঔষধে অন্ত্র (intestine) অসাড় হইয়া যায় এবং অন্ত্রের ক্রিমি-গতি (peristaltic action) নষ্ট হয়। ঐ-গতির জন্যই মলের বেগ হয়। ঐ-গতির শক্তি নষ্ট হওয়ায় এমন দুরারোগ্য কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে যে, তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে।

জ্বর হইলে ঔষধ খাওয়াইয়া জ্বর বন্ধ করা হয়, কিন্তু তাহাই আবার চর্মরোগ, হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা এবং মানসিক ব্যাধিরূপে ফিরিয়া আসে।

পুনঃ পুনঃ ঔষধ ব্যবহার দ্বারা রোগ চাপা দেওয়ার ফলে এইরূপ বহু দুরারোগ্য ব্যাধি উৎপন্ন হয়।

মেহ রোগ (Gonorrhoea) বন্ধ করিয়া দিলে হাইড্রোসিল রোগ

সৃষ্ট হয়। উপদংশ (Syphilis) ঔষধের দ্বারা বন্ধ করিয়া রোগী ভাবে, আরোগ্য হইলাম, কিন্তু পরে তাহাই বাতব্যাধি ও পক্ষাঘাত রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

ছেলেদের হাম, ডিপথিরিয়া, মেনিনজাইটিস প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দিলে, তাহা ক্যান্সার, যক্ষ্মারোগ এবং মূত্রাশয় সম্বন্ধীয় কঠিন পীড়ার আকারে ফিরিয়া আসে (Kilka—Natural Ways of Cure, p. 15—23)।

ডাঃ হানিম্যান বলিয়াছেন, এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা অনিদ্রা, তরল ভেদ এবং বেদনা প্রভৃতির জন্য অহিফেন ব্যবহার করেন। প্রাথমিক ক্রিয়ার ফলে ইহাতে সামান্য উপকার হইলেও, সেই ক্রিয়াবসানে অনিদ্রা, ভেদ ও বেদনা আরও বহুগুণ বৃদ্ধি হয় (Organon, 59)।

অসুখ হইলে রোগীরা ডাক্তার ডাকেন। ডাক্তার আসিয়া ঔষধ দেন এবং যাদুমন্ত্রের মত রোগলক্ষণ তলাইয়া যায়। মূর্খ রোগী ভাবে আরোগ্য হইলাম,—সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী আসিয়াছিলেন; কিন্তু ডাক্তার তাঁহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া মনে মনে হাসেন,—উপরে ভগবানও হাসেন।

এলোপ্যাথিক ডাক্তারদের মধ্যে পর্যন্ত এই চিকিৎসা বিধির বিরুদ্ধে অসন্তোষ দ্রুত ঘনাইয়া উঠিতেছে। তাঁহাদের অনেকে এখন মনে করিতেছেন, তাঁহাদের চিকিৎসাবিধির মূল তত্ত্বই ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। অনেকে ইহাকে বিজ্ঞান বলিয়া পর্যন্ত স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইতেছেন না।

ডাঃ নয়েস (Dr. Nayes) বলিয়াছেন, 'আমি বিশ্বাস করি, এই যে-ব্যবসায়—এই শিল্প (art) যাহাকে ভুল করিয়া বিজ্ঞান বলা হয়, তাহা মৌলিক ভ্রান্ত নীতির অনুসরণ ব্যতীত আর কিছুই নয় (is none other than a practice of fundamental fallacious principles), ইহা দ্বারা লোকের কোন উপকার হয় না, এই ব্যবসায় করা নৈতিক

হিসাবে অপরাধ (morally wrong) এবং দেহের পক্ষে ক্ষতিকর (Judgment on medicine, p. 14)।'

বৃটীশ মেডিক্যাল এসোসিয়েসনের সহকারী সভাপতি, সার জেমস বার বলিয়াছেন, 'The treatment of disease is not a science, nor even a refined art, but a thriving industry—রোগের চিকিৎসাবিধি একটা বিজ্ঞান নয়, বিশেষ পরিমার্জিত কলাও নয়, কিন্তু ইহা একটি লাভজনক ব্যবসায় (Ibid, p. 9)।'

জর্জ বার্ণার্ড শ কি বলিয়াছেন, শুনিবেন ? তিনি বলিয়াছেন, 'It is not a profession, but a conspiracy—ইহা ব্যবসায় নয়, ইহা জন কয় লোকের একটা ষড়যন্ত্র।'

[৩]

তথাপি ঔষধ বরং ব্যবহার করা চলিত যদি বোঝা যাইত যে, ডাক্তারেরা যে-রোগনির্ণয় করেন তাহা অভ্রান্ত সত্য। অনেকে রোগ-যন্ত্রণায় রোগের শেষ ফলের কথা ভাবিতে পারেন না। তাঁহারা আশু প্রতিকার চান। কিন্তু রোগ-নির্ণয় যদি হয়, তবে তো প্রতিকার হইবে! রোগ-নির্ণয় করা যে কত কঠিন ব্যাপার তা বোঝা যায়, সাধারণ একটি জটিল রোগী লইয়া সহরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সব কয়টি ডাক্তার দেখাইয়া ঘুরিয়া আসিলে। তাহা হইলে প্রত্যেকটি ডাক্তারই যদি নূতন নূতন একটি রোগের নাম করেন তাহাতেও আশ্চর্য হওয়া চলিবে না। তাঁহাদের মধ্যে আবার অনেকে হাতে পাইলে রোগী ছাড়িতে চাহেন না। রোগ ঠিক ঠিক না বুঝিয়াও তাঁহারা ঔষধ প্রয়োগ করেন। কিন্তু ইহার জন্য তাঁহাদিগকে দোষী করা চলে না। কেহ কেহ বলেন, ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা, পরীক্ষা (experiment) ব্যতীত আর কিছুই না। সুবিখ্যাত 'ঔষধের ইতিহাস' গ্রন্থ প্রণেতা ডাঃ বষ্টক বলিয়াছেন, 'যে কয়কৌটা ঔষধ রোগীর

দেহের উপর প্রয়োগ করা হয়, রোগীর উপর ঔষধের পরীক্ষা ব্যতীত তাহা আর কিছুই নয়।'

সুবিখ্যাত ডাঃ স্যার উইলিয়ম অচ্‌লার বলিয়াছেন, 'যে-ঔষধ আমরা প্রয়োগ করি, তাহার সম্বন্ধে আমরা কমই বুঝি এবং যে-দেহে প্রয়োগ করি তাহার সম্বন্ধে আরো কম বুঝি।'

নিউইয়র্ক মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ ই,এইচ, ডেভিড, এম্‌-ডি বলেন, 'ঔষধের যে প্রকৃত গুণ তাহা খুব কমই বোঝা যায়। আমাদের অজ্ঞতা ঢাকিবার জন্যই আমরা ঔষধ কথাটা প্রয়োগ করি।'

সুতরাং ঔষধ দ্বারা পরীক্ষা করিতে গেলে এক রোগে যে অন্য রোগের ঔষধ পড়িবে, তাহা আর বিচিত্র কি। কিন্তু ভুল ঔষধ প্রয়োগ করা অত্যন্ত ভয়ানক ব্যাপার। ভুল ঔষধ দেওয়া ও বিষ-প্রয়োগ করার ভিতর পার্থক্য খুব অল্প। ইহাতে মৃত্যু হওয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।

ডাক্তারেরা যাহাকে রোগ-নির্ণয় বলেন, তাহা যে কিরূপ অনিশ্চিত, তাহার কতকটা আভাস আমরা পাই বড় বড় হাঁসপাতালের শবচ্ছেদের রিপোর্ট হইতে। আমেরিকার একটি বিখ্যাত হাঁসপাতালের (The Massachusetts General Hospital) শবচ্ছেদ বিভাগের কর্তা মিঃ ক্যাবট বলিয়াছেন, 'এক হাজার মৃত দেহ পরীক্ষা করিয়া ইহা দেখা গিয়াছে, শতকরা ৫৩টি রোগীর মাত্র ঠিক ঠিক রোগ নির্ণয় হইয়াছিল। অবশিষ্ট শতকরা যে ৪৭টি রোগী, তাহাদের ভুল রোগ নির্ণয় হইয়াছে (Henry Lindlahr, M. D.—Practice of Natural Therapeutics, p. 34-38)।'

এই শতকরা ৪৭টি রোগীকে, ঔষধ দেওয়া হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাকে ঔষধ না বলিয়া বিষ বলিলেই হয় ভাল। সুতরাং এই যে-সকল হতভাগ্য অকালে দেহত্যাগ করিয়াছে, রোগই কেবল তাহাদিগকে মারে নাই, চিকিৎসকেরাও তাহাদের মৃত্যুর জন্য সমভাবে দায়ী।

তথাপি এই যে মৃত্যুর হার পাইতেছি, তাহা হইতেছে অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের হাতে। নূতন ডাক্তারদের হাতে হয়তো মৃত্যুসংখ্যা আরো কিছু বৃদ্ধি হয়। কিন্তু ক্রমশ তাঁহারা অভিজ্ঞ হইয়া উঠেন—শতমারী ভবেৎ বৈদ্য, সহস্রমারী চিকিৎসক! সুতরাং ডাঃ মেসন গুড্ যখন বলেন, 'পৃথিবীতে এক ডাক্তারেরা যত লোক মারিয়াছে, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী একত্র হইয়া তত লোক মারিতে পারে নাই,' তখন আমরা তাহার কোনই প্রতিবাদ করিতে পারি না (Mahatma Gandhi—Guide to health, p, 5)।

এই সকল কারণে ডাঃ ফ্রান্সিস্ গগস্ওয়েল, এম, ডি, বলিয়াছেন, 'বর্তমান ডাক্তারী ব্যবসায় যেরূপ পদ্ধতিতে চলিতেছে, তাহাতে জগতের যত উপকার হইতেছে, তাহা অপেক্ষা ক্ষতি হইতেছে অনেক বেশি।'

ডাঃ জেম্স জনসন, এম-ডি, এফ-আর-এস বলিয়াছেন, 'আমার সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে, আমি অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত ইহাই বলিতে পারি, যদি পৃথিবীতে একজনও ডাক্তার, অস্ত্রচিকিৎসক, ঔষধ-বিক্রেতা এবং এক ফোঁটা ঔষধ না থাকিত, তবে পৃথিবীতে বর্তমানে যেরূপ রোগ ও মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব আছে, তাহা অপেক্ষা ঢের কম রোগ ও মৃত্যু থাকিত।'

এই জন্য ড্াঃ ট্রল দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, 'যদি পৃথিবীতে রোগ আরোগ্যের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থাই না থাকিত, তথাপি আমি কাহাকেও ঔষধ দিতাম না, কারণ আমি যদি ভাল করিতে না পারি, আমি মন্দ করিতে বিরত থাকিতাম (Judgment on medicine, p. 13)।

[৪]

এই বহুধা নিন্দিত চিকিৎসাবিধির প্রতিক্রিয়ায় য়ুরোপে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিধির প্রবর্তন হইয়াছে। প্রাকৃতিক চিকিৎসার সহিত ইহা এই জন্যই অনেকটা চলিতে পারে যে, ইহা রোগকে চাপা দেয় না। ইহাতে অনেক দিন পর পর খুব সূক্ষ্মমাত্রায় রোগীকে ঔষধ দেওয়া হয়।

এই জন্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিধিকে ঔষধ হইতে ঔষধহীন প্রাকৃতিক চিকিৎসায় পৌঁছিবার সোপান বলা যাইতে পারে।

কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিধির মূল সূত্রই এই, যে-ঔষধে সুস্থ শরীরে যে-রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়, সেই সব রোগ-লক্ষণ কোন রোগীর দেহে থাকিলে, সেই ঔষধে তাহা আরোগ্য হইবে। বিষ ব্যতীত রোগ-লক্ষণ প্রকাশ করিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের সমস্ত ঔষধই বিষ। অনেক সময় রোগ-লক্ষণ ধরা যায় না। অথবা একটা ঔষধকে বিশ রকম রোগ-লক্ষণে প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা থাকে। যে-লক্ষণটি রোগীর দেহে নাই, হোমিওপ্যাথিক দর্শন যদি সত্য হয়, তবে সেই ঔষধ প্রয়োগে রোগীর দেহে সেই রোগ-লক্ষণ উৎপন্ন হইবে। ভুল চিকিৎসায় ইহাতে রোগীর গুরুতর অনিষ্ট হয়। কেহ কেহ মনে করেন, ভুল ঔষধ পড়িলে ইহাতে কোন অনিষ্ট হয় না। কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভুল ধারণা। হোমিওপ্যাথিক দর্শন প্রণেতা ডাঃ ক্যাণ্ট বলিয়াছেন, 'That what is prone to cure, is prone to kill—যাহা রোগ আরোগ্য করিতে পারে, তাহা মানুষ মারিতেও পারে।'

বর্তমানে অতি সাধারণ লোকেরাও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতেছেন। কিন্তু ইহার মত কঠিন চিকিৎসা আর নাই। ইহা এলোপ্যাথি হইতে ঢের বেশী কঠিন। ইহাতে রোগ-লক্ষণ স্থির করা যেমন কষ্টকর, ঔষধের মাত্রা স্থির করাও ততোধিক কঠিন ব্যাপার। ডাঃ হানিম্যানই বলিয়াছেন, কেবল অভিজ্ঞতার দ্বারাই ইহার মাত্রা স্থির হইতে পারে (Organon, 278)। অনেক দিন পর পর অত্যন্ত সূক্ষ্মমাত্রায় ঔষধ দেওয়াই এই চিকিৎসাবিধির নিয়ম। কিন্তু অনভিজ্ঞেরা এলোপ্যাথিক ডাক্তারদের মতই পুনঃ পুনঃ ঔষধ প্রয়োগ করে। রোগীর পক্ষে তাহা এলোপ্যাথিক ঔষধ অপেক্ষাও বহুগুণ অধিকতর ক্ষতিকর হয় (Ibid, 276)। কারণ প্রত্যেক ফোঁটা হোমিওপ্যাথিক ঔষধই বিষ।

কেহ কেহ বাড়িতে একটা হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স কিনিয়া রাখেন। পয়সার কেনা জিনিস কাজে লাগাইবার জন্য তাঁহাদের স্বভাবতই একটা উৎকণ্ঠা থাকে। কিন্তু তাঁহারা প্রয়োগবিধি ভাল করিয়া জানেন না। এই জন্য রোগ আরোগ্য করিতে যাইয়া প্রায়ই তাহারা রোগ সৃষ্টি করেন। অনভিজ্ঞের হাতে এই বাক্স তিল তিল করিয়া আত্মহত্যা বা নরহত্যার একটা যন্ত্র হইয়া পড়ে। বদ্ধ ডোবার পাশে থাকিয়া মশক দংশনের সহিত অনুক্ষণ শরীরে বিষ গ্রহণ করাও যা, সাধারণ লোকের পক্ষে পয়সা দিয়া এক বাক্স হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কিনিয়া ঘরে রাখাও তাহাই।

ডাক্তারেরা ঔষধের দ্বারা যে উপকার করিতে চান, এক ফোঁটা ঔষধ ব্যবহার না করিয়া এবং কোনরূপে রক্তকে বিষাক্ত না করিয়া কেবল জল, মাটি, উত্তাপ, বায়ু, আলো ও পথ্যের দ্বারা প্রকৃতিকে সাহায্য করিয়া অনায়াসে আমরা তাহা করিতে পারি।

গ্রামের লোকেরা দুঃখ করেন, রোগের সময় তাঁহারা ঔষধ পান না। সহরে দরিদ্র শ্রেণীরও এই জন্য কম আক্ষেপ নাই। কিন্তু যদি তাঁহারা জানিতেন, তাঁহাদের হাতের কাছেই রোগ আরোগ্য করিবার কত কিছু রহিয়াছে, তবে তাঁহাদের ডাক্তার ডাকিবার কখনও আবশ্যকতা হইত না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রোগ ও তাহার প্রতিকার

[১]

আমাদের দেহ-দুর্গে প্রবেশ করিবার মুখই সর্বপ্রধান রাজপথ। এই পথেই অন্ন ও জল প্রেরণ করিয়া দেহকে আমরা সবল ও সুস্থ রাখি। আমরা যাহা আহার করি, তাহার সারাংশ গ্রহণ করিয়া প্রকৃতি দেহের কাজে লাগায় এবং অবশিষ্ট আবর্জনা বিভিন্ন দ্বারপথে বাহির করিয়া দেয়। অনুক্ষণ এই গ্রহণ ও বর্জনের উপরেই আমাদের স্বাস্থ্য নির্ভর করে।

আমরা যাহা খাই দন্ত দ্বারা নিষ্পিষ্ট হইয়া এবং লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহা প্রথম যায় পাকস্থলীতে (stomach)। যখন পাকস্থলীতে কিছু থাকে না, তখন পাকস্থলী কুঞ্চিত হইয়া একলাটি চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে ; কিন্তু গলনালীর ভিতর দিয়া পাকস্থলীতে খাদ্য যাইয়া পড়িলে, তাহা অমনি কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে থাকে। তাহাতে ভুক্ত খাদ্যগুলি এক দিক হইতে আর এক দিকে বার বার নীত হইতে থাকে।

পাকস্থলীর অভ্যন্তরভাগ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থিতে (gland) পূর্ণ। খাদ্য দ্রব্য পাকস্থলীতে আসিলে ঐ-গ্রন্থিগুলি হইতে এক প্রকার অম্লরস (gastric juice) উহার ভিতর নামিয়া আসে। একজন সুস্থকায় ব্যক্তির ২৪ ঘন্টার ভিতর গড়ে প্রায় এক গ্যালন অম্লরস উৎপন্ন হয়। সাধারণত

ভুক্তদ্রব্য তিন ঘণ্টা পাকস্থলীতে থাকে, তাহার পর তাহা ক্ষুদ্রান্ত্রে (small intestine) প্রবেশ করে।
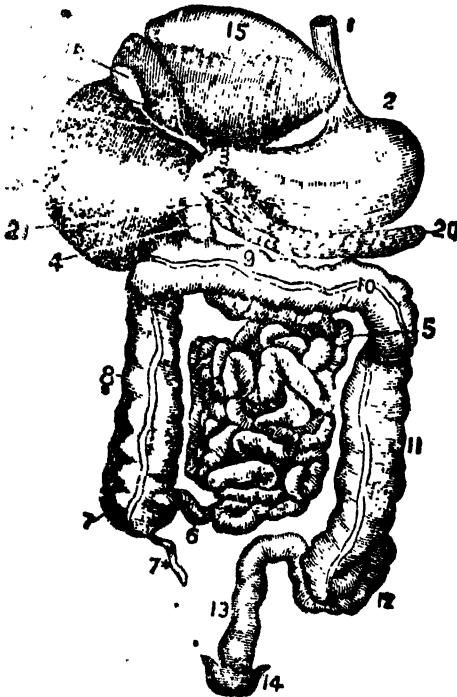
চিত্র-পরিচয়।—(1) গলনালী, (2) পাকস্থলীর উর্ধ্বদিকের মুখ, (3) পাকস্থলীর নিম্নদিকের মুখ, (4) ক্ষুদ্রান্ত্রের উর্ধ্ব ভাগ (Du-odenum), (5, 6), ক্ষুদ্রান্ত্রের কুণ্ডলী আবর্ত (convolutions of Small Intestines), (7) অন্ধান্ত্র (cœcum) (7-*) অন্ত্রপুচ্ছ, (8) উর্ধ্বগামী বৃহদন্ত্র, (9, 10) অনুপ্রস্থ বৃহদন্ত্র, (11) নিম্নগামী বৃহদন্ত্র, (12) বৃহদন্ত্রের দ্বিবক্র ভাঁজ, (13) সরলান্ত্র, অন্ত্রের অধোদেশ, (14) মলদ্বার, (15, 15) যকৃতের উপখণ্ড উঁচু করিয়া দেখান হইয়াছে, (16) যকৃৎ-প্রণালী (এই পথে পিত্ত যকৃৎ হইতে ক্ষুদ্রান্ত্রের উর্ধ্বভাগে যাইয়া পড়ে, (17) পিত্তকোষ-প্রণালী, (18) পিত্তকোষ, (19) পিত্তবহানালী, (20) ক্লোম (pancreas, (21) ক্লোমনলী।

দেহের পরিপাক-যন্ত্র (The Dijestive Organs)

যখন খাদ্যদ্রব্য ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতর দিয়া যাইতে থাকে তখন ক্ষুদ্রান্ত্রের মুখের কাছে একটা নলের ভিতর দিয়া লিভার হইতে পিত্ত নামিয়া আসে এবং তাহা ভুক্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয়। ইহার পর ক্লোম (pancreas) হইতে একটা রসস্রোত নির্গত হইয়া ভুক্ত দ্রব্যের সহিত মিশিয়া যায়। তাহার পর অন্ত্রের দেয়াল হইতে একপ্রকার রস নির্গত হইয়া খাদ্যের সহিত মিশ্রিত হয়। এই সকল রস খাদ্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইলে

উহাদের ভিতর একটা রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং ঐরূপ পরিবর্তন হইলেই কেবল খাদ্যরস দেহ গঠনের কাজে আসে।

আমাদের ক্ষুদ্রান্ত্র প্রায় সাড়ে বাইশ ফুট দীর্ঘ। ইহার সমস্ত অভ্যন্তর ভাগই সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিহ্বায় পূর্ণ—ডাক্তারী ভাষায় উহাদিগকে বলে অঙ্কুরিকা (villi)। ঐ-গুলি ক্ষুদ্রান্ত্রস্থিত অর্ধতরল খাদ্য দ্রব্যের ভিতর সম্মুখে ও পশ্চাতে সর্বদাই আন্দোলিত হইতেছে। ঐ-রূপ আন্দোলিত হইয়া উহারা ভুক্ত দ্রব্য হইতে সর্বদা রস শোষণ করিয়া লয়। ভুক্ত দ্রব্যের এই রস শোষণ (absorption) ক্ষুদ্রান্ত্রেই সর্বাপেক্ষা বেশী হয়। ইহা পাকস্থলী এমন কি মুখ হইতেই আরম্ভ হয়। কিন্তু ঐ-সমস্ত স্থান হইতে খুব কম খাদ্যরসই দেহে গৃহীত হইয়া থাকে।

ভুক্তদ্রব্য ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে বৃহদন্ত্রে (large intestine) প্রবেশ করে। অন্ত্রের (নাড়ি-ভুঁড়ির) স্বাভাবিক একটা ক্রিমিগতি (peristaltic action) আছে। এই গতির জন্যই ভুক্তদ্রব্য উর্ধ্ব দিক হইতে নিম্ন দিকে যাইতে পারে। আমাদের বৃহদন্ত্রটি প্রায় পাঁচ ফুট দীর্ঘ। সহরের যেমন বৃহৎ নরদমা থাকে, এই বৃহদন্ত্রটি তেমনি দেহের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নরদমা। ইহা হইতেই মল সর্বশেষে দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়।

বৃহদন্ত্রের অভ্যন্তর ভাগও কতকটা ক্ষুদ্রান্ত্রের মত। এই জন্য ক্ষুদ্রান্ত্রের মত ইহাও যথেষ্ট রস শোষণ করিতে পারে। ভুক্তদ্রব্য অর্ধতরল অবস্থায় বৃহদন্ত্রে আসিয়া পৌঁছে। কিন্তু ভুক্তদ্রব্যের অধিকাংশ জলীয় অংশই এই স্থানে শোষিত হইয়া যায়। এই জন্য মল বৃহদন্ত্রে পৌঁছার পর ক্রমশ কঠিন আকার ধারণ করে। বৃহদন্ত্রের তরল পদার্থ শোষণ করিবার ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক। অনেক সময় রোগী যখন মুখ দিয়া খাইতে পারে না, তখন এই পথে গ্লুকোচ প্রভৃতি দিয়া দীর্ঘ দিন তাহাকে বাঁচাইয়া রাখা হয়। পাকস্থলীতে যতটা রস শোষিত হয়, তাহা অপেক্ষাও বেশী রস শোষিত হয় বৃহদন্ত্রে।

এই জন্য যাহাতে ক্ষুদ্রান্ত্রে ও বৃহদন্ত্রে মল দূষিত হইয়া না উঠে এবং

তাহার দুষিত রস দেহে গৃহীত না হয়, সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ভুক্তদ্রব্য অন্ত্রের ভিতর সুদীর্ঘ সময় থাকিয়া যদি পচিয়া উঠে, তবে তাহা হইতে দেহে দুষিত রস গৃহীত হয় এবং তাহার ফলে দেহের সমস্ত রক্ত বিষাক্ত হইয়া উঠে। এই মল পচিয়া উঠিলে ইহার ভিতর অসংখ্য রোগের জীবাণু সৃষ্ট হয় এবং এই দুষিত মল ভিতরে থাকার জন্যই আমাদের বিভিন্ন রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, আমাদের শতকরা ৯৯টি রোগই তলপেটের এই দুষিত অবস্থা হইতে উৎপন্ন হয় (J. Ellis Barker—Chronic Constipation, p. 13—16)

দেহের দুষিত পদার্থ দূর করিবার জন্য প্রকৃতি আমাদের ভিতর যে বন্দোবস্ত রাখিয়াছেন, তাহাতে অত্যধিক আবর্জনা কখনও দেহে সঞ্চিত হইতে পারে না। আমাদের নানা অত্যাচারের ফলেই দেহে বিভিন্ন জাতীয় দুষিত পদার্থের সঞ্চার হয়। অল্পাহার, অধিক আহার, অখাদ্য ও কুখাদ্য ভোজন, মদ্য প্রভৃতি মাদক দ্রব্য পান, অপরিমিত ইন্দ্রিয় চালনা, রেচক প্রভৃতি বিভিন্ন ঔষধের ব্যবহার, অত্যধিক শারীরিক অথবা মানসিক শ্রম, স্বল্প, অধিক অথবা অনিয়মিত সময়ে নিদ্রা প্রভৃতি কারণে আমাদের দৈহিক যন্ত্রগুলির ভিতর একটা বিশৃঙ্খলা আসে, তাহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়া নষ্ট হয়, তাহারা দুর্বল হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে আমাদের দেহে ক্রমশ মল জমিতে থাকে।

প্রথমেই বৃহদন্ত্র মলে পূর্ণ হইয়া উঠে। তাহার পর ক্রমশ ক্ষুদ্রান্ত্র মলে ভরিয়া যায়। তখন এরূপ অবস্থা হয়, পাকস্থলী যে ভুক্ত দ্রব্য ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রেরণ করিবে, তাহার স্থান সেখানে হয় না। তখন পাকস্থলী নিজেই কিছু গ্রহণ করিতে চায় না। এইরূপ অবস্থা হইলে আমরা তাহাকে বলি—অগ্নিমান্দ্য বা ক্ষুধাহীনতা (Loss of appetite)। যাহাদের নিয়মিত সময়ে ক্ষুধা না হয়, বুঝিতে হইবে, তাহাদের অন্ত্র ও বৃহদন্ত্র মলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

আমরা না খাইয়া পারি না বলিয়াই তখন খাই। কিন্তু পাকস্থলী ভুক্ত খাদ্যদ্রব্য লইয়া বিপদে পড়িয়া যায়। ক্ষুদ্রান্ত্রে স্থান না থাকায় সামান্য কিছু আহার করিলেই পেট তখন ভার বোধ হয়।

তথাপি ক্ষুদ্রান্ত্রে না পাঠাইয়া পাকস্থলীর উপায় নাই। যখন একান্ত নিরুপায় হয়, তখন বমি করিয়া খাদ্যদ্রব্য সে বাহির করিয়া দেয়। কিন্তু যদি ততটা নিরুপায় অবস্থা না হয়, তবে যথাসম্ভব দীর্ঘ সময় পাকস্থলীতে রাখিয়া ক্ষুদ্রান্ত্রে স্থান হওয়া মাত্র তথায় প্রেরণ করে। কিন্তু ভুক্তদ্রব্য সুদীর্ঘ সময় পাকস্থলীতে থাকিয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে। তাহা হইতে অর্ধ বিষাক্ত একটা এ্যাসিড উৎপন্ন হয়। আমরা তাহাকে বলি অম্বল বা বুকজ্বালা। দীর্ঘ দিন এই অবস্থা থাকিলে তাহা পাকস্থলীর প্রদাহেও (gastric ulcer) পরিণত হইতে পারে।

কিন্তু পাকস্থলীর এইরূপ শোচনীয় অবস্থাতেও আমরা সাবধান হই না। তখনও আমরা যথেচ্ছ আচার চালাই। কিন্তু দেহের ঐ-অবস্থায় পাকস্থলীর পক্ষে হজম করাই অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে। তাহার যেমন লাগে সময়, তেমন তাহার করিতে হয় অতিরিক্ত পরিশ্রম। দীর্ঘ দিন যথেষ্ট সময়ের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া, পাকস্থলী ক্রমশ অধিকতর দুর্বল হইয়া পড়ে। তখন অক্ষম পাকস্থলী ভুক্তদ্রব্য সম্পূর্ণ হজম না করিয়াই অন্ত্রে পাঠাইয়া দেয়। ইহাকেই আমরা বলি অজীর্ণ।

ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্র এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছিবার পূর্বেই প্রকৃতি দেহের ভার লাঘব করিবার জন্য আপনিই ব্যবস্থা করে। সে কখন কখন পেটের অসুখ সৃষ্টি করে। তখন দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত মলের বোঝা হইতে দেহ নিমেষে মুক্ত হয়। অল্পেতেই তখন বিপদ কাটে। কিন্তু প্রকৃতি একবার আমাদিগকে ভারমুক্ত করে, আবার আহার বিহারের দোষে নিজদের আমরা ভারাক্রান্ত করি। কিন্তু ক্রমশ তাহার ক্ষমতা ক্ষীণ হইয়া আসে। পেটের অসুখ সৃষ্টি করিয়া দেহকে যে ভারমুক্ত

করিবে সে-ক্ষমতাই তার ক্রমশ নষ্ট হইয়া যায়। তখন আমাদের অতি কঠিন পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ জন্মে।

[২]

এই অবস্থায় সর্বাপেক্ষা অধিক দুষিত মল আসিয়া জমে আমাদের বৃহদন্ত্রের ভিতর। এখানে মল কিরূপ ভাবে জমিয়া থাকে, আমেরিকার কয়জন ডাক্তার ২৮৪টি মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া সেই সম্বন্ধে পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই রোগীগুলি বিভিন্ন রোগে মরিয়াছিল। ডাক্তারেরা তাহাদের বৃহদন্ত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, ২৮৪টি দেহের ভিতর ২৫৬টিরই বৃহদন্ত্র পচা, দুর্গন্ধযুক্ত, বিকৃত মলে পূর্ণ হইয়া আছে। তাহাদের কাহারও কাহারও বৃহদন্ত্র মলপূর্ণ হইয়া ফুলিয়া প্রায় দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, তাহাদের অনেকের বৃহদন্ত্রের ভিতর মল শুষ্ক হইয়া অন্ত্রের দেয়ালে শ্লেটের মত শক্ত হইয়া লাগিয়া রহিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, মৃত্যুর পূর্বেও এই সব রোগীর সকলেরই যে দৈনিক মলত্যাগ বন্ধ ছিল তাহা নয়। তাঁহারা দেখিলেন, সেই জমাট-বাঁধা শক্ত মলের ভিতর কনিষ্ঠ অঙ্গুলি যায়, এমন একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র রহিয়াছে। তাহার ভিতর দিয়া মধ্যে মধ্যে মল বাহির হইত। ডাক্তারেরা তাহাদের মলগুলির ভিতর ছুরি চালাইয়া নিলেন। তখন তাহারা দেখিলেন, ঐ-শক্ত মলের ভিতর বিভিন্ন রকম ছোট বড় ক্রিমি ও পোকা গর্ত করিয়া বাসা করিয়াছে। কোন কোন বাসায় অনেকগুলি করিয়া ডিম। কাহারো কাহারো অন্ত্রে পোকাগুলি বাসা করিয়া অন্ত্রের আভ্যন্তরীণ দেয়ালে ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছে। ক্ষতের চারিদিকে প্রদাহের চিহ্ন রহিয়াছে এবং আক্রান্ত স্থান ফুলিয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত রোগীর মলের সঙ্গে রক্ত পড়িত এবং কাহারো কাহারো অর্শ ছিল (J. W. Wilson—The New Hygiene, p, 34-35)।

ডাক্তারেরা মৃত রোগীদের পেট কাটিয়া যাহা পাইয়াছেন, অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই, বাহিরে যাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদেরও অধিকাংশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অল্পাধিক ঐ-সকল রোগীদের মত। কিন্তু বিপদ উপস্থিত না হইতে বিপদের সম্ভবনা কেহ বুঝিতে পারে না।

যখন বৃহদন্ত্র এইরূপ মলপূর্ণ হইয়া উঠে এবং তাহার ফলে ক্ষুদ্রান্ত্রও মলে ভরিয়া যায়, তখন তাহার বিষক্রিয়ায় সমস্ত দেহই বিষাক্ত হইয়া উঠে। আমাদের ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের ভিতর রসশোষণ কার্য দিবারাত্র অনুক্ষণ চলিতেছে। অন্ত্রের মধ্যস্থিত স্পঞ্জের মত দেয়ালগুলি সর্বদাই রসশোষণে ব্যস্ত। যদি আমাদের অন্নবহা নালীর (alimentary canal) অভ্যন্তর ভাগ পরিষ্কার থাকে, তবে তাহারা বিশুদ্ধ টাটকা খাদ্য হইতে অবিকৃত রস তুলিয়া লইয়া দেহখানিকে মধুতে ও আনন্দে, কান্তিতে ও পুষ্টিতে ভরিয়া দেয়। কিন্তু যখন অন্ত্রের ভিতর মল জমিয়া বিকৃত হইয়া উঠে, তখন তাহারা অমৃতের পরিবর্তে সঞ্চিত মল হইতে বিষই গ্রহণ করে। আমাদের নিজেদের দেহের বিষে নিজেদের রক্তই তখন বিষাক্ত হইতে থাকে এবং অনুক্ষণ এই আত্মঘাতী ক্রিয়া (self-poisoning) চলিতে থাকে।

রক্ত তখন ভুক্তদ্রব্য হইতে যে-বিষাক্ত রস তুলিয়া লয়, তাহা দ্বারা দেহ নির্মাণ কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না ; কিন্তু আমাদের দেহ প্রতিনিয়ত ক্ষয় হইতেছে। দূষিত রস দ্বারা প্রকৃতি সেই ক্ষয় পূরণ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। তখন অকাল বার্ধক্য আসে অথবা দেহের প্রধান একটা যন্ত্র, হয়তো ফুসফুস, লিভার বা মূত্রাশয় দুর্বল হইয়া পড়ে।

আমাদের দেহের ভিতর যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা হইতেই দেহের সমস্তগুলি যন্ত্র পুষ্টি (nutrition) গ্রহণ করিয়া থাকে। চক্ষু, দন্ত, হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশি, লিভার, ফুসফুস এমন কি দেহের প্রত্যেকটি তন্তু পর্যন্ত এই সাধারণ রক্তস্রোত হইতে দেহ গঠনের মসলা আহরণ করে।

যখন রক্তস্রোতই বিষাক্ত হইয়া উঠে তখন যে-কোন যন্ত্রই ঐ-বিষের দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে।

• সাধারণত দুর্বল অঙ্গেই রোগ উৎপন্ন হয়। একটা শিকল যদি দুই দিক হইতে টানা যায় তবে তাহা ভাঙে কোথায়? যে-স্থান দুর্বল সেই স্থানেই তাহা ভাঙে। দূষিত রক্ত-স্রোতের ভিতরও যে-বিষ পরিভ্রমণ করে, সাধারণত দুর্বল অঙ্গই উহা দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই ভাবে দেহের ভিতর বিভিন্ন চক্ষু রোগ, দন্তরোগ, চর্মরোগ, হৃৎরোগ, উন্মত্ততা, স্ত্রী-রোগ, স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতির প্রজননে অক্ষমতা, বাতব্যাধি প্রভৃতি অসংখ্য রোগ উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই সকলকে রোগ বলিলে ভুল হয়। দেহের দূষিত অবস্থাই প্রকৃত রোগ। আর সমস্তই তাহার লক্ষণ মাত্র।

কিন্তু প্রকৃতি সর্বদাই আমাদিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। যখন দেহের প্রধান নরদমার দ্বারা দেহের আবর্জনা সে বাহির করিয়া দিতে পারে না, তখন তাহারি বিষ ঘর্ম, মূত্র ও নিশ্বাসের সহিত সে বাহির করিয়া দিতে চায় এবং লিভার প্রভৃতি যন্ত্র সাহায্যে তাহা ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে। প্রকৃতি অনেকটা সক্ষম হয়ও। তাহা না হইলে এই পাপের বোঝা লইয়া দীর্ঘ দিন আমরা বাঁচিতে পারিতাম না।

কিন্তু দেহের সুবৃহৎ নরদমা দিয়া যে আবর্জনা বাহির হইবে, অন্যান্য পথে তাহার সমস্ত বিষ বাহির করিয়া দেওয়া বা অন্য ভাবে ধ্বংস করা দৈহিক যন্ত্রগুলির পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। দেহের প্রত্যেকটি যন্ত্রেরই ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। ঐরূপ অস্বাস্থ্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করার ফলে ঐ-সকল যন্ত্র ক্রমশই দুর্বল হইয়া পড়ে এবং তাহাদের অপনয়নমূলক কার্য (eliminative functions) শিথিল হইয়া আসে। তখন ঐ-দূষিত পদার্থগুলি দেহের ভিতরই স্থান করিয়া লয় এবং দেহের ধ্বংসপ্রাপ্ত অণুকোষ (cell) গুলির সহিত মিলিত হইয়া দেহে বিজাতীয় পদার্থ (foreign matter) গঠন করে। একবার ইহা জমিতে আরম্ভ করিলে

ইহাদের সঞ্চয় দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং শীঘ্রই সমস্ত দেহ বিজাতীয় পদার্থের একটা ডিপো হইয়া উঠে।

[৩]

আমাদের নিজেদের অপরাধেই যে কেবল আমাদের দেহে এইরূপ বিজাতীয় পদার্থের সঞ্চয় হয়, তাহাই নয়। আমাদের অজ্ঞতাও আমাদের রোগের জন্য সমভাবে দায়ী। প্রকৃতি অতি কঠোর শাসক। তাহার অভিধানে ক্ষমা বলিয়া কোন কথা নাই। আইন না জানা, দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভের কখনও কারণ হয় না। আমাদের স্বেচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত অপরাধের ফলে যখনি দেহে অত্যধিক দূষিত ও বিজাতীয় পদার্থের সঞ্চয় হয়, তখনি প্রকৃতি অতি কঠোর বিধান অবলম্বন করিয়া দেহকে ভারমুক্ত করিতে চায়।

সময় সময় প্রকৃতি ঐ বিজাতীয় পদার্থগুলি ধ্বংস করিবার জন্য দেহের ভিতর অত্যধিক একটা তাপ উৎপন্ন করে। এই তাপকেই আমরা বলি জ্বর। দেহকে বিষনির্মুক্ত করিবার জ্বরই প্রকৃতির অন্যতম কৌশল। জ্বর উৎপন্ন করিয়া প্রকৃতি দেহের দূষিত পদার্থ পোড়াইয়া ফেলে এবং গলাইয়া দেহের বিভিন্ন দ্বার দিয়া বাহির করিয়া দেয়। জ্বরের সময় রোগীর নিশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত হয়, কারণ প্রকৃতি যথেষ্ট বিষ নিশ্বাসের সহিত বাহির করিয়া দেয়। ঐ জন্যই জ্বরের সময় মূত্র ঘোলাটে, রক্তবর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া উঠে। রোগীর গা দিয়াও একটা দুর্গন্ধ বাহির হয়। এই সমস্তই প্রমাণ করে, প্রকৃতি গৃহ পরিষ্কার করিতেছে। অবশেষে যখন প্রচুর ঘর্ম হয়, তখন আমরা বুঝি প্রকৃতি জয়যুক্ত হইয়াছে। যখন প্রকৃতি লোমকূপ দিয়া দেহ-সঞ্চিত বিষ বাহির করিয়া দিতে সক্ষম হয়, তখন জ্বর আপনি থামিয়া যায়।

কিন্তু এই শোধন কার্যে প্রকৃতিকে আমরা বাধা দেই। জ্বর হওয়া মাত্র বিভিন্ন ঔষধ ব্যবহার করিয়া আমরা জ্বর বন্ধ করি। কখন কখন

একবার জ্বর হইয়া গেলেও প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আবার দেহের অবস্থা খারাপ করিয়া ফেলি। সুতরাং একবার প্রকৃতি গৃহ পরিষ্কার করিলেও আবার গৃহ আবর্জনায় ভরিয়া যায়। সময় সময় দীর্ঘ দিন যাবৎ দেহের ভিতর এই সঞ্চয় চলে। লোকে তখন বুঝিতে পারে না যে, তাহাদের দেহ-প্রাকারের নিম্নে অজ্ঞাতসারে বারুদ স্তূপীকৃত হইতেছে। অনেক দিন ইহা সুপ্ত থাকে। লোকে তখন মনে করে, তাহারা বেশ সুস্থ আছে। কিন্তু হঠাৎ একদিন এই সঞ্চিত বিজাতীয় পদার্থ ঠিক বারুদের মতই দেহের ভিতর বিপর্যয় সৃষ্টি করে। কখন কখন ঋতুর পরিবর্তনে, অধিক আহারের অবসরে, হঠাৎ গরম অথবা ঠাণ্ডা হাওয়া গ্রহণে, অথবা ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি মানসিক অবস্থার পরিবর্তনে এই সুপ্ত বিজাতীয় পদার্থগুলি কুপিত (fermented) হইয়া উঠে।

তখন ইহাদের ভিতর একটা পরিবর্তন আসে। রক্তের বিষ ও আবর্জনা হইতে যাহা এককালে জন্ম লাভ করিয়াছে, তাহাই এইরূপ অবস্থায় গলিয়া গিয়া আবার সেই রক্তস্রোতেই প্রত্যাবর্তন করে। তখন সমস্ত রক্তই বিষাক্ত হইয়া ওঠে। সময় সময় ঐ বিজাতীয় পদার্থগুলি গ্যাসে রূপান্তরিত হয় এবং দেহের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

ঐ রূপান্তরিত বিজাতীয় পদার্থগুলিকে প্রকৃতি তখন দেহের বিভিন্ন পথ দিয়া বাহির করিয়া দিতে চায়। কিন্তু অন্ত্র ও লোমকূপের পথগুলি বন্ধ হইলেই এই অবস্থা উৎপন্ন হয়। সুতরাং ঐ দূষিত পদার্থগুলি বাহির হইবার পথ না পাইয়া তখন দেহের ভিতরি ছুটিতে থাকে। সময় সময় উহারা দেহের বিভিন্ন যন্ত্র আক্রমণ করে। কখন ইহাদের দ্বারা ফুসফুস অথবা শ্বাসনালী আক্রান্ত হয়। তখন আক্রমণের স্থান ভেদ অনুসারে আমরা বলি,—ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া অথবা প্লুরিসি। কখন ইহা গলা আক্রমণ করে, তখন বলা হয় ডিপথিরিয়া। এই ভাবে যখন টনসিল আক্রমণ করে, তখন বলা হয় টনসিলাইটিস্, মূত্রযন্ত্র আক্রমণ করিলে নেফ্রাইটিস এবং মস্তিষ্ক ও

মেরুদণ্ডের ঝিল্লী আক্রমণ করিলে মেনিঞ্জাইটিস বলা হইয়া থাকে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত রোগও প্রকৃতির রোগবিষ বাহির করিবার বিভিন্ন পদ্ধতি মাত্র। যখন প্রকৃতি বাহিরের নরদমা দিয়া রোগবিষ বাহির করিয়া দিতে পারে না, তখনই দেহকে রক্ষা করিবার জন্য কোন আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের ভিতর দিয়া উহা বাহির করিয়া দিতে চেষ্টা করে।

কখন কখন প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্যভাবে দেহের আবর্জনা বাহির করিয়া দিতে চায়। সময় সময় দেহে বিশেষত তলপেটে যখন প্রচুর দূষিত পদার্থ জমিয়া উঠে, তখন প্রকৃতি অনেক সময় নিম্নদিকস্থিত স্বাভাবিক দরজা দিয়া তাহা বাহির করিয়া দেয়। তখন ইহাকে আমরা বলি ডাইরিয়া, আমাশয় অথবা আর কিছু।

কখন কখন প্রকৃতি পাঁচড়া, ফোড়া, টিউমার, ঘাম, বসন্ত প্রভৃতি উৎপন্ন করিয়া দেহ-সঞ্চিত রোগবিষ চর্মের পথে বাহির করিয়া দিতে চেষ্টা করে। সুতরাং যে-কোন রোগই আমাদের হউক না, তাহার নাম আমরা নিউমোনিয়া বলি, ডাইরিয়া বলি বা টিউমার বলি, তাহাদের প্রকাশ বিভিন্ন হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা একই রোগ—সমস্তই দেহ-সঞ্চিত দূষিত পদার্থ হইতে উৎপন্ন। দেহে দূষিত পদার্থের অবস্থিতিই সমস্ত রোগের মূল কারণ এবং সেই কারণ দূর করিবার প্রকৃতির যে বিভিন্ন চেষ্টা তাহার নামই রোগ।

[৪]

কেহ কেহ মনে করেন, সমস্ত রোগই পৃথক পৃথক রোগ-জীবাণু হইতে উৎপন্ন হয়—আমাদের যত কিছু রোগ হয়, তাহার সমস্তই বিভিন্ন জাতীয় কতগুলি জীবাণুর ক্রিয়া। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ইহাই, পৃথিবীতে যত কিছু রোগ-জীবাণু দৃষ্ট হয়, সমস্তই সুস্থ দেহের ভিতর পাওয়া যায়। অথচ তাহারা দেহের কিছু মাত্র অনিষ্ট করিতে পারে না।

একজন বিখ্যাত ফরাসী জীবাণুতত্ত্ববিৎ বলিয়াছেন যে, দুই মাসের একটি শিশুর মুখে ডাক্তারী শাস্ত্রে যত প্রকার রোগজীবাণুর কথা আছে, তাহার সবগুলিই তিনি পাইয়াছেন। অথচ শিশুটি সুস্থই ছিল।

ফ্রান্সের আর একজন ডাক্তার International Tuberculosis Congress এর রোম অধিবেশনে বলিয়াছেন যে, শতকরা ৯৫টি স্কুলের ছাত্রের দেহে তিনি যক্ষ্মারোগের জীবাণু পাইয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে এমন লোক নাই যাহার দেহে বিভিন্ন জাতীয় রোগ-জীবাণু না আছে। কিন্তু তাহার জন্য কাহারো কিছুই অনিষ্ট হয় না।

বাহির হইতেও যদি জীবাণু দেহে প্রবেশ করে তাহা হইলেও দেহের স্বাভাবিক অবস্থায় যে কিছু অনিষ্ট হয় তাহা নয়। ভিয়েনার সুবিখ্যাত ডাক্তার ও অধ্যাপক পেথেন কোফার একবার তাঁহার ছাত্রদের সম্মুখে অঙ্গনৃত্য (chorea) রোগের লক্ষ লক্ষ রোগজীবাণু একটা গ্লাস হইতে গিলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার কিছুই হইল না (G. S. Kikla—Natural Ways of Cure P. 14-15)।

ইহার পর বহুস্থানে এই ভাবে জীবাণুর সত্যকার মূল্য পরীক্ষা করা হইয়াছে।

জার্মেনীর একজন অধ্যাপক (Dr. Pentenkoffer of Munich) বহু লক্ষ কলেরা রোগের কমা জীবাণু একদিন পান করিয়া সকলকে দেখাইলেন, জীবাণু পেটের ভিতরে গেলে কিছুই হয় না। ইহার কয়দিন পর আর একজন ডাক্তার (Prof. Emmrich) লক্ষ লক্ষ কলেরা জীবাণু-পূর্ণ জল (culture) খাইয়া ফেলিলেন। ইহাতে তাহার কোন ক্ষতিই হইল না।

সর্বশেষে ডাঃ পাওয়েল (Dr. Thomas Powell) তাঁহার দেহে ডাক্তারগণকে বিভিন্ন জীবাণু ইনজেক্ট করিতে আহ্বান করিয়া নিঃশেষে প্রমাণ করিয়াছেন, জীবাণুতত্ত্ব কিরূপ অতিরঞ্জিত ধারণার

উপর প্রতিষ্ঠিত। ডাক্তারেরা আসিয়া তাঁহার দেহে বার বার ডিপথিরিয়া, টাইফয়েড, ক্যান্সার ও যক্ষ্মার জীবাণু ইনজেক্ট করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন অনিষ্টই হয় নাই (James Raymond Devereux—Eating to Banish Disease, P. 90—91)।

সুতরাং কোন জীবাণু আক্রমণ করিলেই যে আমরা রুগ্ন হই তাহা নয়। যতক্ষণ দেহ বিশুদ্ধ থাকে এবং তাহার জন্য দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (vital resistance) অক্ষুণ্ণ থাকে, ততক্ষণ কোন রোগ জীবাণুই দেহের কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারে না। যখন দেহে যথেষ্ট দূষিত পদার্থের সঞ্চয় হয় এবং ঐ-সঞ্চিত দূষিত পদার্থ দ্বারা যখন রক্তস্রোত বিষাক্ত হইয়া উঠে, তখনই মাত্র তাহার ভিতর বিভিন্ন জীবাণুর বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব হয়। ঐ-অবস্থায় দেহস্থিত বিভিন্ন জীবাণুই যে কেবল মারাত্মক হইয়া উঠে তাহা নয়, ঐরূপ ক্ষেত্রে দেহের ভিতর বিভিন্ন জীবাণু আপনা হইতে জন্ম গ্রহণ করে এবং বাহির হইতে আসিলেও দেহের ভিতর দ্রুত বিস্তার লাভ করে। দেহে দূষিত পদার্থের সঞ্চয় থাকিলেই কেবল তাহার ভিতর জীবাণু বৃদ্ধি পাইতে পারে। যেখানে ময়লা থাকে, সেখানেই জীবাণু থাকে। দেহে জীবাণু বিস্তারের এই অনুকূল অবস্থা (predisposition) না থাকিলে, কোন জীবাণুই দেহের কিছুমাত্র ক্ষতি করিতে পারে না।

লুইকুনে বলিয়াছেন, বনের ভিতর একটা পুরাতন বৃক্ষ হয় তো কীটজীর্ণ হইয়া খসিয়া পড়িতেছে। কিন্তু তাহারই পার্শ্বে আবার নূতন একটি চারা গাছ প্রবল তেজে আকাশে মাথা তুলিয়া উঠিতেছে। ঐ মৃতপ্রায় বৃক্ষের রোগজীবাণু পুরাতন গাছের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিতেছে, অথচ তাহারাই নূতন গাছটির কোন অনিষ্ট করিতে পারিতেছে না কেন? পারে না এই জন্য যে, পুরাতন বৃক্ষে এমন সকল বিজাতীয় পদার্থ সঞ্চিত আছে, যাহার উপর কীটগুলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু নূতন চারাগাছটিতে কীটগুলির বৃদ্ধি পাইবার

মত বিজাতীয় পদার্থ নাই। নূতন চারা গাছে, কীট আসিতে পারে, কিন্তু তাহারা তাহাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না। সুতরাং নূতন গাছের কোনও অনিষ্ট করাও তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

সুতরাং রোগ-চিকিৎসায় কেমন করিয়া জীবাণু হত্যা করিতে হইবে তাহাই বড় কথা নয়, কেমন করিয়া দেহকে আবর্জনা-মুক্ত করিতে হইবে, তাহাই বড় কথা। দেহের দূষিত পদার্থ সরাইয়া দিলে, দেহে জীবাণু যদি প্রবেশ করেও, তাহারা কখনও এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত বা মারাত্মক হইতে পারে না যে, তাহাদের দ্বারা দেহের কোন ক্ষতি হইতে পারে।

এই দূষিত পদার্থের সঞ্চয় হইতে দেহকে মুক্ত না করিলে, কোন রোগেরই কোন চিকিৎসা চলিতে পারে না। ভিতরের আবর্জনা অব্যাহত রাখিয়া বাহির হইতে ঔষধ ঢালিলে তাহাতে দুই একটা রোগ-লক্ষণ সাময়িক ভাবে চাঁপা পড়িতে পারে মাত্র, কিন্তু রোগের যে মূল কারণ তাহা দূর হইলেই কেবল রোগ দূর হয়।

এক জনের ঘরে আবর্জনা জমিয়া দুর্গন্ধ গ্যাস বাহির হইতেছে। সে কতগুলি ঔষধ আনিয়া আবর্জনার উপর ঢালিয়া দিল। গ্যাস অমনি বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু কিছু দিন পর তাহা হইতে আবার ক্লেদ নির্গত হইতে লাগিল। গৃহস্বামী আবার আর একটা ঔষধ দিয়া ক্লেদ বন্ধ করিল। অবশেষে আবর্জনা হইতে লক্ষ লক্ষ মাছি ও পোকা উৎপন্ন হইল। সে আবার ঔষধ ঢালিতে লাগিল। শেষে গৃহের অবস্থা এমন হইল যে, রোগ অপেক্ষা ঔষধের জ্বালাই বেশী হইয়া উঠিয়াছে। তখন গৃহস্বামীর জ্ঞান হইল। সে ঔষধের বোতলগুলি দূরে ফেলিয়া দিয়া কয়েক বালতি জল দিয়া ঘরটা ধোয়াইয়া দিল। গৃহের আবর্জনা যখন বাহির হইয়া গেল, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস গেল, ক্লেদ গেল, পোকা গেল,—সমস্ত ভাসিয়া গেল। রোগের কারণ যখন রহিল না, তখন গৃহের ভিতর জীবাণু প্রভৃতির থাকাই অসম্ভব হইল।

ডোবার ভিতর মশক জন্মে। আমরা ঔষধ ঢালিয়া অনেক মশা নষ্ট করিতে পারি। কিন্তু তাহাতে নূতন মশকের উৎপত্তি বন্ধ হইবে না। যে অনুকূল অবস্থায় মশকের জন্ম ও বৃদ্ধি সম্ভব হয়, তাহা দূর করিতে পারিলেই মশককুল সমূলে বিনষ্ট হইবে। ডোবাটি নষ্ট কর—একটি মশকের গায় হাত না দিয়াও সমস্ত মশক মারিয়া ফেলিতে পারিবে।

আমাদের দেহেও যে-সকল রোগ-জীবাণু উৎপন্ন ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় আমাদের দেহের ভিতর পূর্ব হইতে তাহাদের বৃদ্ধি পাইবার মত অনুকূল অবস্থা থাকিলেই কেবল তাহারা বৃদ্ধি পাইতে পারে। ঐ-রূপ অনুকূল অবস্থা থাকিলে বিজাতীয় পদার্থের তারতম্য ও স্থানভেদ অনুসারে, তাহাতে বিভিন্ন প্রকারের রোগ-জীবাণু উৎপন্ন হয় অথবা বাহির হইতে আসিয়া তাহাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যখন সেই বিজাতীয় পদার্থ দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া যায়, তখন সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রোগ-জীবাণু ও জীবাণু-বিষও বাহির হইয়া যায়।

দেহের আবর্জনা বাহির করিয়া দিবার জন্য প্রকৃতি তিনটি প্রধান নির্গম-পথ রাখিয়াছেন। প্রথম মলদ্বার, দ্বিতীয় মূত্রদ্বার ও তৃতীয় লোমকূপ। প্রকৃতির এই স্বাভাবিক দ্বার দিয়া যখন দেহের দূষিত পদার্থগুলি নির্গমন-পথ পায়, তখন আমাদের কোন রোগ হয় না। রোগ যখন হয়, তখনও এই সকল দরজা দিয়া দেহের বিজাতীয় পদার্থ বাহির করিয়া দিয়া দেহকে আমরা রোগমুক্ত করিতে পারি। আতপ-স্নান, উষ্ণ পাদ-স্নান (hot foot bath) অথবা ভিজা চাদরের প্যাক (wet-sheet-pack) প্রভৃতির দ্বারা দেহের দূর দূর প্রদেশে সঞ্চিত বিজাতীয় পদার্থ লোম-কূপের ভিতর দিয়া ঘর্মের সহিত এবং অন্যান্য পথে বাহির করিয়া দেওয়া যায়; ক্ষুদ্রান্ত্রে ও বৃহদন্ত্রে যে-মল জমিয়া থাকিয়া সর্ব ব্যাধির সূতিকা-গৃহ স্বরূপ হয়, হিপবাথ (hip bath), ভিজা কোমরপটি (wet girdle) অথবা পেটে মাটির

পুলটিস প্রভৃতি দিয়া সেই মল বাহির করিয়া দিতে পারি। যথেষ্ট জল পান করিয়া মূত্রের সঙ্গেও যথেষ্ট বিষ বাহির করিয়া দেওয়া যায়।

যখন প্রকৃতি এই ভাবে এবং আরও অন্যান্য প্রকারে ভারমুক্ত হয়, তখন দেহে আর কোন রোগ থাকাই অসম্ভব হইয়া উঠে। কারণ সমস্ত অসুখই দেহ-সঞ্চিত দূষিত পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়। দূষিত পদার্থই যখন দেহ হইতে নামিয়া যায়, তখন কাঠ অভাবে যেমন আগুন জ্বলিতে পারে না, তেমনি রোগের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে।

তৃতীয় অধ্যায়

কোষ্ঠ পরিষ্কারের উপায়

[১]

আমাদের দেহের ভিতর তলপেটটিই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ আঁস্তাকুড়। এই স্থানেই দুষিত মল জমিয়া দেহের ভিতর প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন রোগ উৎপন্ন করে। এই জন্য অনেক সময় কেবল অন্ত্র দুইটি দোষশূন্য করিলেই বহু রোগ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। আবার অন্ত্রের এই দোষযুক্ত অবস্থা বাড়াইয়া না তোলে এমন রোগই নাই। অনেক সময় তলপেটটি অপরিষ্কার থাকার জন্যই রোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়। এই জন্য আমাদের যে-কোন রোগই হউক না কেন, প্রথমেই তলপেটটি পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক।

অন্ত্র দুইটিকে পরিষ্কার ও দোষশূন্য করিতে হিপবাথের (Hip bath) মত আর কিছুই নাই। দেহের উপর কিছুমাত্র অত্যাচার না করিয়া অত্যন্ত সহজে ইহা কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া দেয়।

হিপবাথ লইবার পদ্ধতি

একটা গামলায় পা বাহিরে রাখিয়া বসিয়া জলের ভিতর অনবরত তলপেট ও কুঁচকি ঘর্ষণ করিলেই হিপবাথ নেওয়া হয়।

যে-কোন একটা বড় টব বা গামলা হইলেই তাহার ভিতর হিপবাথ গ্রহণ করা যায়। মাটির, কাঠের, টিনের অথবা পিতলের যে-কোন একটা

টাব হইলেই চলে। গামলা কি টব এত বড় হওয়া আবশ্যক, রোগী উহার ভিতর বসিলে, তাহার নাভি পর্যন্ত যেন জলে ডোবে।

গামলাটি প্রথম জলে পূর্ণ করিয়া তাহার ভিতর পা বাহিরে রাখিয়া বসিতে হয়। রোগী গামলার ভিতর বসিলে তাহার জানুর অর্ধেক হইতে নাভি পর্যন্ত জলে ডুবিয়া থাকিবে এবং পা ও নাভির উপরের সমস্ত দেহ জলের বাহিরে থাকিবে।

যে-জলে বাথ নিতে হইবে, তাহার উত্তাপ দেহের উত্তাপ অপেক্ষা সর্বদাই কম (৬৪° ডিগ্রি হইতে ৭৭° ডিগ্রি পর্যন্ত) হওয়া আবশ্যক। কিন্তু প্রথমেই খুব শীতল জলে হিপবাথ গ্রহণ করিতে নাই। প্রথম দুই তিন দিন নাতিশীতোষ্ণ জল ব্যবহার করিয়া, ক্রমশ অভ্যস্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত বেশী শীতল জল ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু জ্বরের সময় প্রথমেই শীতল জল ব্যবহার করা কর্তব্য। তথাপি বরফের মত শীতল জল কথনই ব্যবহার করা উচিত নয়।

প্রথম দিন চার পাঁচ মিনিটের জন্য বাথ গ্রহণ করা কর্তব্য। তাহার পর প্রতিদিন দুই এক মিনিট করিয়া সময় বাড়াইয়া পরে অর্ধঘণ্টা অথবা জলের ভিতর বসিয়া থাকিতে যতক্ষণ আরাম বোধ হয়, ততক্ষণই বসিয়া থাকা যাইতে পারে। শীতকালে দশ মিনিটের বেশী সময় বাথ নিবার আবশ্যক হয় না; গ্রীষ্মকালে অপেক্ষাকৃত অধিক সময়ের জন্য নেওয়া যাইতে পারে। শিশু, অতিবৃদ্ধ অথবা দুর্বল রোগীদিগকে অত্যধিক সময়ের জন্য হিপবাথ প্রয়োগ করা উচিত নয়। সাধারণত এই সকল লোকের পক্ষে অর্ধেক সময় বাথ নেওয়া বিধি।

বাথ নিবার সময় সর্বদার জন্য তলপেট ও উরুসন্ধি ঘর্ষণ করা আবশ্যক। এই ঘর্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই বাথে সর্বদা ঘর্ষণ করিতে হয় বলিয়াই ইহার ইংরেজী নাম friction hipbath—ঘর্ষণযুক্ত কটি-স্নান। বাথে বসিয়া ঘর্ষণ করিবারো বিশেষ একটা পদ্ধতি আছে।

যে-লাইনে আমাদের বৃহদন্ত্র (large intestine) রহিয়াছে, সে-লাইনে ডান দিকের নিম্নতম প্রদেশ হইতে হাত উর্ধ্ব-দিকে তুলিয়া নাভির কতকটা উপরে দিয়া হাত অপর পার্শ্বে নিয়া আবার নিম্নদিকে নিতে হয়। সমগ্র তলপেটটি অর্ধ-চন্দ্রাকারে ডান দিক হইতে বাদিকে এবং উর্ধ্ব হইতে অধোদিকেও ঘর্ষণ করা আবশ্যক। ইহা বৃহদন্ত্রের (colon) সঞ্চিত মল বাহির করিয়া দিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এই সঙ্গে অবশ্যই কুঁচকি দুইটি এবং গুহ্যদ্বার পর্যন্ত জননেন্দ্রিয়ের বহির্ভাগ ঐ-ভাবে ঘর্ষণ করা কর্তব্য। সাধারণত খালি হাতে ঘর্ষণ করিলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু কেহ ইচ্ছা করিলে একখানা খদ্দরের নেকড়া কি ছোট তোয়ালে দ্বারা ঘর্ষণ করিতে পারেন। পেট ঘর্ষণ করিবার সময় সর্বদাই একটু চাপ দিয়া ঘর্ষণ করা কর্তব্য। কিন্তু বেশী চাপ দেওয়াও উচিত নয়।

হিপবাথ (Hip bath)

হিপবাথে বসিবার সময় সর্বদাই পিছনের দিকে একটু হেলান দিয়া বসা আবশ্যক। এই জন্য হেলান দিয়া বসা চলিতে পারে টবটা এইরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে ঐ-সঙ্গে কতকটা মেরুদণ্ড স্নানেরও (spinal bath) ব্যবস্থা হয়। মেরুদণ্ডের ভিতর যে স্নায়ুগুচ্ছ রহিয়াছে, তাহা শীতল হইলে শৈত্যের প্রতিক্রিয়ায় সমস্ত দেহে একটা উদ্দীপনা আসে এবং দেহের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা যথেষ্টরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

হিপবাথে বসিবার সময় শরীরের যে-অংশ জলের বাহিরে থাকিবে, মাথা ও মুখ ব্যতীত তাহার সমস্ত অংশ ভালরূপে ঢাকিয়া লওয়াই বিধি। সাধারণ অবস্থায় একখানা কম্বল দ্বারা শরীর ঢাকিয়া বসিলেই যথেষ্ট হয়। যদি পায় গরম মোজা পরা থাকে তবে আরো ভাল হয়। সাধারণ টবে বাথ নিলে অনেক সময় কম্বল না দিয়াও একটা জামা গায় দিয়া জামার নিম্নাংশ উপরে তুলিয়া ঘাড়ের কাপড়ের সঙ্গে সেপটিপিন দিয়া আঁটিয়া দেওয়া যায়। ইহাতে জামা ভিজিবার সম্ভাবনা থাকে না।

তবে সুস্থকায় ব্যক্তিগণ গ্রীষ্মকালে সর্বদেহ অনাবৃত রাখিতে পারেন।

কিন্তু যে-সকল লোক অত্যন্ত রুগ্ন ও দুর্বল, অথবা যাহাদের বাতব্যাধি (rheumatism) আছে অথবা যাহাদের হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যায়, তাহাদিগকে বিশেষ সতর্কতার সহিত হিপবাথ প্রয়োগ করিতে হয়। হিপ-বাথে বসিবার সময় তাহাদের পা দুইটি পৃথক একটা ছোট গামলায় গরম জলে ডুবাইয়া বসানই কর্তব্য। ইহার পূর্বে মাথাটি অবশ্যই শীতল জল দ্বারা ভাল করিয়া ধুইয়া লওয়া আবশ্যক এবং মাথায় একখানা ভিজা তোয়ালে জড়াইয়া রাখা কর্তব্য। সুস্থ লোকদের এই ভাবে হিপবাথ নিতে কোন বাধা নাই। হিপবাথ গ্রহণ করার পর পূর্ণস্নান গ্রহণ করাই সাধারণ বিধি। কিন্তু দুর্বল, শিশু ও অত্যধিক বৃদ্ধগণকে গা মোছাইয়া দিলেও চলে। গা মুছিবার সময় রোগী প্রথম কণ্ঠা হইতে কোমর পর্যন্ত শীতল জলে ধৌত করিবেন, পরে কাঁধ হইতে কোমর, শেষে পর পর ডান হাত, বাঁ হাত, মাথা এবং সকলের শেষে টব হইতে উঠিয়া পা ধুইয়া ফেলিবেন। শরীর ধুইয়া ফেলিবার পর সবল লোকেরা ইচ্ছা করিলে পূর্ণস্নাণ গ্রহণ করিতে পারেন।

হিপবাথ গ্রহণ করিবার পূর্বে বিশেষভাবে লক্ষ করা আবশ্যক, শরীরটি বিশেষত তলপেট গরম আছে কিনা। যদি তাহা না থাকে তবে দেহের অবস্থা অনুসারে ব্যায়াম করিয়া, রৌদ্রে ঘুরিয়া অথবা দেহ ভাল করিয়া মর্দন করিয়া লইয়া তাহার পর হিপবাথ গ্রহণ করা কর্তব্য।

হিপবাথ লওয়ার অর্ধ ঘণ্টার ভিতর দিবা বা রাত্রির প্রধান আহার গ্রহণ করা কিছুতেই উচিত নয়। কারণ বাথ নিবার পর কতক্ষণ পর্যন্ত পেট ঠাণ্ডা থাকে। সেখানে পুনরায় উত্তাপ না আসা পর্যন্ত কিছুই আহার করা চলিতে পারে না। দিবা বা রাত্রির প্রধান আহার

করার পরও চার ঘণ্টার মধ্যে হিপবাথ নেওয়া উচিত নয়। নিলে হজমের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে।

সাধারণ অবস্থায় দিনে এক বার হিপবাথ গ্রহণ করাই যথেষ্ট ; কিন্তু পুরাতন রোগে দিনে দুইবার গ্রহণ করা আবশ্যক এবং জ্বর রোগে দিনে তিনবার গ্রহণ করা কর্তব্য।

[২]

হিপবাথের উপকারিতা

হিপবাথের প্রধান গুণ এই, নির্দোষ উপায়ে কোষ্ঠ পরিষ্কার করিতে ইহার জুড়ি নাই। শৈত্য দেহকে স্বভাবত সঙ্কুচিত করে। যখন তলপেটের উপর ঠাণ্ডা পড়ে, তখন ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্র উভয়ই সঙ্কুচিত হয় এবং অন্ত্রের ভিতর তাহা প্রবল ক্রিমিগতি (peristalsis) উৎপন্ন করে। এই জন্য শীতল জলে হিপবাথ গ্রহণ করিলে অনেক সময় অত্যন্ত অল্প সময়ে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া যায়।

তথাপি সাময়িক উপকার অপেক্ষা স্থায়ীভাবে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করিতেই ইহা বিশেষভাবে সাহায্য করে। হিপবাথে বসিয়া পদ্ধতি অনুযায়ী তলপেট মর্দনে তলপেটের মাংসপেশীগুলি সবল হয় এবং অন্ত্রের ক্রিমিগতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

ঘর্ষণ সহ হিপবাথে প্রথম তলপেট হইতে রক্ত সরিয়া যায়। যখন রক্ত চলিয়া যায়, তখন তলপেটের তন্তুগুলির ভিতর হইতে বহু দূষিত পদার্থ লইয়া বাহির হইয়া যায়। তাহার কতক্ষণ পর নূতন রক্ত আবার আসে এবং রক্ত যখন আসে তখন দেহ গঠনের নূতন মসলা লইয়া আসে। এই জন্য কিছুদিন পর্যন্ত ঘর্ষণ সহ হিপবাথ গ্রহণ করিলে অন্ত্র দুইটি এরূপ সবল হয় যে, প্রতিদিন আপনা হইতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

হিপবাথে যে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় তাহার অন্যতম প্রধান কারণ ইহাই

যে, ইহা দ্বারা তলপেটের স্নায়ুগুলি অত্যন্ত সবলতা লাভ করে। তলপেটে ঠাণ্ডা প্রয়োগে প্রথম স্নায়ুগুলি একটু সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু তাহার প্রতিক্রিয়ায় উহারা এমন সবল ও সতেজ হয় যে, অন্ত্রের ভিতর মল কিছুতেই সুদীর্ঘ সময় সঞ্চিত থাকিতে পারে না। নিয়মিত ভাবে কিছু দিন এই ভাবে হিপবাথ গ্রহণ করিলে স্নায়ুগুলি স্থায়ীভাবে সবলতা লাভ করে।

কাহারও কাহারও তলপেটে এত উত্তাপ থাকে যে, মলের ভিতর যে-রস থাকে, ঐ-উত্তাপ তাহা শুষিয়া লয় এবং মলগুলিকে শুষ্ক করিয়া প্রায় পোড়াইয়া ফেলে। ইহাতে মলগুলি অন্ত্রের ভিতর অত্যন্ত কঠিন ও শক্ত হইয়া যায়। এই অবস্থাকেই কোষ্ঠকাঠিন্য বলে। ঘর্ষণ সহ হিপবাথে ঐ-উত্তাপ জলের ভিতর নামিয়া আসে। তখন অন্ত্রের ভিতর মল কিছুতেই শক্ত হইতে পারে না।

অন্ত্রের অবস্থা যত খারাপই হউক না কেন, কিছুদিন দুই বেলা হিপবাথ গ্রহণ করিলে অত্যন্ত কঠিন যে রোগী তাহারও দুই বেলা প্রতিদিন কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার দেয়াশী নামে বড় বাজারের একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী সাত বৎসর পূর্বে সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ঐ-আক্রমণ হইতে তিনি বাঁচিয়া উঠেন, কিন্তু তাঁহার অর্ধাঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া যায়। ঐ-সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মলত্যাগের স্বাভাবিক শক্তিও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এইজন্য প্রত্যেক দিন তিনি ডুস নিতেন এবং সপ্তাহে একবার জোলাপ গ্রহণ করিতেন। তাহা ব্যতীত কিছুতেই তাঁহার মলত্যাগ হইত না। আমি তাঁহাকে ভিজা চাদরের প্যাক (wet-sheet pack) দিয়া প্রতিদিন হিপবাথের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম এবং পথ্য স্থির করিয়া দিলাম। ইহার চার দিন পর হইতেই পূর্ণ সাত বৎসর পর প্রথম তাঁহার স্বাভাবিক মলত্যাগ হইল এবং তাঁহার পর আর অল্প কিছু দিনের মধ্যেই অন্ত্রের অবস্থা স্বাভাবিক হইয়া উঠিল। ইনি অতিকষ্টে কয়েক

পা মাত্র হাঁটিতে পারিতেন। মাস তিনেক জল-চিকিৎসা করিবার পরেই তিনি বালিগঞ্জ লেকের অর্ধেকটা প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে ঘুরিয়া আসিতে সক্ষম হইলেন। তাঁহার ব্লাড প্রেসারও অত্যন্ত অধিক ছিল। কিছুদিন জলচিকিৎসা করিবার পর তাঁহার রক্তের চাপও অনেক কমিয়া গেল। হিপবাথের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিতভাবে তাঁহাকে বাস্পস্নান, ভিজা চাদরের প্যাক, ভিজা কোমর পটি, আতপ-স্নান এবং তলপেট, লিভার ও মেরুদণ্ড প্রভৃতিতে একান্তর পটি (alternate compress) দেওয়া হইয়াছিল।

হিপবাথ দ্বারা যে কেবল কোষ্ঠই পরিষ্কার হয় তাহা নয়, ইহা যকৃৎ (liver), ক্লোম (pancreas) ও অন্ত্রের রসস্রাব (secretion) বৃদ্ধি করে এবং খাদ্য দ্রব্য হইতে অন্ত্রের রসশোষণের ক্ষমতা বহুগুণে বাড়াইয়া দেয়। এই জন্য ইহাতে যে কেবল কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় তাহাই নয়, যাহাদের অজীর্ণ রোগ থাকে, তাহাদের অজীর্ণও ইহাতে ভাল হয় এবং হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়। পেটের অসুখের সময় যদি পেট গরম থাকে, তবে দিনে দুই তিন বার হিপবাথ গ্রহণ করিলে প্রবল উদারময়ও আরোগ্য হয়। অগ্নিমান্দ্য রোগে কয়েকদিন হিপবাথ চালাইলে অন্ত্র দুইটি পরিষ্কার হইয়া যায় এবং তখন আপনা হইতে ক্ষুধা হয়।

প্রকৃত পক্ষে অন্ত্রের প্রায় যাবতীয় ব্যাধি ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। বাকুড়ার মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ওয়ালামজী লালজী ছেলে বেলা হইতে পেটের বিভিন্ন রোগে ভুগিতেছিলেন। সাধারণত সাত আট দিনের ভিতর তাঁহার মলত্যাগ হইত না। তাহার পর কয়েক দিন কেবল আম পড়িত। শেষে অনেক ভিতরে মল আসিত। কিন্তু তাহাও স্বাভাবিক ভাবে পড়িত না। একটা আঙুল অনেকটা ভিতরে ঢুকাইয়া দিয়া বহুক্ষণ বসিয়া তাহাই একটু একটু করিয়া বাহির করিয়া আনিতে হইত। কবিরাজী, এলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী প্রভৃতি সকল রকম চিকিৎসা শেষ করিয়া তিনি আমার নিকট আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে

একখানা খাতা ছিল। তাহাতে রোগের দৈনন্দিন বিবরণ তিনি ধারাবাহিক ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ খাতা খানা এত বড় হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহা ছাপাইলে দুই শত পৃষ্ঠার বড় একখানা বই হয়। আমি তাঁহাকে একটা ষ্টিমবাথ প্রয়োগ করিয়া প্রতিদিন হিপবাথ দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ভিজা কোমর পটি (wet girdle), তলপেটের একান্তর পটি (alternate compress) ও সুনির্দিষ্ট পথ্যের ব্যবস্থা করা হইল। প্রধাণত এই চিকিৎসাতেই তাঁহার চিরকালের সঙ্গী আম কমিয়া গেল এবং দুই সপ্তাহের ভিতরই নিয়মিত ভাবে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া যাইতে লাগিল।

হিপবাথ দেহের নির্দিষ্ট অংশে প্রয়োগ করিলেও স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ায় ইহা সমস্ত দেহের উপরই প্রভাব বিস্তার করে। এই জন্য হিপবাথ গ্রহণ দ্বারা বহু রোগ হইতেই অব্যাহতি লাভ করা যায়।

জ্বরের সময় দিনে তিন বার হিপবাথ গ্রহণ করিলে অধিকাংশ জ্বরই অত্যন্ত সহজে আরোগ্য হয়। দেহের তাপ কমাইবার জন্যই যে ইহা জ্বর কমায় তাহা নয়, হিপবাথে দেহের সমস্তগুলি স্নায়ুই এরূপ সতেজ হয় যে, তাহারা রোগবিষ ঠেলিয়া দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। তাহার জন্যই জ্বর আপনি কমে।

প্রবল মাথাধরায় হিপবাথ মন্ত্রশক্তির মত কার্য করে। এই জন্য মাথায় ঠাণ্ডা দিয়া পায় গরম দেওয়া আবশ্যক। তাহাতে মাথার রক্ত নীচে নামিয়া আসে এবং মাথাধরা অত্যন্ত সহজে আরোগ্য হয়।

যাহাদের দেহ ক্রমশ শুকাইয়া যায়, হিপবাথ তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর।

যাহাদের চুল উঠিয়া মাথার উপর টাক পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, তাহারা স্নানের পূর্বে প্রতিদিন কটিস্নান নিলে অন্ত্রের অতিরিক্ত তাপ নষ্ট হয়। সুতরাং তাহা মাথায় উঠিয়া মাথা গরম করিয়া মাথার চুলও

উঠাইয়া দিতে পারে না। নিয়মিত এইরূপ বাথ নিলে মাথায় নূতন চুল গজায়।

নিদ্রাহীনতা রোগে (insomnia) প্রতি দিন দুই বার হিপবাথ গ্রহণ করিলে প্রায়ই অনিদ্রা দূর হয়।

স্ত্রীলোকদিগের গর্ভপাতের লক্ষণ দেখা দিলে ২০ হইতে ৩০ মিনিটের হিপবাথে গর্ভপাত বন্ধ হয়। কিন্তু এই অবস্থায় অত্যন্ত মৃদু ভাবে পেটটি ঘর্ষণ করা আবশ্যক।

যে-সকল স্ত্রীলোক সন্তান হইবার সময় অত্যন্ত কষ্ট পান, প্রসবের কয়েক মাস পূর্ব হইতে নিয়মিত হিপবাথ গ্রহণ করিলে, সম্পূর্ণ বিনা ক্লেশে এবং নিরাপদে তাঁহাদের প্রসব হইয়া যায়। আমার একটি রোগিণীকে এই অবস্থায় আমি নিয়মিত হিপবাথ গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলাম। প্রসবের চার মাস পূর্ব হইতে স্নানের পূর্বে প্রতিদিন তিনি হিপবাথ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার যখন সন্তান হইল, তখন তাঁহার পার্শ্বে ধাত্রী ঘুমাইয়া আছে। সন্তান প্রসব হইবার পর তিনি ধাত্রীকে ডাকিয়া তুলিলেন।

স্ত্রীলোকদিগের পুরাতন রক্তস্রাব রোগেও ইহাতে বিশেষ ফল হয়। প্রকৃত পক্ষে যাবতীয় স্ত্রী-রোগেই হিপবাথ অত্যন্ত উপকারী। In the female troubles the cold hipbath has preserved many sufferers from surgeon's knife—স্ত্রীরোগে কটি-স্নান গ্রহণ করিয়া বহু রোগী ডাক্তারের ছুরি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন (W. R. Latson, M. D.—Common Disorders, P. 322)।

মূত্রাশয় (bladder), অন্ত্র ও জরায়ু প্রভৃতির রোগে এবং অর্শ প্রভৃতিতে যখন অত্যধিক রক্তস্রাব হয় তখন ইহা অত্যন্ত ফলদায়ক হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ-সময় পা দুইটি গরম জলে অবশ্যই ডুবাইয়া রাখা আবশ্যক। তাহাতে তলপেটের অতিরিক্ত রক্ত পায় নামিয়া যায় এবং ঠাণ্ডা পাইয়া তলপেট সঙ্কুচিত হয় বলিয়া রক্তস্রাব বন্ধ হয়। ইংরেজী ভাষায় ইহাকে

বলে, derivative treatment—রোগের মোড় ঘুরাইয়া দিবার চিকিৎসা।

বেদনা না থাকিলে তলপেটের যে-কোন পুরাতন প্রদাহেও ইহা বিশেষ ভাবে ফলদায়ক হয়। জননেন্দ্রিয়ের দৌর্বল্যেও (in impotence) ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা দ্বারা জীবনীশক্তি এরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে, নিয়মিত ভাবে হিপবাথ গ্রহণ করিলে পক্ষাঘাত, ক্যান্সার এমন কি যক্ষ্মা পর্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে না।

অনেক শিশু আছে, যাহারা ঘুমের ভিতর মূত্রত্যাগ করে। এই সকল শিশুকে অল্প সময়ের জন্য হিপবাথ প্রয়োগ করিলে তাহাদের ঐ রোগ আরোগ্য হয়।

মেধা, ধৈর্য, বুদ্ধি এবং মস্তিষ্কের যাবতীয় কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে হিপবাথের সমতুল্য অল্পই আছে। লণ্ডনের একজন বিখ্যাত ডাক্তার প্রতিদিন রোগীদিগের সম্মুখে আসিবার পূর্বে কতক্ষণ হিপবাথ গ্রহণ করিয়া তবে আসিতেন। তিনি বলিতেন, যদি তিনি একবার শীতল জলে হিপবাথ গ্রহণ করিয়া লইতে পারেন, তবে তাঁহার সম্মুখে যত রোগীই আসুন না কেন, তিনি তাহাদের সকলের সঙ্গেই ধীরে স্থির ভাবে কার্য করিয়া যাইতে পারেন (J. H. Kellogg, M. D.—Rational Hydro-therapy, P. 766)।

হিপবাথ সম্বন্ধে লুইকুনে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, হিপবাথ দ্বারা আরোগ্য না হইতে পারে এমন রোগই নাই। ইহা বলিয়া লুইকুনে যে খুব অতিশয়োক্তি করিয়াছেন তাহা নয়। কারণ চরক বলিয়াছেন, কোষ্ঠ বিশুদ্ধ হইলে অন্তরাগ্নি বর্ধিত হইয়া থাকে, ব্যাধি সকল শান্ত হয়, দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়া চলিতে থাকে, ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি প্রসন্ন হয় এবং বল ও পুষ্টি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে (সূত্রস্থনম্, ১৬।৯)।

[৩]

হিপবাথের প্রকার ভেদ

জার্মেনীর প্রসিদ্ধ প্রাকৃতিক চিকিৎসক জুষ্টের মতে আরও অনেক সহজ ভাবে হিপবাথ গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাতে খুব বড় গামলার প্রয়োজন হয় না। একটা গামলায় প্রায় তিন ইঞ্চি পরিমিত জল দিয়া তাহার উপর বসিতে হয়। ইহাতে দেহের অল্পাংশ মাত্র জলে ডোবে এবং জানু হইতে পা ও সমস্ত ঊর্ধ্বদেহ জলের বাহিরে থাকে। রোগী গামলায় বসিয়াই গামলা হইতে হাতে করিয়া জল তুলিয়া লইয়া অর্ধেক সময় অনবরত তলপেট রগড়াইবেন এবং বাকী সময় উরুসন্ধি (কুঁচকি), জননেন্দ্রিয়ের বহির্ভাগ এবং গুহ্যদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্তী স্থান জলের নীচে রগড়াইবেন। ইহাতে তোয়ালে প্রভৃতির মাত্রই আবশ্যক হয় না। খালি হাতে রগড়াইলেই যথেষ্ট হয়। ইহাতেও জলের উত্তাপ দেহের উত্তাপ অপেক্ষা অনেকটা কম থাকা প্রয়োজন। জলে কতক্ষণ বসার পর যদি জল উত্তপ্ত হইয়া উঠে তবে গামলা হইতে কতকটা জল বাহিরে ফেলিয়া দিয়া নূতন কতকটা ঠাণ্ডা জল তাহাতে ঢালিয়া লওয়া যাইতে পারে।

বাথ নিবার পর রোগী অন্য একটা পাত্র হইতে হাতে করিয়া জল লইয়া সমস্ত দেহ দ্রুত সিক্ত করিবেন এবং তাহার পরই খুব তাড়াতাড়ি সমস্ত দেহটা খালি হাতে ঘর্ষণ করিয়া দেহেই জল শুকাইয়া লইবেন। শীতকালে দশ মিনিট কালই এই স্নান যথেষ্ট। গ্রীষ্মকালে যতক্ষণ আরাম বোধ হয় ততক্ষণ ইহা লওয়া যাইতে পারে।

একটা মাটির পুরু গামলার দাম পাঁচ আনা হইতে সাত আনা। কিন্তু কাহারো পক্ষে যদি গামলা বা বাথটাব সংগ্রহ করা কঠিন হয়, তবে তিনি

অন্য ভাবেও হিপবাথ গ্রহণ করিতে পারেন। একখানা পিঁড়ির উপর ভিজা তোয়ালে পাতিয়া তাহার উপর বসিয়া পা দুইখানি একটু উঁচুতে একখানা জলচৌকি বা অন্য কিছুর উপর রাখিতে হয়। তাহার পর একটা বালতিতে ঠাণ্ডা জল লইয়া তাহা দ্বারা হিপবাথের মত তলপেটে ও কুঁচকি প্রভৃতি স্থান ঘর্ষণ করিতে হইবে। অথবা ঐ-ভাবে বসিয়া এক হাতে জল ঢালিয়া অন্য হাতে অনবরত রগড়াইলেও চলে। এরূপ দশ হইতে পনের মিনিট পর্যন্ত করা প্রয়োজন।

রোগী যদি এরূপ হয় যে, তাহাকে শয্যা হইতে উঠান যায় না, হিপবাথের পরিবর্তে তাহার তলপেট ও জননেন্দ্রিয়ের উপর একখানা ভিজা গামছা রাখিয়া গরম হওয়া মাত্র পুনরায় পরিবর্তন করিয়া বা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেওয়া চলে। এইজন্য ভিজা গামছার দ্বারা গুহ্যদ্বার পর্যন্ত সমস্ত স্থান ঢাকিয়া দেওয়া আবশ্যক।

[৪]

ডুস

যখন অবিলম্বে বৃহদন্ত্র (colon) হইতে দূষিত মল বাহির করিয়া দেওয়া আবশ্যক হয়, তখন সাধারণ অবস্থায় ডুস নেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহাকে অভ্যাসে পরিণত করা অথবা খুব ঘন ঘন ডুস নেওয়া কখনও উচিত নয়। দুই একবার ডুস নিয়া হিপবাথ, ভিজা কোমর পটি অথবা তলপেটের মাটির পুলটিস প্রভৃতি চালাইলে এবং পথ্য নিয়ন্ত্রিত করিলে ডুস নিবার আর আবশ্যক হয় না। তখন হিপবাথ প্রভৃতিতেই কাজ হইতে থাকে।

ডুসে ভাল উপকার হয়, যদি ডুসের জলের উত্তাপ দেহের উত্তাপের সমান হয়। তাহা অপেক্ষাও ভাল হয় যদি রীতিমত শীতল জল (৭০° F)

ব্যবহার করা যায়। সাধারণত ডুসের জলের উত্তাপ ৭০° হইতে ৮০° পর্যন্ত হওয়া উচিত। গরম জল ব্যবহারে অন্ত্র অত্যন্ত দুর্বল হইয়া যায় এবং তাহার পর দুই এক দিন মলের স্বাভাবিক বেগ হয় না। যদি অনবরত গরম জল ব্যবহার করা যায়, তবে অন্ত্রের দেয়ালগুলি শিথিল হইয়া পড়ে এবং কোন কোন অবস্থায় তাহা আকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শীতল জলের ডুসে বৃহদন্ত্রের মাংসপেশি ও স্নায়ুগুলি সবল হয় এবং তাহাতে বৃহদন্ত্রের ভিতর একটা ব্যায়ামের মত হয়। অর্থাৎ গরম জলে অন্ত্রকে যেমন দুর্বল করে, শীতল জল তেমনি ইহাকে সবল করিয়া তোলে।

কেহ কেহ ডুসের জলের সহিত সাবান মিশ্রিত করিয়া থাকেন; কিন্তু জলের সহিত ঐ-সমস্ত না মিশানই উচিত। কারণ সাবানের বিষ দেহে কতকটা শোঁষিত হয়ই। যদি রোগীর দুরন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে, সাবানের পরিবর্তে কিছু মধু জলের সহিত মিশাইয়া দিলে যথেষ্ট মল বাহির হইয়া যায়।

ব্যবহারের পূর্বে ডুস ও ডুসের নলটি খুব ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া কর্তব্য। যদি কলের জল না হয়, তবে জলটাও ফুটাইয়া তাহার পর ঠাণ্ডা করিয়া লওয়া আবশ্যক। ডুসটি তক্তপোষ হইতে ঊর্ধ্বে একটা পেরেকের সঙ্গে লটকাইয়া রাখিতে হয়। ডুসের ভিতর জল ঢালিয়াই প্রথম কতকটা জল বাহির করিয়া দেওয়া কর্তব্য। ইহাতে ডুসের নল হইতে সমস্ত বায়ু বাহির হইয়া যায়। ঐ-বায়ু যদি পেটের ভিতর যায়, তবে রোগীর পেট বেদনা উপস্থিত হইতে পারে। এই জন্য ডুসের ভিতর পুনরায় জল দিবার সময়ও জল যথেষ্ট থাকিতেই তাহার ভিতর জল দেওয়া উচিত। অন্যথা রোগীর পেটে বাতাস ঢুকিতে পারে। প্রয়োগ করিবার পূর্বে ক্যাথিটারের মাথায় ও মলদ্বারে কতকটা নারিকেল তৈল মাখাইয়া লওয়া কর্তব্য।

ডুস নিবার সর্বাপেক্ষা সহজ উপায়, জানু পাতিয়া বসিয়া মাথাটিকে

একখানা হাতের উপর রাখিয়া দেহটিকে ত্রিভুজের দুই বাহুর মত করিয়া রাখা। ইহাতে মলদ্বারের দিকটা খুব উঁচুতে থাকে এবং ডুসের জল অতি সহজে ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে। ডুস নিবার এই পদ্ধতিটি সর্বাপেক্ষা উপকারী এবং সহজ। এই প্রথায় ডুস নিলে বোঝাই যায় না যে
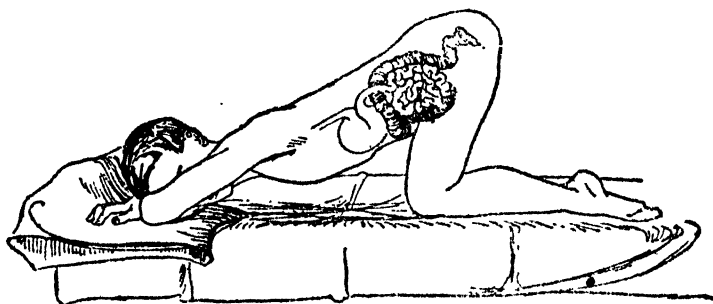
ডুস

ডুস নেওয়া হইতেছে এবং যথেষ্ট পরিমাণ জল অক্লেশে নেওয়া যাইতে পারে। তাহার ফলে বিনা ক্লেশে সমস্ত বৃহদন্ত্রটি ধৌত হইয়া পরিষ্কার হইয়া যায় এবং বৃহদন্ত্রের সমস্ত বদ্ধ মল বাহির হইয়া আসে।

দুর্বল রোগীরা দুই খানা পিঁড়ির উপর দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিয়া ডুস নিতে পারেন। পিছন দিকের পিঁড়ি খানার নীচে একটা কিছু দিয়া কতকটা উচু করিয়া দিতে হয়। অথবা রোগীকে পিঠের উপর চিৎ করিয়া শোয়াইয়া নিম্নের দিকটা একটা বালিশ প্রভৃতির দ্বারা উচু করিয়া দেওয়া চলে।

মল দ্বারের ভিতর ক্যাথিটার এক ইঞ্চি কি দেড় ইঞ্চি প্রবেশ করাইয়া ধীরে ধীরে জল ভিতরে যাইতে দিতে হয়। খুব জোরে জল যাইতে দিলে রোগী বেশী জল ধারণ করিতে পারে না। জল যখন ভিতরে যাইতে থাকে তখন অল্পে অল্পে ক্যাথিটার দুই ইঞ্চি পরিমাণ প্রবেশ

করাইতে হয়। জল যাইবার সময় যদি প্রবল মলত্যাগের বেগ হয়, তাহা হইলে কিছু সময়ের জন্য জলের প্রবাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

সাধারণত এক সের হইতে সোয়া সের জল অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করান যাইতে পারে। দেড় সেরের অধিক জল কখনও প্রবেশ করান উচিত নয়। তাহাতে বৃহদন্ত্রের অনিষ্ট হইতে পারে।

ডুস নিবার পর জলটা ৫ হইতে ১০ মিনিট কাল পেটের ভিতর ধরিয়া রাখিতে পারিলে খুব ভাল হয়। তাহার পর পায়খানায় বসিলেই বদ্ধ মল লইয়া জল হুর হুর করিয়া বাহির হইয়া যায়। মলত্যাগে বসিয়া তল পেটটি দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে অর্ধচন্দ্রাকারে বৃহদন্ত্রের উপর দিয়া মর্দন করিতে হয়। তাহা হইলে বৃহদন্ত্রের সমস্ত আবর্জনা জলের সহিত বাহির হইয়া যাইতে পারে।

বৃহদন্ত্রের ভিতর দীর্ঘ দিন মল জমিয়া থাকিয়া অথবা ঐ-স্থানের মল পচিয়া উঠিয়া যখন রক্ত স্রোতকে অনুক্ষণ দূষিত করিতে থাকে তখন এইরূপ একটি ডুসে দেহ-সঞ্চিত বিষের বোঝা হইতে দেহ এক লহমায় মুক্ত হয়।

বৃহদন্ত্রের ভিতরের অংশ সমতল নয়। ইহার খাঁজের মধ্যে অনেক সময় বৎসরাধিক কাল মল জমিয়া শুকাইয়া থাকে এবং এই সঞ্চিত মলের ভিতরে বহু জীবাণু, কৃমিকীট ও তাহাদের ডিম্ব বিদ্যমান থাকে। ডুসের জলের সহিত ঐ-সমস্ত বাহির হইয়া যায়।

অনেক সময় যখন জ্বর আসে আসে মনে হয়, তখন একবার মাত্র ডুস নিলে শতকরা নব্বইটি জ্বরের আক্রমণ ব্যর্থ হয়। যে-কোন অসুখের প্রথমেই একবার ডুস নিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করা যাইতে পারে। ইহাতে কোন অনিষ্ট হইতে পারে না, বরং দেহের প্রধান আঁস্তাকুড় আবর্জনামুক্ত হইলে সকল রোগের পক্ষেই উপকার হয়।

পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধতায় মাঝে মাঝে শীতল জলের ডুসে খুব উপকার

হয়। কারণ শীতল জলে বৃহদন্ত্র ও তাহার ভিতরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীগুলি সবলতা লাভ করে এবং ইহা লিভারটিকে উত্তেজিত করিয়া পিত্ত প্রবাহ বৃদ্ধি করে।

সকল সময় ডুসের সহিত শীতল জল ব্যবহার উচিত হইলেও কোন কোন সময় উষ্ণ অথবা গরম জল ব্যবহার করাই কর্তব্য। জ্বরের প্রথম অবস্থায় শীত ও কম্প থাকিতে রোগীকে গরম জল দ্বারা ডুস দেওয়াই উচিত। ঐ-অবস্থায় কখনও শীতল জলে ডুস দিতে নাই।

তলপেটের যে-কোন প্রদাহ-যুক্ত রোগেও গরম জল দ্বারা ডুস দেওয়াই উচিত।

কলেরা ও টাইফয়েডে রক্তদুষ্টি হইতে যখন কলাপস্ (collapse) আসন্ন হয়, তখন গরম জলের ডুসের মত উপকারী আর কিছুই নাই।

স্ত্রীলোকদিগের রজ বন্ধ হইলে গরম জলের ডুসে বিশেষ উপকার হয়। জলটা একটু বেশী সময় ধরিয়া রাখা আবশ্যক।

[৬]

রেচক ঔষধ (Purgatives)

কেহ কেহ সহজে কোষ্ঠ পরিষ্কার করিবার জন্য রেচক ঔষধ ব্যবহার করেন। কিন্তু ইহার মত অনিষ্টকর আর কিছুই নাই। প্রত্যেক রেচক ঔষধই দেহের পক্ষে বিষ। এই বিষ যখন আমাদের পেটে যাইয়া পড়ে, তখন দেহ হইতে তাহা দূর করিবার জন্য পাকস্থলীর পক্ষে প্রচুর রস নিঃসরণ করিবার আবশ্যক হয়। ভুক্ত পদার্থকে পরিপাক করিবার জন্য দেহের অন্য যে-সকল যন্ত্র রস নিঃসরণ করে, ইহা তাহাদিগের প্রত্যেক-টিকেই প্রবল ভাবে উত্তেজিত ও চঞ্চল করিয়া তোলে। তখন এই বিষাক্ত

ঔষধকে বিতাড়িত করিবার জন্য ঐ-সকল যন্ত্র হইতে অস্বাভাবিক উপায়ে প্রচুর দ্রাবকরস নির্গত হয় এবং তাহাদের দ্বারা সঞ্চিত মল বাহির হইয়া যায়।

কিন্তু পাচকরস প্রভৃতি যাহা দেহের পক্ষে জীবন স্বরূপ, সেই অমূল্য সম্পত্তি ইহা দ্বারা অপর্যাপ্তরূপে ব্যয়িত হয়। তখন ঐ-সমস্ত যন্ত্র অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। যাহাদের রসে মল নির্গত হয়, তাহারা দুর্বল হইলে কোষ্ঠ আরও কঠিন হয়। তখন অধিকতর শক্তিশালী রেচক ঔষধ ব্যবহার করিবার আবশ্যক হয়। তাহাতে দৈহিক যন্ত্রগুলি ক্রমশ আরও দুর্বল হইয়া পড়ে। শেষে দেহের এমন অবস্থা হয় যে, বাজারের কোন রেচক ঔষধই আর তখন কোষ্ঠ পরিষ্কার করিতে পারে না।

চতুর্থ অধ্যায়

দেহকে দোষমুক্ত করিবার উপায়

[১]

আমাদের দেহ যখন দূষিত পদার্থে গুরুতর রূপে ভারাক্রান্ত হয়, প্রকৃতি তখন তাহা নষ্ট করিবার জন্য সর্বদেহে একটা উত্তাপ সৃষ্টি করে। তাহার পর প্রকৃতির অক্লান্ত চেষ্টার ফলে লোমকূপগুলি যখন খুলিয়া যায়, তখন প্রচুর বিজাতীয় ও দূষিত পদার্থ ঘর্মের সহিত নির্গত হয় এবং অন্যান্য পথে বাহির হইয়া যায়। জ্বর তখন আপনি সারে।

আমরাও ঠিক প্রকৃতিকে অনুসরণ করিয়া দেহের দূর দূর অংশে অবস্থিত সমস্ত আবর্জনা উত্তাপ প্রভৃতির সাহায্যে গলাইয়া লোমকূপ এবং দেহের বিভিন্ন পথে বাহির করিয়া দিতে পারি। উত্তাপের দ্বারা এই ভাবে বহু প্রকারে দেহকে দোষমুক্ত করা যাইতে পারে। ষ্টিমবাথই (বাষ্পস্নানই) তাহাদের ভিতর সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত পদ্ধতি।

ষ্টিমবাথ (steam bath) লইবার পদ্ধতি

এক খানা অনুচ্চ ছোট মশারি প্রস্তুত করিয়া হইলেই তাহা দ্বারা ভাল ভাবে ষ্টিমবাথ দেওয়া যাইতে পারে। মশারি খানা মোটা মার্কিনের হইলেই ভাল হয়, কিন্তু সাধারণ কাপড়ের হইলেও চলিতে পারে। মশারিটি দৈর্ঘে পৌনে চার হাত এবং প্রস্থে দুই হাত হওয়া আবশ্যক। ইহা অপেক্ষা সামান্য বড় ছোট হইলেও কিছু আসিয়া যায় না। যে-কোন চৌকি বা খাটের

উপর ইহা খাটানো চলে। উহা এমন ভাবে টাঙানো আবশ্যক যেন সোয়া হাতের বেশী উচু না হয়। তাহার পর সমস্ত মশারিটি দুই খানা পুরু কম্বল বা কাঁথা প্রভৃতির দ্বারা ভাল করিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। কম্বলের মধ্যে কয়েক খানা খবরের কাগজ বিছাইয়া দিলে বাষ্প বাহির হইয়া যাইতে পারে না। ইহার পর মাথা ও মুখ বাহিরে রাখিয়া রোগীকে মশারির ভিতর শোয়াইয়া, ভিতরে বাষ্প ছাড়িয়া দিতে হয়।

বাষ্প উৎপাদনের জন্য দশ বারো আনা খরচে করগেট টিনের একটা বাষ্প উৎপাদক পাত্র (steam generator) প্রস্তুত করা যায়। মুখ ঢাকা টিনের একটা পাত্রের উপর টিনের একটা নল বসাইলেই বাষ্প উৎপাদক
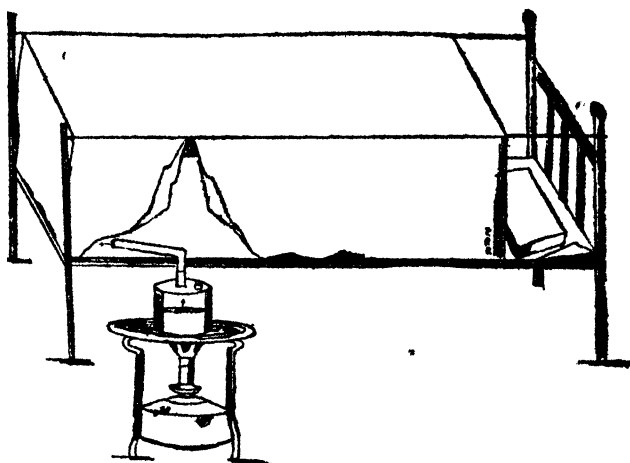
বাষ্পস্নান (steam bath)

যন্ত্র প্রস্তুত হয়। ঐ-পাত্রটি অর্ধেক জলপূর্ণ করিয়া ষ্টোভের উপর বসান আবশ্যক। কতক্ষণ পর জল ফুটিলে নল দিয়া ষ্টিম বাহির হইতে থাকে। তখন রোগীকে মশারির ভিতর শোয়াইতে হয়। রোগী শয়ন করিলে তাহার পর নলটি মশারির ভিতর ঢুকাইয়া দেওয়া কর্তব্য। অল্প কতক্ষণের ভিতরই তখন মশারিটি বাষ্পে ভরিয়া যায়।

অথবা তিনটি লোহার শিক বাঁকা করিয়া খাটিয়ার উপর বসাইয়া লইয়া কম্বল দিয়া তাহা মেজে পর্যন্ত ঢাকিয়া দিলেও চলে। ঐরূপ করিলে খাটের নীচে একটা নল দ্বারা বাষ্প ছাড়িয়া দেওয়া যায় এবং তাহা হইলে আর মশারির আবশ্যক হয় না।

[২]

ঘর্মজনক স্নানে সতর্কতা

যে কোনরূপ ঘর্মজনক স্নান (sweating bath) গ্রহণ করিবার সময় কতগুলি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। তাহা না হইলে উপকার তো হয়ই না, অপকারও হইতে পারে।

বাথ্ নিবার অব্যবহিত পূর্বে মাথা, মুখ ও ঘাড় ভাল করিয়া শীতল জল দ্বারা ধুইয়া লওয়া আবশ্যক। তাহার পর এক গ্লাস গরম জল পান করিয়া মশারি অথবা কম্বলের ভিতর যাইতে হয়। ভিতরে প্রবেশ করিয়াই দেহ হইতে সম্পূর্ণ কাপড় সরাইয়া ফেলা কর্তব্য। মাথা ও মুখ সর্বদা বাহিরে থাকিবে। রোগী শয়ন করিবার পর বাষ্পের নলটি পায়ের দিকে মশারির ভিতর ঢুকাইয়া দিতে হয়। পা দুইটি নলের মুখ হইতে সর্বদা দূরে রাখা আবশ্যক এবং অত্যন্ত সাবধান হওয়া প্রয়োজন, বাষ্পে যেন পা পুড়িয়া না যায়। বাষ্প নল হইতে বাহির হইয়া সরল ভাবে রোগীর গায় কখনও লাগিবে না। বাষ্প ঘুরিয়া আসিয়া রোগীর গায় যাহাতে লাগে তাহার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। এই জন্য নলের মুখটি রোগীর দেহ হইতে অন্য দিকে ঘুরাইয়া দিলেই চলে। যদি খাটের নীচ দিয়া বাষ্প দেওয়া হয়, তাহা হইলে বাষ্প যাহাতে এক মুখ দিয়া বাহির না হইয়া বহু ছিদ্রযুক্ত একটি নলের ভিতর দিয়া বাহির হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

রোগীকে শোয়াইয়াই একখানা গামছা বা তোয়ালে ঠাণ্ডা জলে ডুবাইয়া

জল-সিক্ত অবস্থায় মাথার চারিদিকে জড়াইয়া দিতে হয়। বাথ নিবার সময় অল্প কতক্ষণ পর পরই ঐ-তোয়ালের উপর শীতল জল ঢালিয়া মাথা শীতল রাখা আবশ্যক। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল ঢালাও উচিত নয়। তাহাতে ঘর্মস্রোত রুদ্ধ হইতে পারে। শীত কালে মাথায় অল্প জল ঢালিলেই চলে। মশারির ভিতরটা বাষ্পে ভরিয়া উঠিলেই অন্য আর এক খানা গামছা শীতল জলে ভিজাইয়া রোগীর গলার চারিদিকে আলগাভাবে কয়েক বার ঘুরাইয়া জড়াইয়া দিতে হয়। ইহার পর শরীর গরম হইয়া উঠিলে আর দুই খানা রুমাল ভিজাইয়া এক খানা রাখিতে হয় হার্টের উপর এবং আর এক খানা রাখিতে হয় জননেন্দ্রিয়ের উপর। শীতকালে রুমাল না রাখিলেও চলে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে এরূপ ব্যবস্থা করাই আবশ্যক। বাথ শেষ হইবার পূর্বেই যদি এই সব গামছা কি রুমাল শুকাইয়া যায় অথবা বেশী গরম হইয়া উঠে, তবে তাহা নূতন করিয়া শীতল জলে ডুবাইয়া দেওয়া চলে।

বাথ নেওয়ার সময় মাঝে মাঝে রোগীকে নাতিশীতোষ্ণ জল খাওয়ান আবশ্যক। রোগী মাঝে মাঝে পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া শরীরের সর্বস্থানে বাষ্প ভাল করিয়া লাগাইবেন। রোগী ভাল করিয়া ঘামাইতে আরম্ভ করিলে ৫ হইতে ১৫ মিনিট পরে বাষ্প বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্তব্য। সাধারণত গ্রীষ্মকালে ২০মিনিট হইতে ৩০ মিনিটের জন্য বাষ্প গ্রহণ করিলে যথেষ্ট হয়। শীতকালে ৩০মিনিট হইতে ৪৫মিনিটের জন্য নেওয়া আবশ্যক হইয়া থাকে। বাষ্প যে যথেষ্ট সময়ের জন্য নেওয়া হইয়াছে তাহা বুঝিবার অন্যতম প্রমাণ ইহাই যে, মুক্তার মত অজস্র ঘর্মবিন্দুতে নাসিকা ভরিয়া যায় অথবা তাহা মিলিত হইয়া গড়াইয়া পড়ে। বাষ্প বন্ধ করিবার মিনিট পাঁচেক পরেই মাথার ও দেহের অন্যান্য স্থানের ভিজা গামছা ও রুমাল সরাইয়া নেওয়া উচিত। শীতকালে বাষ্প বন্ধ করিবার পরই সরাইয়া নেওয়া কর্তব্য। ইহার পর রোগী দশ মিনিট কাল বিছানায় পড়িয়া

থাকিবেন। ঐ-সময় এক খানা শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা বার বার ঘাম মুছিয়া ফেলা আবশ্যক। তাহারপর নাতিশীতোষ্ণ জলে একখানা তোয়ালে ডুবাইয়া যথেষ্ট জল সহ ঐ-তোয়ালে দ্বারা রোগীর মুখ মুছিয়া তোয়ালে খানা রোগীর হাতে দিতে হইবে। রোগী ঐ-তোয়ালে খানা দ্বারা সর্বদেহ পুনঃ পুনঃ ঘর্ষন করিয়া শীতল করিবেন। দুই এক মিনিটের মধ্যেই তোয়ালে গরম হইয়া উঠিবে। তখন তোয়ালে খানা পুনরায় জলে ডুবাইয়া রোগীর হাতে দিতে হইবে। এই ভাবে দশ মিনিট কাল বা তাহারো বেশী, যতক্ষণ না দেহ সম্পূর্ণ শীতল হয়, মশারি বা কম্বল না সরাইয়া ততক্ষণ পর্যন্ত সর্বশরীর মোছা কর্তব্য। রোগী দুর্বল হইলে রোগীর দেহে বাতাস না লাগাইয়া অপর কেহও ভিজা তোয়ালে দ্বারা শরীর ঘর্ষণ করিয়া দিতে পারেন। প্রথম নাতিশীতোষ্ণ জল ব্যবহার করিয়া দুই এক মিনিট পর ক্রমশ অধিকতর শীতল জল ব্যবহার করা আবশ্যক। শীতল জলে গা মুছিতে কেহ যেন ভয় না পান। শরীর যখন উষ্ণ থাকে শীতল জল তখন কিছু মাত্র অনিষ্ট করিতে পারে না। বরং তাহাতে রোগীর জীবনীশক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

গা মোছাইয়া দিবার অব্যবহিত পরই পনের মিনিট হইতে অর্ধ ঘণ্টা পর্যন্ত হিপবাথ গ্রহণ করা আবশ্যক। হিপবাথের পরই রুদ্ধদ্বার গৃহে শীতল জলে পূর্ণস্নান গ্রহণ করা কর্তব্য। স্নান করিবার সময়ও সমস্ত শরীর খুব ভাল করিয়া রগড়াইয়া স্নান করা আবশ্যক।

স্নান শেষ করিয়াই চর্মে পুনরায় তাপ ফিরাইয়া আনা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। এই জন্য স্নানের অব্যবহিত পরই কম্বল প্রভৃতির দ্বারা গলা পর্যন্ত সমস্ত শরীর জড়াইয়া চর্মে স্বাভাবিক তাপ আসিলে শেষে স্বাভাবিক ভাবে জামা কাপড় পরিয়া থাকিতে হয়।

স্নানের এক ঘণ্টা পর আধখানা নেবুর রস সহ এক গ্লাস শীতল জল পান করা কর্তব্য। শীতল জল পান করিবার এক ঘণ্টা পর ক্ষুধা লাগিলে

রোগী কমলানেবু, অন্যান্য ফল অথবা দুধ প্রভৃতি হালকা পথ্য খাইতে পারেন। কিন্তু দিন রাত্রির যে প্রধান আহার তাহা অন্তত চার পাঁচ ঘণ্টা বিশ্রামের পূর্বে কিছুতেই গ্রহণ করা উচিত নয়। আবার ষ্টিমবাথ যখন লইতে হইবে, তাহারো পাঁচ ছয়-ঘণ্টা পূর্বে খাইতে নাই। এই জন্য বেশী সময়ের জন্য ষ্টিমবাথ গ্রহণ করিতে হইলে খালিপেটে ভোরবেলা গ্রহণ করাই সর্বোত্তম ব্যবস্থা।

ষ্টিমবাথে দেহ হইতে অনেক জলীয় পদার্থ বাহির হইয়া যায়। এই জন্য ষ্টিমবাথের দিন এবং তাহার পর আরও তিন চার দিন, নেবুর রস সহ প্রতিদিন অন্তত ৬ হইতে ৮ গ্লাস জল পান করা আবশ্যক। তাহা ব্যতীত কয়েকটা দিন প্রচুর ফল ও সবুজ লতা পাতা, ভোর বেলা বেলের সরবৎ অথবা বেল পোড়া এবং সম্ভব হইলে এক বেলা ভাত ও এক বেলা রুটি খাওয়া কর্তব্য। তাহা হইলে ষ্টিমবাথে দেহের ভিতর যে-সমস্ত বিজাতীয় পদার্থ ভাঙিয়া যায় তাহা মল ও মূত্রের সহিত সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে।

ষ্টিমবাথ গ্রহণ করিবার পূর্বেও তলপেটটি পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক; যদি রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকে, তবে সর্বদাই প্রথমে রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া তবে রোগীকে ষ্টিমবাথ প্রয়োগ করা উচিত। জরুরী ক্ষেত্রে এই জন্য ডুস ব্যবহার করাই কর্তব্য। এই বিধি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইহা কখনই লঙ্ঘন করা উচিত নয়।

[৩]

মৃদু ষ্টিমবাথ

অন্য ভাবেও সহজে ষ্টিমবাথ গ্রহণ করা যাইতে পারে। এক খানা বেতের ফাঁক ফাঁক করা চেয়ারের উপর বসিয়া গলা হইতে মেঝে পর্যন্ত চারিদিক দুই খানা কম্বল অথবা কাঁথা প্রভৃতির দ্বারা ভাল করিয়া

ঢাকিয়া দিতে হয়। তাহার পর একটা হাঁড়ি বা অন্য কোন পাত্রে ফুটন্ত জল লইয়া তাহা ঐ-চেয়ারের নীচে রাখা আবশ্যক। কতক্ষণ পর বাষ্পের তেজ যদি কমিয়া যায়, তবে ঐ-হাঁড়ি সরাইয়া নিয়া আর একটি হাঁড়ি ফুটন্ত জলে ভরিয়া ঐ-স্থানে রাখা কর্তব্য। জল বার বার পরিবর্তন করিতে ইচ্ছা না করিলে কতগুলি প্রস্তর বা ইষ্টক-খণ্ড আগুনের ভিতর রাখিয়া দিতে হয় এবং যখনি বাষ্প উঠা বন্ধ হইয়া আসে তখনি তাহার একটি জলে ছাড়িয়া দিতে হয়।

রোগীকে এক খানা অনাবৃত দড়ির খাটলির উপর গলা পর্যন্ত কম্বল ঢাকা দিয়া শোয়াইয়াও এই ভাবে ষ্টিমবাথ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ঐ-অবস্থায় একটার পরিবর্তে দুইটি হাঁড়ি খাটলির নীচে রাখিতে হয় এবং বাষ্প যাহাতে বাহির হইয়া যাইতে না পারে, তাহার জন্য খাটলির চারিদিক ভাল করিয়া কম্বল দিয়া আবৃত করিয়া দিতে হয়।

চেয়ারে বসিয়া অন্য প্রকার সহজ উপায়েও বাথ নেওয়া যাইতে পারে। রোগীর চেয়ার হইতে অল্প দূরে একটা কেটলি বসাইয়া একটা রবারের নল দ্বারা বাষ্প চেয়ারের ভিতর নেওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ যে-কোন রকমে বাষ্প গায় লাগাইয়া ঘামাইয়া লইতে পারিলেই হয়।

বৃদ্ধ, শিশু ও দুর্বল রোগীদিগকে এই সকল পদ্ধতিতে বাথ দেওয়াই কর্তব্য। অথবা যখন রোগীকে খুব ঘন ঘন ষ্টিমবাথ দেওয়ার আবশ্যক হয়, তখনও এই সকল পদ্ধতিতে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যখন দেহ হইতে যথেষ্ট দূষিত পদার্থ বাহির করিয়া দেওয়ার (elimination-র) আবশ্যক হয়, তখন মশারির ভিতর রোগীকে রাখিয়া ষ্টিমবাথ দেওয়াই উচিত।

ষ্টিমবাথ গ্রহণ করিবার পূর্বে ও পরে যে-সকল সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক, এই সকল বাথ যদি দীর্ঘ সময়ের জন্য নেওয়া হয় তাহা হইলেও ঐ-নিয়মগুলি অবশ্যই অনুসরণ করা কর্তব্য। ঐ-অবস্থায় এই সকল বাথ নিবার পূর্বেও তলপেট পরিষ্কার করিয়া লইয়া, মাথা, মুখ ও ঘাড়

া, গরম জল পান করিয়া, মাথায় ভিজা তোয়ালে জড়াইয়া এবং বাথের শেষে নাতিশীতোষ্ণ জল দ্বারা গা মুছিয়া, কটি স্নান নিয়া, পূর্ণ স্নান গ্রহণ করিয়া এবং পরে নেবুর রস সহ প্রচুর জল পান করিয়া বাথ সম্পূর্ণ করা কর্তব্য। এই সকল বাথ অনেকটা মৃদু বলিয়া গা মোছান প্রভৃতি সমস্তই অল্প অল্প করিতে হয় এবং সুদীর্ঘ সময়ের জন্য না নিলে গলায় ভিজা তোয়ালে জড়াইবার আবশ্যক হয় না।

[৪৩]

ষ্টিমবাথের উপকারিতা

ডাক্তারী শাস্ত্রে এমন রোগ খুব কমই আছে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করিবার পর ষ্টিমবাথ গ্রহণ করিলে যাহা আরোগ্য হইতে না পারে। কারণ ইহা দ্বারা রোগের মূল কারণ দেহ হইতে ঝাঁটাইয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয়। তথাপি কতগুলি রোগে ইহা বিশেষ ভাবে ফলপ্রদ। সর্বপ্রকার বাতব্যাধি আরোগ্য করিতে ষ্টিমবাথের মত আর কিছুই নাই। সাইটিকা ও কটিবাত প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় বাত রোগেই ইহা দ্বারা সমভাবে উপকার হয়। পক্ষাঘাত রোগেও ইহা দ্বারা অত্যন্ত উপকার হইয়া থাকে।

সর্বপ্রকার স্থূলতার (obesity) ষ্টিমবাথ একটি প্রধান চিকিৎসা। প্রচুর জলপান ও ফলাহারের সহিত ষ্টিমবাথ চালাইলে শরীরের ওজন ও আকার ক্রমশ স্বাভাবিক হইয়া আসে। লোকের যে ভুঁড়ি হয়, ষ্টিমবাথ তাহার অমোঘ চিকিৎসা। ভাল করিয়া যথেষ্ট সময়ের জন্য বার কয় ষ্টিমবাথ গ্রহণ করিলে খুব বড় ভুঁড়িও কমিয়া যায়। একবার রাসা রোডের শ্রীযুক্ত মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাধারণ স্বাস্থ্যের জন্য ষ্টিমবাথ প্রয়োগ করিয়াছিলাম। তাঁর বেশ বড় একটা ভুঁড়ি ছিল। একদিন অর্ধ ঘণ্টার জন্য তাঁহাকে ষ্টিমবাথ প্রয়োগ করিয়াছিলাম মাত্র। তাহার কয় দিন পরই তাঁহার ভুঁড়ি কমিয়া পেটের ভিতর ঢুকিয়া গেল।

পুরাতন ব্রঙ্কাইটিসে ইহা বিশেষ উপকারী। কোষ্ঠটি পরিষ্কার রাখিয়া কিছু দিন ষ্টিমবাথ চালাইলে বুক ক্রমশ পরিষ্কার হইয়া আসে।

সর্বপ্রকার অজীর্ণ রোগে ষ্টিমবাথ নব-জীবন দান করে। ষ্টিমবাথ নেওয়ার পর শরীরে এমন একটা জলাভাবের মত হয় যে, তাহাতে ভুক্তদ্রব্য হইতে অন্ত্রের রসশোষণের ক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই জন্য ষ্টিমবাথ পুষ্টি-লাভের একটি প্রধান উপায়।

খোস পাঁচড়া প্রভৃতি চর্মরোগ আরোগ্যের ইহা অব্যর্থ উপায়। চর্মরোগ যত পুরাতনই হউক না কেন এবং যত ভয়ঙ্করই হউক না কেন দুই এক বার ষ্টিমবাথ গ্রহণ করিলেই তাহা আশ্চর্য ভাবে আরোগ্য হয়। একবার নরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী নামে যশোহর জিলার সোনপুরের একটি ভদ্রলোক চর্ম রোগের চিকিৎসা করিবার জন্য আমার নিকট আসেন। তিনি জামা খুলিয়া ফেলিলে আমি তাঁহার অনাবৃত শরীর দেখিয়া শিহরিয়া উঠি। পা হইতে গলা পর্যন্ত সমস্ত শরীরের ভিতর এমন এক ইঞ্চি স্থান তাঁহার ছিল না, যেখানে দাদ ও খোস পাঁচড়া না ছিল। তাঁহার দাদগুলি কোথাও এক হাত ব্যাপিয়া ছিল। স্থানে স্থানে উহারা ব্রণের মত হইয়া শেষে পাঁচড়ায় পরিণত হইয়াছে। পুরাতন পাঁচড়ারো শরীরে অভাব ছিল না। আমাকে উনি বলিলেন যে, ছেলে-বেলা হইতে তিনি অন্তত আধ মন মলম ব্যবহার করিয়াছেন এবং বহু ইনজেকসন নিয়াছেন। তাহাতে শেষ পর্যন্ত কোন উপকারই হয় নাই। আমি তাঁহাকে পূর্ণ সময়ের জন্য একটা ষ্টিমবাথ প্রয়োগ করিলাম। তাহার পর দেশে যাইয়া স্নানের পূর্বে প্রতিদিন অর্ধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা গায় টাটকা কাদামাটি মাখিয়া আতপ স্নান (sun bath) গ্রহণ করিয়া স্নান করিবার ব্যবস্থা দিলাম এবং 'এক মাস' পর পর কয়েকটি ষ্টিমবাথ গ্রহণ করিতে বলিয়া দিলাম। কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবার জন্য তাঁহাকে বেল ও পেয়ারা খাইতে বলা হইল এবং প্রচুর জল খাইতে

তাঁহাকে নির্দেশ দিলাম। তিন মাস পর উনি আমার সঙ্গে পুনরায় দেখা করিতে আসিলেন। এবার আমি তাঁহার চেহারা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম। দেহে কোথাও খোস পাঁচড়ার চিহ্ন মাত্র নাই। বহু স্থানই সাধারণ শরীরের মত নির্মল হইয়া গিয়াছে এবং বড় বড় দাদগুলির সামান্য সামান্য চিহ্ন কোথাও কোথাও রহিয়াছে মাত্র। পূর্বে তাঁহার যে অসহ্য চুলকানি ছিল, জানিলাম তাহাও এখন আর কিছুমাত্র নাই।

অন্য রোগের জন্যও যখন লোককে ষ্টিমবাথ দিয়াছি, তখনও দেখিয়াছি, একদিন পরেই তাহাদের দেহের দীর্ঘদিনের পাঁচড়া প্রভৃতি শুকাইয়া আরোগ্য হইয়া গিয়াছে। কারণ চর্মরোগের জীবাণু চর্মের যে বিজাতীয় পদার্থের ভিতর গৃহনির্মাণ করে, ষ্টিমবাথে ঐ-বিজাতীয় পদার্থ বাহির হইয়া আসে। তখন আপনা হইতে চর্মরোগ আরোগ্য লাভ করে।

কলেরার সময় মৃদু ষ্টিমবাথ প্রয়োগে রোগীর অত্যন্ত উপকার হয়। ষ্টিমবাথ প্রয়োগে রোগের গতি অন্ত্র হইতে চর্মের দিকে ফিরাইয়া আনিতে পারিলে এবং রোগীকে ঘামাইয়া দিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ রোগী আরোগ্য লাভ করে। মূত্ররোধ বিকার (Uraemia) হইতে রোগীকে বাঁচাইয়া তুলিতে ষ্টিমবাথ প্রধান উপায়।

অম্লরোগে ইহা মন্ত্রশক্তির মত কার্য করে। রসা রোডের মিঃ দাস গুপ্ত মহাশয়ের স্ত্রীর অম্বল হইতে দিন ৩০।৪০ বার বমি হইত। তিনি যাহা খাইতেন তাহার দশগুণ বমি করিতেন। কিছু খাইলেই তাহাতে তাঁহার অম্বল হইত এবং অম্বলে গলা জ্বলিয়া যাইত। মিঃ দাস গুপ্ত সকল চিকিৎসা শেষ করিয়া তাহার পরে আমাকে ডাকিলেন। আমি যখন গেলাম, দুই জন লোক রোগিণীকে ধরিয়া আমার সম্মুখে আনিল। কি যে তাঁহার যন্ত্রণা তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। হাত পা ও সর্বদেহ জ্বলিয়া যাইতেছে—সর্বদাই দারুণ একটা

অস্বস্তি ভাব এবং মুখে অব্যক্ত কাতর ধ্বনি লাগিয়াই আছে। বাড়ির সকলেরি ধারণা ছিল, রোগিণী আর বাঁচিবেন না। মিঃ দাস গুপ্তের একটি মেয়ে তখন মেট্রিক পড়িত। আমি রোগিণীকে দেখিয়া যখন বলিলাম, 'এক মাসে আমি এই রোগ ভাল করিয়া দিব', তখন সেই মেয়েটি বিস্ময়ে ও আনন্দে বলিয়া উঠিল, 'আমার মা বাঁচবে!' ইহার পরের দিন রোগিণীকে একটা ষ্টিমবাথ প্রয়োগ করিলাম। ঐ-একবার মাত্র ষ্টিমবাথ প্রয়োগেই বমি ৫০ বার হইতে ২ বারে নামিয়া আসিল এবং শরীরের জ্বালা যন্ত্রণা প্রভৃতি অন্তর্হিত হইয়া গেল। রোগিণী মাত্রই জলপান করিতে পারিতেন না। ষ্টিমবাথের পর তিনি দিন পাঁচ ছয় গ্লাস করিয়া জলপান করিতে লাগিলেন। ইহার পর তাঁহাকে প্রতিদিন হিপবাথ এবং মাঝে মাঝে ভিজা কোমর পটি (wet girdle) প্রভৃতি দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। ইহার কয়েক মাস পরেই তিনি সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য লাভ করিলেন।

সর্বপ্রকার শূল বেদনাই ষ্টিমবাথ দ্বারা আরোগ্য লাভ করে। কারণ অধিকাংশ অবস্থায় রোগীকে ঘামাইয়া দিতে পারিলেই বেদনা কমিয়া যায়।

সিফিলিস গণ্রিয়াতেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ঐ-সকল রোগে ইহা দীর্ঘদিন পর্যন্ত মাঝে মাঝে নেওয়া আবশ্যক।

পিত্ত পাথরিতে (gall stone) অস্ত্র করা ছাড়া প্রায় গত্যন্তর থাকে না, কিন্তু ষ্টিমবাথে এই রোগ নিশ্চিতভাবে আরোগ্য লাভ করে। পাবনা জিলার শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র ঘোষ কলিকাতায় একটি ইনসিওরেন্স অফিসে কার্য করেন। তাঁহার স্ত্রীর কঠিন পিত্ত-পাথরি রোগ ছিল। প্রতি মাসে অথবা মাসে দুই বার তাঁহার বেদনা উঠিত এবং বেদনার সময় তাঁহার চিৎকারে কেহ বাড়ি টিকিতে পারিত না। সুরেশ বাবুর এক ভাই কলিকাতা কর্পোরেশনের ডাক্তার। সুতরাং কলিকাতার বড়

বড় ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয় নাই। সকল চিকিৎসা শেষ হইলে ডাক্তারগণ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, অস্ত্র ছাড়া ইহা আরোগ্য হইবার নয়। কিন্তু মহিলাটি অস্ত্র করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন শেষ একটা চেষ্টা করিবার জন্য আমাকে ডাকা হইল। আমি প্রথমেই তাঁহাকে একটা ষ্টিমবাথ দিলাম। রোগিণীর কোষ্ঠ অত্যন্ত অপরিষ্কার ছিল। তিন চার দিন পর পর তাঁহার পায়খানা হইত। আর তিনি জল খুব কম খাইতেন। আমি তাঁহাকে দৈনিক হিপবাথ এবং প্রচুর জলপানের ব্যবস্থা দিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে পথ্যের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা (আহারে আরোগ্য দ্রষ্টব্য) করিয়া দেওয়া হইল। আমার চিকিৎসা আরম্ভ করিবার পর, তাঁহার এক বার মাত্র বেদনা উঠিয়াছিল। আমি তখনি লিভারের উপর অর্ধ ঘণ্টা গরম সেক দিয়া তাহার পর দশ মিনিট জলপটি দিতে বলিলাম। তাঁহার বেদনা তিন দিনের কমে প্রায় কখনও থামিত না। কিন্তু একবার গরম সেক দিয়া তাহার পর দশ মিনিট মাত্র শীতল পটি দিতেই রোগিণী ঘুমাইয়া পড়িলেন। তাহার পর আর তাঁহার কোন দিন বেদনা উঠে নাই। অবশ্য তাহার পরও কিছু দিন তিনি চিকিৎসা চালাইয়াছিলেন।

হাঁপানি রোগীরা সময় সময় রোগ যন্ত্রণায় অসহ্য কষ্ট পাইয়া থাকে। ষ্টিমবাথে তাহাদের অস্বস্তি অত্যন্ত দ্রুত কমিয়া যায়।

বাতব্যাধি নির্দোষ ভাবে আরোগ্য করিতে ইহার সমতুল্য প্রায় আর কিছুই নাই। আমার মা দীর্ঘদিন যাবৎ বাতরোগে কষ্ট পাইতেন। ইহার জন্য তিনি অনেক কিছু করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার কখনও স্থায়ী ফল হয় নাই। কবিরাজরা বলিতেন, আমার মার এই রোগ আর আরোগ্য হইবে না। কারণ আমার মাতামহীরও বাতব্যাধি ছিল। তিনি দীর্ঘ দিন শয্যাশায়ী থাকিয়া এবং অনেক কষ্ট পাইয়া দেহত্যাগ করেন। আমার মাতৃদেবীরও হয় তো অনুরূপ অবস্থাই হইত। কিন্তু নিয়মিত কয়েকবার

উষ্ণ-স্নান গ্রহণ করিবার পরই মা বাতব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

• যাহারা কোনরূপ ব্যায়াম গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের ৬ মাস অন্তর অন্তর ষ্টিমবাথ গ্রহণ করা একান্ত ভাবে আবশ্যক। তাহাতে দীর্ঘ দিন শ্রমহীনতার গ্লানি দেহ হইতে কাটিয়া যায়।

ষ্টিমবাথ দ্বারা এইরূপে আমাদের বহু রোগ ও গ্লানি দূর হইতে পারে।

তথাপি সকল অবস্থাতেই সুদীর্ঘ সময়ের জন্য ষ্টিমবাথ প্রয়োগ করা উচিত নয়। যে-সকল রোগী অত্যন্ত দুর্বল, যাহাদের হার্ট খারাপ অথবা দুর্বল, যাহাদের যক্ষ্মা প্রভৃতি ক্ষয় রোগ বা মস্তিষ্কের রক্তহীনতা রোগ আছে, যাহাদের কোন অঙ্গে প্রদাহ উৎপন্ন হইয়াছে, যে-সকল বহুমূত্র রোগী অত্যন্ত কৃশ হইয়া গিয়াছে এবং যাহারা তরুণ জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে কখনই ষ্টিমবাথ দিতে নাই। ইহাদিগকে ষ্টিমবাথের পরিবর্তে ভিজা চাদরের প্যাক (পরে দ্রষ্টব্য) দেওয়া উচিত। শিশু এবং বৃদ্ধদিগকেও বিশেষ সতর্কতার সহিত ষ্টিমবাথ প্রয়োগ করা উচিত। তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত অল্প ও অপেক্ষাকৃত মৃদু তাপে ষ্টিমবাথ প্রয়োগ করা কর্তব্য।

অত্যন্ত দীর্ঘ সময়ের জন্য কখনই ষ্টিমবাথ প্রয়োগ করা উচিত নয়, তাহাতে উপকারের পরিবর্তে অপকার হইবারই সম্ভাবনা থাকে। জলচিকিৎসায় সর্বদাই বরং অল্প করিতে হয়, তথাপি কখনও বেশী করিতে নাই। প্রথমবার ষ্টিমবাথে প্রায়ই ওজন কতকটা কমিয়া যায়। তাহার জন্য ভয় পাইতে নাই। কারণ দেহের ভিতর মৃত জীবকোষ ও বিজাতীয় পদার্থ প্রভৃতি যে-সকল আবর্জনা সঞ্চিত থাকে, ষ্টিমবাথের পর তাহা বিভিন্ন পথে বাহির হইয়া যায়। সময় সময় অর্ধ ঘণ্টা ষ্টিমবাথের পর দুই তিন সের ওজনও কমে। কিন্তু তাহার কয়দিন

পরেই দেহে নূতন তন্তু সৃষ্ট হয়, মাংসপেশি গঠিত হয় এবং দেহের ওজন পূর্বপেক্ষা বাড়িয়া যায়। এই জন্য বহু পুরাতন রোগী একটি মাত্র ষ্টিমবাথে নব-জীবন লাভ করে।

সময় সময় অল্প সময়ের জন্য ষ্টিমবাথে অত্যন্ত উপকার হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রমে যাহাদের শরীর ভাঙিয়া গিয়াছে তাহারা কয়েক দিন পর্যন্ত তিন হইতে ছয় মিনিটের জন্য মৃদু ষ্টিমবাথ গ্রহণ করিয়া তাহার পর শীতল জলে স্নান করিলে অতি অল্প দিনে হৃতস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতে পারেন। শরীরটাকে এই ভাবে অল্প সময়ের জন্য গরম করিয়া শীতল জলে স্নান করার মত জীবনী শক্তির উদ্দীপক আর কিছুই নাই।

এই ভাবে অল্প সময়ের জন্য ষ্টিমবাথ নিলে কিছু দিন পর্যন্ত প্রতি দিনও বাথ নেওয়া যাইতে পারে।

[৫]

উষ্ণ পাদ-স্নান (Hot foot-bath)

ষ্টিমবাথের দ্বারা যে-ফল লাভ হয়, উষ্ণ পাদ-স্নান প্রভৃতি অন্যান্য ঘর্ম-জনক স্নানের (sweating baths) দ্বারাও তাহার অনেকটা ফল লাভ করা যাইতে পারে।

রোগীকে শোয়াইয়া, বসাইয়া বা অর্ধ-শায়িত অবস্থায় রাখিয়া এই বাথ নেওয়া যায়। রোগীর জানু হইতে গলা পর্যন্ত সমস্ত দেহ কম্বল বা লেপ প্রভৃতির দ্বারা ঢাকিয়া, এক পাত্র গরম জলে রোগীর পা দুইটি গোড়ালির চারি অঙ্গুলি উর্ধ্ব হইতে সন্ধির নীচ পর্যন্ত ডুবাইয়া রাখিতে হয়। গামলা, বালতি, টব, প্যান অথবা যে-কোন পাত্রে এই বাথ নেওয়া যায়। জলপাত্রটি শয্যার বাহিরে রাখা আবশ্যক। তাহা না হইলে শয্যা ভিজিয়া যাইতে পারে। অথবা শয্যার ভিতরই এক খানা অয়েল

ক্লথের উপর পাত্রটি রাখা যায়। জল একটু বেশী গরম (১০৪° হইতে ১১২°) হইলেই ভাল ফল হয়। কিন্তু অল্প উত্তাপে বাথ আরম্ভ করিয়া ক্রমশ পাত্রের ভিতর বেশী গরম জল ঢালিয়া জলের উত্তাপ ধীরে ধীরে বাড়াইয়া নিতে হয়। জল ঠাণ্ডা হইয়া গেলেও মধ্যে মধ্যে জল বাহির করিয়া ভিতরে গরম জল ঢালিয়া দেওয়া যায়। ইহাতে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক, জল ঢালিবার সময় রোগীর পায় যেন গরম জল না পড়িয়া যায়। গ্রীষ্মকালে ১৫ মিনিট হইতে ২৫ মিনিটের মধ্যেই ইহাতে সর্বদেহ হইতে প্রচুর ঘর্ম নির্গত হয়। শীতকালে একটু বেশী সময় লাগে। পা দুইটি যত বেশী ডুবান যায়, তত দ্রুত ফল হয়। বাথ নেওয়া হইয়া গেলে রোগী অর্ধ মিনেটের জন্য পা দুইটি শীতল জলে এক বার ডুবাইয়া বাথ সমাপ্ত করিবেন। কিন্তু ইহাতেও বাথ বিবার পূর্বে তলপেট পরিষ্কার করিয়া, মাথা, মুখ ও ঘাড় ধুইয়া, মাথায় ভিজা তোয়ালে জড়াইয়া এবং বাথের শেষে ক্রমনিম্নতাপ বিশিষ্ট জলে গা মুছিয়া, কটিস্নান নিয়া, পূর্ণ স্নান গ্রহণ করিয়া এবং পরে অল্প লেবুর রস সহ পুনঃ পুনঃ জল পান করিয়া বাথ সম্পূর্ণ করিতে

উষ্ণ পাদ-স্নান (Hot foot-bath)

হইবে। এই বাথ পূর্ণ সময়ের জন্য নিলে এই সকল নিয়ম অবশ্যই পালন করা আবশ্যক।

ষ্টিমবাথের ন্যায় উষ্ণ পাদ-স্নানের দ্বারাও লোমকূপ মুক্ত করিয়া দেহের যথেষ্ট দূষিত ও বিজাতীয় পদার্থ বাহির করিয়া দেওয়া যায়। তাহা ব্যতীত এই বাথে কতগুলি বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। উষ্ণ পাদ-স্নানে অন্ত্র, মূত্রাশয় ও তলপেটের অন্যান্য যন্ত্রগুলির ভিতর রক্ত আসে এবং তাহাতে ঐ-যন্ত্রগুলি সবলতা লাভ করে।

যে-সকল স্ত্রী-লোকের মাঝে মাঝে মাসিক বন্ধ হয় একটু দীর্ঘ সময়ের জন্য এই বাথ নিলে তাহাদের অত্যন্ত উপকার হয়। ইহাতে জড়ায়ু (uterus) ও ডিম্বকোষে (ovarics) প্রচুর রক্ত যায়। ঐ-যন্ত্রগুলি তাহাতে সবলতা লাভ করে এবং তাহার ফলে স্রাব পরিমিত হয়।

মাথা ও উর্দ্ধাঙ্গের রক্তাধিক্য দূর করিয়া রক্তের গতি পায়ের দিকে টানিয়া আনিতে ইহার জুড়ি নাই। এই জন্য অতি কঠিন মাথাধরাও ইহা দ্বারা অতি সহজে আরোগ্য লাভ করে। একবার চেতলার ডেটিনিউ ক্যাম্পের শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র সরকার প্রবল মাথাধরায় আক্রান্ত হন। দীর্ঘ চার দিন যাবৎ তাঁহার মাথাধরা চলিতে থাকে। প্রায় মাসে মাসে তাঁহার এরূপ হইত এবং সাত আট দিনের কমে যাইত না। ঐ-কয়দিন তাঁহার ঘুম হইত না এবং বেদনায় সর্ব্বক্ষণ চিৎকার করিতেন। সাধারণ চিকিৎসায় কোন ফল না হওয়ায় ডেটিনিউ ক্যাম্পের যুবকেরা আমাকে লইয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে একটি ডুস দিয়া তাহার পরই অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্য উষ্ণ পাদ-স্নান প্রয়োগ করিলাম। বাথ নিবার সময়ই তাঁহার মাথাধরা ছাড়িয়া গেল এবং পরের দিনই তিনি সাধারণ কাজকর্ম্মে যোগ দান করিলেন।

এই সকল উষ্ণ স্নানে (hot bath) যে-ফল হয় আতপ স্নানেও (sun bath) সেই ফল লাভ হইয়া থাকে (পঞ্চদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

[৬]

আংশিক ষ্টিমবাথ (Local steam bath)

অনেক সময় সর্বদেহে বাষ্প প্রয়োগের আবশ্যক হয় না। আবার কোন কোন সময় সর্বদেহে বাষ্প প্রয়োগের পরেও কোনও বিশেষ অঙ্গের রোগে সেই অঙ্গে পুনঃ পুনঃ আংশিক বাষ্প-স্নান প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়।

ইহা সেকেরই একটা উচ্চ সংস্করণ মাত্র। যেখানে যেখানে সেক দেওয়া চলে, সেখানেই আংশিক ষ্টিমবাথ প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু সেক হইতে ইহা এই জন্যই শ্রেষ্ঠ যে, ইহা আক্রান্ত অংশের উপর কোন প্রকার চাপ না দিয়াও ঐ-স্থানের অণুতে পরমাণুতে পর্যন্ত উত্তাপ বহন করিয়া মৈয় এবং মুখগহ্বর প্রভৃতি যে-স্থানে সেকের উত্তাপ প্রত্যক্ষ ভাবে পৌঁছিতে পারে না, বাষ্প সেই স্থানে অনায়াসে যাইয়া পৌঁছে। হাত, পা, মুখ, গলা, মাথা, চোখ ও কান প্রভৃতি সর্বাঙ্গেই বাষ্প প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

আংশিক ষ্টিমবাথে সাধারণত নল হইতে বাষ্প গ্রহণ করিবার আবশ্যক হয় না। একটা পাত্রে ফুটন্ত জল লইয়া তাহার উপর আক্রান্ত অঙ্গটি রাখিয়া ঐ-পাত্র সমেত অঙ্গটি কম্বল প্রভৃতির দ্বারা ঢাকা দিলেই হয়। মুখ প্রভৃতি স্থানে ৭ হইতে ১০ মিনিট পর্যন্ত বাষ্প লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু নিম্নদেহে একটু বেশী সময়ের জন্য বাষ্প প্রয়োগ করিতে হয়। তথায় ১৫ হইতে ২৫ মিনিট পর্যন্ত বাষ্প প্রয়োগ করা কর্তব্য। যে-অঙ্গে বাষ্প প্রয়োগ করা হয়, সেই অঙ্গ বিশেষ ভাবে ঘামান পর্যন্ত বাষ্প প্রয়োগ করা আবশ্যক।

কোনে অঙ্গে আংশিক বাষ্পস্নান প্রয়োগ করিয়াই ঐ-অঙ্গ শীতল জলে ভিজান তোয়ালে দ্বারা মুছিয়া ফেলা উচিত। মুখে কি গলায় বাষ্প দিলে

বাষ্প বন্ধ করিবার অব্যবহিত পর শীতল জলে দুই তিন বার কুলকুচা করিয়া ফেলা বিশেষ ভাবে আবশ্যক। সমস্ত শরীর ঘামাইয়া গেলে সমস্ত শরীরই ভিজা তোয়ালে দ্বারা মুছিয়া ফেলা কর্তব্য। যে-অঙ্গে বাষ্প প্রয়োগ করা হয়, তাহা ভিজা তোয়ালে দ্বারা মুছিয়া পরক্ষণেই আবার বস্ত্র প্রভৃতির দ্বারা জড়াইয়া চর্মের তাপ ফিরাইয়া আনিতে হয়। শীতল করার পর চর্মের তাপ ফিরাইয়া আনা সকল প্রকার বাথের পক্ষেই একান্ত অপরিহার্য। একটু দীর্ঘ সময়ের জন্য আংশিক ষ্টিমবাথ গ্রহণ করিলে, বিশেষত মাথায় অথবা মুখে নিলে, বাথের পর একবার হিপবাথ নেওয়া অবশ্যই কর্তব্য। তাহার পর অল্প লেবুর রস সহ বারে বারে প্রচুর জলপান করা আবশ্যক।

আংশিক ষ্টিমবাথ বহু রোগের পক্ষে উপকারী। বিষাক্ত পোকার দংশনে, অঙ্গে খাইল ধরিলে (in cramps), পাগলা কুকুরের কামড়ে, চুলকানি ও কাউর রোগে (eczema), স্ত্রীলোকদিগের বেদনা সংযুক্ত রজ নিঃসরণে, অর্শে, গুহ্যদ্বারের ঘায়ে, ভগন্দরে ইহা অত্যন্ত ফলপ্রদ।

সর্বপ্রকার বেদনা ও স্ফীতিতে ইহা মন্ত্রশক্তির মত কার্য করে। কারণ ঘর্ম হওয়া মাত্রই সমস্ত বেদনা আপনা হইতে কমিয়া যায়।

দন্তশূল সাধারণত ঔষধ দ্বারা আরোগ্য হয় না, কিন্তু দন্তশূল যত দীর্ঘ দিনের হউক এবং যত ভয়ঙ্করই হউক, আংশিক ষ্টিমবাথে তাহা মন্ত্রের মত আরোগ্য হয়। ২৪ পরগণা জিলার শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল মহাশয়ের দন্ত রোগ হইতে হঠাৎ সমস্ত মুখ ফুলিয়া সেপটিক হইয়া যায়। তাঁহার মুখ ফুলিয়া এমন হইয়া যায় যে, তাঁহাকে দেখিয়া চিনিবার কাহারও সাধ্য থাকে না। তাঁহার সমস্ত মুখের ভিতরে এমন নালি হইয়া গিয়াছিল যে, চোখের নীচে চাপ দিলে সুমুখের দাঁতের গোড়া দিয়া গল গল করিয়া পুঁজ বাহির হইত। দেহের উত্তাপও ছিল ১০২° এবং দিন রাত্রির ভিতর এক লহমার জন্যও তাঁহার ঘুম হইত

না। তিনি প্রথম এক জন এলোপ্যাথিক ডাক্তার ডাকাইলেন। ডাক্তার বাবু মুখের অবস্থা দেখিয়া বলিলেন যে, তৎক্ষণাৎ যদি অস্ত্র করা না হয়, তবে তাঁহার জীবনই বিপন্ন হইবে। কিন্তু হৃষীকেশ বাবু অস্বীকার করিলেন, যদি তাঁহার সমস্ত মুখ অস্ত্রই করিতে হয়, তবে তাহা অপেক্ষা তাঁহার মৃত্যুই হইবে ভাল। তিনি তখন একজন ভাল হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার দেখাইলেন। কিন্তু দুই দিনেও কিছু মাত্র উপকার হইল না। তখন তিনি আমাকে ডাকিলেন। আমি তাঁহার মুখের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সহিত আর পরামর্শ করিতে গেলাম না। তৎক্ষণাৎ একটা স্পিরিট ষ্টোভে একটা জলের বাটি বসাইয়া তাহাতে বাষ্প উৎপন্ন করিলাম এবং তাঁহার মাথা ধুইয়া লইয়া তাহার উপরে হাঁ করিয়া মুখ রাখিতে বলিলাম। পাঁচ ছয় মিনিট পরেই মুখ দিয়া ঘাম বাহির হইতে লাগিল এবং দাঁতের সেই প্রবল বেদনা ঘাম বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল। তাহার পর মুখ দিয়া পূঁয, রক্ত আর প্রচুর দূষিত থুথু নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার মুখের সম্মুখে একটা পিকদানি ধরা হইয়াছিল। ঐ-পিকদানিটা পূযে রক্তে প্রায় ভরিয়া গেল। দশ মিনিট পরে বাষ্প সরাইয়া নিলাম এবং তাহার পর শীতল জল দ্বারা তাঁহাকে কুলকুচা করাইয়া এবং সমস্ত শরীর ভিজা তোয়ালে দ্বারা মোছাইয়া তাঁহাকে শোয়াইয়া দিয়া চলিয়া গেলাম। যাইবার সময় বলিয়া গেলাম, উনি কেমন থাকেন এক ঘণ্টা পরে যেন আমাকে তাহা জানান হয়। কিন্তু দেড় ঘণ্টার মধ্যেও আমার কাছে কোন লোক আসিল না। এ-জন্য আমার উদ্বেগ ছিল যথেষ্ট। আমি নিজেই তখন গেলাম। রোগীর ঘরে গিয়া দেখি, রোগী অঘোরে ঘুমাইতেছেন। আমি তখন সকলকে বলিয়া আসিলাম, রেগীর ঘুম যেন কিছুতেই ভাঙা না হয় এবং ঘুম ভাঙিলে যেন আমাকে সংবাদ দেওয়া হয়। বেলা ১২ টার সময় তাঁহাকে বাষ্প প্রয়োগ করিয়াছিলাম, আর তাঁহার ঘুম ভাঙিল বেলা পাঁচটায়। ঘুম ভাঙিতেই

তিনি আমাকে ডাকাইলেন। আমি গেলে তিনি আমাকে বলিলেন, তাঁহার আর একটুও বেদনা নাই এবং খুব ভাল ঘুম হইয়াছে। আমি তখন তাঁহাকে দিনে দুইবার স্পঞ্জবাথ এবং কেবল নেবুর রস সহ জলপানের ব্যবস্থা দিয়া মুখে একটা ভিজা নেকড়ার পটি ফ্লানেল দ্বারা ঢাকিয়া বাঁধিয়া দিলাম। ঐ-পটি সমস্ত রাত্রি রহিল। পরের দিন ভোর বেলা যাইয়া দেখি, মুখ স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে, মুখের ফুলা নাই—বেদনা নাই—জ্বর নাই—চোখ পর্যন্ত যে অজস্র নালি হইয়া গিয়াছিল তাহাও নাই। কেবল চোখের নীচে সামান্য ফুলা রহিয়াছে। আমি তখন তাঁহার মুখে আবার পটি বাঁধিয়া দিলাম এবং পরের দিনই তিনি আরোগ্য হইয়া গেলেন। হৃষীকেশ বাবু মিণ্টে কাজ লইয়াছিলেন। তাঁহার কি একটা ছুটি ছিল তখন। তিন দিন পর ছুটি শেষ হইল। আমি তখন তাঁহাকে বলিলাম, 'আপনি আরোগ্য হইয়াছেন সত্য, কিন্তু আপনার আরও সাতদিন বিশ্রাম নেওয়া চাই।' তিনি ছুটি নিয়া আসিবেন বলিলেন, কিন্তু তাহাতে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট আবশ্যক হয়। তিনি মিণ্টের ডাক্তার সাহেবের কাছে গেলেন সার্টিফিকেট আনিতে। ডাক্তার সাহেব তাঁহার মুখ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, 'তোমার এমন কিছুই হয় নাই যে তুমি ছুটি পেতে পার।'

সর্বপ্রকার পুরাতন দন্তরোগ ও দন্তশূলও ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভ করে। ভিজা চাদরের প্যাক প্রভৃতির সঙ্গে আংশিক ষ্টিমবাথ দিয়া আমি দাঁতের যত কঠিন রোগী আরোগ্য করিয়াছি, কেবল যদি তাঁহাদের কথাই লিখি, তবে তাহা এক খানা ছোট বই হয়। কিন্তু আঘাত জনিত যে দাঁতের বেদনা, তাহাতে যেন কখনও বাষ্প প্রয়োগ করা না হয়। প্রয়োগ করিলে দাঁতটিই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ঐ-অবস্থায় শীতল জল বার বার মুখে রাখিলেই বেদনা অল্প সময়ে নষ্ট হয়।

গ্লুকোমা অত্যন্ত কঠিন ব্যাধি। অস্ত্র ব্যতীত ইহা প্রায় কখনও

আরোগ্য হয় না। কিন্তু চক্ষু বন্ধ করিয়া কয়েক দিন চোখে বাস্প লাগাইলে ইহা আশ্চার্যভাবে আরোগ্য হয়। বরিশাল জিলার শ্রীযুক্ত অনন্ত কুমার সরকারেব বেড়িবেড়ি হইয়া গ্লুকোমা হইয়াছিল। তিনি মেডিক্যাল কলেজে চক্ষু পরীক্ষা করিলে ডাক্তারেরা বলিলেন যে, তাঁহার চোখের ভিতরে জল জমিয়াছে। এই জন্য অবিলম্বে অস্ত্র করা দরকার। ইতিমধ্যে আমি তাঁহাকে একটা ভিজা চাদরের মোড়ক (wet-sheet pack) দিয়া কয়েক দিন পর্যন্ত চোখে বাস্প লাগাইতে বলিলাম। সাতদিন ইহা প্রয়োগ করিয়া তিনি পুনরায় মেডিক্যাল কলেজে গেলেন। তখন ডাক্তারেরা তাঁহার চক্ষু পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার চোখে আর জল নাই। তিনি ভাল হইয়া গিয়াছেন।

ঠিক এইভাবে কালীঘাট রোগের একটি মহিলার গ্লুকোমা আরোগ্য করিয়াছিলাম।

৭.

[৬]

উষ্ণ সেক (Fomentation)

আংশিক বাস্পস্নানে যে-ফল হয়, উষ্ণ সেকেও অনেকটা সেই ফল হইয়া থাকে। কাটা কম্বল, ভাঁজ করা ফ্লানেল অভাবে তুলা বা তোয়ালে প্রভৃতির দ্বারাও সেক দেওয়া যাইতে পারে। ফ্লানেলখানা ফুটন্ত জলের ভিতর ডুবাইয়া একখানা তোয়ালের ভিতর রাখিতে হয়। তাহার পর তোয়ালেখানির দুইদিক ধরিয়া ইহা বিনা ক্লেশে নিংড়ান যায়। জল যাহাতে ঠাণ্ডা হইয়া না যায় সেই জন্য জল একটা পাত্রে ঢাকিয়া রাখা যাইতে পারে।

সেক দেওয়ার সময় চর্মের উপর সেক না দিয়া শরীরের যে-স্থানে সেক দিতে হইবে, তথায় একখানা শুষ্ক ফ্লানেল বা তোয়ালে রাখিয়া তাহার

উপরে সেক দেওয়া উচিত। তাহা হইলে আক্রান্ত স্থানে খুব বেশী উত্তাপ অনেকক্ষণ পর্যন্ত প্রয়োগ করা যায়। সেকের উত্তাপ যাহাতে বাহির হইয়া যায়, সেই জন্য গরম ফ্লানেল শরীরের উপর রাখিয়াই অবিলম্বে তাঁহা এক খানা কম্বল বা পশমী আনোয়ান দ্বারা চাপা দিতে হয়। তাহা হইলে সেকের উত্তাপ প্রায় পাঁচ মিনিট পর্যন্ত থাকে এবং সেকের চারিদিক বন্ধ থাকায় ঐ স্থানে একটা আংশিক ষ্টিমবাথের কাজ হয়। যদি দীর্ঘ সময় সেকের উত্তাপ রাখার প্রয়োজন হয়, তবে সেকের ফ্লানেলের উপর একটা গরম জলের বোতল বা রবারের ব্যাগ (hot water bag) রাখিয়া তাহা কম্বল দ্বারা চাপা দেওয়া যাইতে পারে। কিছু সময় সেক দিবার পর পাত্রস্থিত জলের উত্তাপ যখন কমিয়া আসে তখন ফ্লানেলের ভিতর কিছু বেশী জল রাখিয়া সেক দেওয়া কর্তব্য। তাহা হইলে উহা কিছু দীর্ঘ সময় পর্যন্ত গরম থাকিবে। সেকের উত্তাপ কমিয়া গেলে ফ্লানেল সরাইয়া নিয়াই আর এক খানা গরম জলে ডুবান ফ্লানেল তৎক্ষণাৎ ঐ স্থানের উপর রাখা কর্তব্য। এই জন্য এক খানা সরাইবার পূর্বেই আর এক খানা প্রস্তুত করা আবশ্যক।

সাধারণত বেদনার স্থান যত বড় হয় তাহার আটগুণ কি দশগুণ স্থান ব্যাপিয়া সেক দেওয়া আবশ্যক, (J. H. Kellogg, M. D.—Rational Hydrotherapy, P. 72.)। তাহা হইলেই সেকে সর্বাপেক্ষা ভাল কাজ হয়।

মধ্যকায়ের (trunk) কোথাও সেক দিতে হইলে তাহার পূর্বে বিশেষ ভাবে লক্ষ করা আবশ্যক, হাত পা যেন ঠাণ্ডা না থাকে এবং রোগীর মাথায় যেন রক্তাধিক্য না থাকে। রক্তাধিক্য থাকিলে রোগীর মাথাটি পূর্বে ভাল করিয়া ধুইয়া লইয়া এবং মাথায় ভিজা তোয়ালে জড়াইয়া তাহার পর সেক দেওয়া আবশ্যক।

যদি পুরাতন রোগের জন্য সেক দেওয়ার আবশ্যক হয় তবে

সেকের স্থানে পূর্বে কতকটা পুরাতন ঘৃত বা তৈল মালিশ করিয়া লওয়া কর্তব্য। সেক এ-ভাবে প্রয়োগ করা আবশ্যক, যেন রোগীর শরীর পুড়িয়া না যায়। যদি ফ্লানেল খুব ভাল করিয়া নিংড়াইয়া লওয়া হয় এবং চর্মের উপর পুরাতন ঘৃত কি তৈল ইত্যাদি মালিশ করিয়া লওয়া হয়, তবে রোগীকে পোড়াইয়া ফেলিবার প্রায় কোন ভয় থাকে না। ফোড়া ও ব্রণ প্রভৃতিতে তৈল অবশ্যই বর্জন করা কর্তব্য।

কেবল উত্তাপ প্রয়োগ করিলেই সেক সমাপ্ত হয় না। সেকের শেষে আক্রান্ত স্থান খুব শীতল জলে ডুবান এবং খুব ভালরূপে নিংড়ান এক খানা তোয়ালে দ্বারা ৩০ হইতে ৬০ সেকেণ্ড পর্যন্ত মুছিয়া কতকটা শীতল করিয়া পুনরায় শুষ্ক ফ্লানেল প্রভৃতির দ্বারা আবৃত করিয়া গরম করিয়া লইতে হয়।

প্রবল বেদনার সময় কোন কোন অবস্থায় সুদীর্ঘ সময়ের জন্য সেক দেওয়ার আবশ্যক হয়। ঐ-অবস্থাতেও অর্ধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর খুব শীতল জলে ভিজান এবং খুব ভালরূপে নিংড়ানো এক খানা তোয়ালে দ্বারা এক হইতে দুই মিনিটের জন্য সেকের স্থান মুছিয়া লইয়া পুনরায় সেক দেওয়া কর্তব্য।

সেকের পর রোগী যদি ঘামাইয়া যায়, তবে এক খানি তোয়ালে আবশ্যকানুযায়ী নাতি-শীতোষ্ণ অথবা শীতল জলে ডুবাইয়া রোগীর সর্বশরীর দ্রুত মোছাইয়া দেওয়া কর্তব্য। তাহার পরই অল্প সময়ের জন্য কম্বল ঢাকা দিয়া চর্মের তাপ ফিরাইয়া আনা প্রয়োজন। যদি স্পঞ্জবাথ দেওয়া অসম্ভব হয়, তবে শুষ্ক তোয়ালে দ্বারা ঘর্ম অবশ্যই মুছিয়া আবশ্যক।

সেক প্রয়োগ করিলেই যদি রোগীর প্রচুর ঘর্ম বাহির হয়, তবে অবিলম্বে সেক বন্ধ করা আবশ্যক। কারণ অতিরিক্ত ঘর্মস্রাবে রোগী

দুর্বল হইয়া যাইতে পারে। তখন প্রয়োজন হইলে সেকের পরিবর্তে গরম জলে ভিজান নেকড়া দ্বারা ঐ স্থান মোছাইয়া দেওয়া কর্তব্য।

সেকের পর যদি সেকের স্থানে এক খানা ভিজা নেকড়া রাখিয়া তাহা ফ্লানেল দিয়া ঢাকিয়া বাঁধিয়া রাখা যায় তবে সেকের উপকারিতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সেই ফল অনেকক্ষণ পর্যন্ত চলে। যদি তরুণ প্রদাহের জন্য সেক দেওয়া হয়, যেমন নিউমোনিয়া, প্লুরিসি বা বিসর্পরোগ (erysipelas) তবে সেকের পর ঐরূপ পটি প্রয়োগে বিশেষ ফল হইয়া থাকে।

সেকের প্রধান গুণ ইহাই যে, সিক্ত উত্তাপ (moist heat) অত্যন্ত দ্রুত এবং নিশ্চিত ভাবে বেদনা কমাইয়া দিতে পারে। বেদনা নিবারণের জন্য সেক অত্যন্ত গরম (১৪০° হইতে ১৬০° ডিগ্রি) হওয়া আবশ্যক।

পাকস্থলীর সর্বপ্রকার বেদনাতেই সেক অত্যন্ত উপকারী। এই জন্য চতুর্থ পঞ্জর হইতে নাভি পর্যন্ত এবং দুই দিকে পাঁজরের হাড় পর্যন্ত সেক দেওয়া আবশ্যক।

অজীর্ণ (dyspepsia) রোগে আহারের পর এক ঘণ্টা হইতে দুই ঘণ্টার জন্য পাকস্থলীর উপর গরম জলের থলি (hot water bag) রাখিলে সঙ্কুচিত রক্তবহা নালীগুলি প্রসারিত হয় এবং প্রচুর পাচক রস নির্গত হইয়া থাকে। ইহাতে পরিপাক ক্ষমতাও যথেষ্টরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

কটি বাত ও সাইটিকার বেদনা খুব গরম সেক প্রয়োগে আশ্চর্য ভাবে অন্তর্হিত হয়। পেশিবাত ও সন্ধিবাতের বেদনাও অন্য যে-কোন উপায় অপেক্ষা সেক দ্বারা অপেক্ষাকৃত অনেক সকালে কমে। সেক দেওয়ার সময় বেদনার স্থানের উপর ও নীচের দিকে কয়েক ইঞ্চি বেশী স্থান পর্যন্ত বড় করিয়া সেক দেওয়া আবশ্যক। আবশ্যকানুযায়ী দিনের মধ্যে বহু বার এই সেক প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পিত্তপাথরি, মূত্রপাথরি এবং লিভারের বেদনা প্রভৃতি পুরাতন

বেদনাতেও সেক অত্যন্ত উপকারী। কিন্তু সেক যথেষ্ট পরিমাণ হওয়া আবশ্যক এবং সেকের শেষে ঐ-স্থানে জলপটি প্রয়োগ করিয়া তাহা ফ্লানেল দ্বারা ঢাকিয়া বাঁধিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

গলগ্রন্থি (tonsil), গলনালী (pharynx) অথবা স্বরযন্ত্রের (larynx) প্রদাহে সেকের দ্বারা আভ্যন্তরীণ অংশ হইতে রক্ত চর্ম্মে টানিয়া আনা যায় বলিয়া ইহাতে অত্যন্ত উপকার হয়। এই সব রোগে ১৫ হইতে ২০ মিনিটের জন্য সেক দিয়া তাহার পর এক হইতে দুই ঘণ্টার জন্য গলার চারিদিকে ভিজা নেকড়া পশমী কাপড়ে ঢাকিয়া বাঁধিয়া দিয়া গরম হওয়া মাত্র বার বার পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হয়।

কর্ণের বেদনায় ইহা অত্যন্ত ফলপ্রদ। কিন্তু ইহাতে মুখের দিকটায় সেক দিতে হয়। অন্যথা বেদনা বৃদ্ধি পাইতে পারে।

ব্রণ ও ফোড়ার প্রথম অবস্থায় দিনে দুই তিন বার ১০ মিনিটের জন্য রোগী যতটা গরম সহ্য করিতে পারে ততটা গরম সেক দিয়া অবশিষ্ট সময়ের জন্য ঐরূপ আবৃত পটি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

লিভারের বেদনায় যদি দুই তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর সেক দিয়া মধ্যবর্ত্তী সময়ে ঐ-রূপ পটি বাঁধিয়া দেওয়া যায়, তবে বেদনা দ্রুত কমিয়া যায় এবং লিভারটিও সহজে ঠিক হইয়া আসে। ইহা ব্যতীত বহু রোগে সেকের প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু কত রোগে যে সেকের দ্বারা উপকার হয় তাহার তালিকা দেওয়া একরূপ অসম্ভব।

উষ্ণ-স্নানে উপকার হয় কেন

ইহা হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের চর্ম্মের পরিমাপ প্রায় ১৭ বর্গ ফুট। এই বিস্তৃত স্থানের প্রত্যেক স্কোয়র

ইঞ্চি স্থানে ২,৮০০ ছিদ্র রহিয়াছে এবং একজন পূর্ণদেহ ব্যক্তির সর্বশরীরে এইরূপ প্রায় ৭০ লক্ষ ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রগুলির সহিত এক একটি করিয়া ক্ষুদ্র নলাকার গ্রন্থি যুক্ত থাকে। একটি মানব দেহের এই গ্রন্থিগুলি যদি পর পর যোগ দেওয়া যায়, তবে তাহাদের দৈর্ঘ দশ মাইল হইতে পারে। এই ছিদ্রগুলি দিয়া দেহ কতকটা ফুসফুসের মত অম্লজান বায়ু (Oxygen) ভিতরে টানিয়া নেয়। এই জন্য চর্মকে কেহ কেহ তৃতীয় ফুসফুস বলেন। এই ছিদ্র-পথে অর্ধ সের হইতে এক সের পর্যন্ত দূষিত পদার্থও প্রতিদিন দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। অধিকাংশ সময়েই তাহা গ্যাসের আকারে বাহির হয়। তাই আমরা তাহা দেখিতে পাই না। কিন্তু গরম দিনে, অথবা ব্যায়ামের পর অথবা বাষ্প স্নান করিলে ঘর্মের আকারে তাহা চর্মের উপর বাহির হইয়া আসে (W. D. Halliburton—Handbook of Physiology, p, 606) রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই ঘর্ম দেহের জীর্ণ ও দেহ সঞ্চিত বিজাতীয় পদার্থে পূর্ণ।

যে-দ্বার দিয়া প্রকৃতি দৈনিক এক সের করিয়া দূষিত পদার্থ বাহির করিয়া দেয়, সেই দ্বার যখন বন্ধ হইয়া যায়, তখন অসুখ না হইয়া পারে না। আমাদের বহু রোগ এই লোমকূপ বন্ধ হইয়াই উৎপন্ন হয়। পুরাতন রোগে প্রায়ই লোমকূপগুলি বন্ধ থাকে। তরুণ রোগেও অনেক সময় লোমকূপ বন্ধ হইয়া যায়। যখন ষ্টিমবাথ প্রভৃতির সাহায্যে আমরা লোমকূপগুলি খুলিয়া দেই এবং তাহার ভিতর দিয়া দেহের দূষিত পদার্থ ঘর্মের আকারে বাহির হইয়া যায়, তখন রোগ আপনি সারে।

কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন, ঘর্ম উৎপাদন করিয়া রোগ আরোগ্য করিবার এই পদ্ধতি সাহেবেরা আমাদের দেশে আমদানি করিয়াছে। চরক পড়িলে ইহা দেখিয়াই মুগ্ধ হইতে হয় যে, তাহার ভিতর ঘর্মস্নান করিবার কত পদ্ধতি রহিয়াছে।

বাষ্প-স্নান সম্বন্ধে চরক বলিয়াছেন, 'হাঁড়ির মধ্যে বিভিন্ন স্বেদজনক পদার্থ রাখিয়া তপ্ত করিয়া হাঁড়ির মুখে নল বসাইয়া তন্মধ্যস্থ উষ্ণ বাষ্প দ্বারা রোগীকে স্বেদ দিবে। নল বিনমিত করিয়া তদ্বারা বাষ্প-স্নান করা উচিত। বাষ্প রোগীর শরীরে সরল ভাবে না পড়িয়া বক্রভাবে পড়িলে বেগ প্রচণ্ড হইতে পারে না এবং শরীরে দাহজনক হইতে পারে না, অথচ বাষ্প-স্নান সুখের হয় (সূত্রস্থানম্, ১৪।২৯)'।

চরকে এইরূপ বহু প্রকার স্বেদবিধি রহিয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

জলপানে রোগ আরোগ্য

[১]

আমাদের দেহখানিকে জটিল একটি জলপ্রণালী বলা চলিতে পারে। ছোট ও বড় বিভিন্ন নলের ভিতর দিয়া ইহার এক অংশ হইতে অপর অংশে বিভিন্ন জাতীয় তরল পদার্থ যাতায়ত করিতেছে। প্রকৃতি দেহের প্রত্যেকটি তন্তুতে যে-পুষ্টিকর পদার্থ পরিবেশন করে, জলই তাহার বাহন। দেহের প্রত্যেকটি ক্ষুদ্রতম কোষ পর্যন্ত সর্বদা জলের দ্বারা পরিস্নাত হইতেছে।

আমাদের দেহের ৭০ ভাগই জল। আমাদের লালার শতকরা ৯৯.৫ অংশ জল দ্বারা গঠিত। পাকস্থলীর অম্লরসের ৯৭.৫ অংশ, মূত্রের ৯৩.৬ অংশ, পিত্তের ৮৮ অংশ, মাংসের ৭৫ অংশ, ঘর্মের ৫৬.৮ অংশ এবং হাড়ের পর্যন্ত শতকরা ১৩ অংশ জল। দেহের এই জলীয় অংশ প্রতিনিয়ত মল, মূত্র ও ঘর্মের সহিত বাহির হইয়া যাইতেছে। দেহে এই রসের সমতা রক্ষা করার জন্যই বিশেষ ভাবে জল পান করা আবশ্যক। যদি আমরা তাহা না করি, তবে প্রকৃতি রক্ত, মাংসপেশি ও দেহের তন্তু হইতে জলীয় অংশ টানিয়া নিতে বাধ্য হয়। তাহার ফলে দেহ কৃশ হয় এবং ক্রমশ শুকাইয়া যাইতে থাকে। দেহে জলীয় অংশের অভাব হেতু প্রথমেই কোষ্ঠবদ্ধতা আসে। তাহারপর রক্তশূন্যতা এবং পরে বিভিন্ন রোগ লক্ষণ দেহে উৎপন্ন হয়।

যেমন নরদমা পরিষ্কার করার জন্য যথেষ্ট জল ঢালা আবশ্যক, তেমনি দেহের নরদমা ধুইবার জন্যও প্রতিদিন যথেষ্ট জলপান করা প্রয়োজন। আমাদের দেহ প্রতিনিয়ত ক্ষয় হইতেছে। যে-সকল জীবকোষ (cell) নষ্ট হইয়া লায়, রক্ত তাহা ধোয়াইয়া নিয়া দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। কিন্তু রক্তে জলীয় অংশের অভাব হইলে ঐ-নষ্ট জীবকোষগুলি কতকটা দেহের ভিতরে থাকিয়া যায় এবং দেহে বিজাতীয় পদার্থের সঞ্চয় বৃদ্ধি করে।

দেহের প্রচুর বিষ প্রতিদিন বাহির হইয়া যায় মূত্রের ভিতর দিয়া। এই বিষ যে কত ভয়ঙ্কর ইহা হইতেই তাহা বোঝা যায় যে, মাত্র তুইটি দিন যদি ইহা বাহির হইতে না পারে, তবে দেহের সমস্ত রক্তই বিষাক্ত হইয়া উঠে। দেহের ঐ-অবস্থাকে যুরেমিয়া বলে। দেহের বিষ ও বিভিন্ন দূষিত পদার্থ বাহির করিবার মূত্রদ্বারই প্রকৃতির অন্যতম প্রধান দরজা। প্রতিদিন প্রচুর জলপান করিলেই তবে প্রকৃতি মূত্রের ভিতর দিয়া যথেষ্ট দূষিত পদার্থ বাহির করিয়া দিতে সমর্থ হয়।

এই জন্য জলপানই সর্বরোগের অন্যতম প্রধান চিকিৎসা।

কোষ্ঠ পরিষ্কার করিতে জলের ক্ষমতা অসাধারণ। ভোর বেলা ঘুম হইতে উঠিয়া শয্যাত্যাগের অর্ধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা পর যদি তিন বারে অর্ধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর অর্ধ গ্লাস করিয়া শীতল জল পান করা যায়, তবে কোষ্ঠ পরিষ্কারের পক্ষে তাহা বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। অনেক সময় এক গ্লাস জল পানেই বিশেষ ফল পাওয়া যায়। আর্য ঋষিগণ ইহাকে উষাপান বলিতেন।

দেহের অবসাদ নষ্ট করিতে জলের মত কিছু আর নাই। আমার পূর্বে একটা রোগ ছিল এই, আমি ক্ষুধা সহ্য করিতে পারিতাম না। যখনি ক্ষুধা লাগিত, তখনি আপনা হইতে সমস্ত শরীর ভাঙিয়া আসিত, মুখের হাসি নিবিয়া যাইত এবং সামান্য কারণেই রাগ হইত। আহার শেষ না

হইতে কখনও এই ভাবটা কাটিয়া যাইত না। তাহার পর জল-চিকিৎসার একখানা পুস্তক পড়িয়া দেহ অবসাদ বোধ করা মাত্রই এক গ্লাস শীতল জল পান করিতে লাগিলাম। আমি আশ্চর্য হইয়া একদিন দেখিলাম, জলপান করিয়া পাঁচ মিনিট যাইতে না যাইতেই মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। কিছুদিন ঐ-ভাবে জলপান করার পরই আমার অবসাদ নষ্ট হইয়া গেল। এখন আর আমার ঐ-ভাবে জলপান করিবার আবশ্যক হয় না।

অনেক সময় আমাদের মনে হয়, শরীরটা কেমন কেমন, কেন খারাপ বুঝি না তথাপি খারাপ, বমি বমি ভাব, অথবা অম্লের উদ্গার উঠে, তখন এক গ্লাস শীতল জল পানের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় দেহের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে।

জ্বরের সময় জলপান অত্যন্ত উপকারী। রোগী যতটা জল বিনা ক্লেশে পান করিতে পারে ততটা জলই তাহাকে পান করিতে দেওয়া উচিত। জ্বরের সময় পূর্ণবয়স্ক লোকের দৈনিক আড়াই সের হইতে তিন সের জল পান করা কর্তব্য। প্রত্যেক ঘণ্টায় অর্ধ গ্লাস হইতে এক গ্লাস জল পান করিতে পারিলে ভাল হয়। কারণ জল দেহ হইতে যথেষ্ট জীবাণু, জীবাণু-বিষ ও বিজাতীয় পদার্থ বাহির করিয়া লইয়া যায়। জ্বরের সময় শীতল জল পান করিলে রোগীর নাড়ি স্পন্দন মিনিটে ১০ হইতে ১৫ বার কমিয়া যায়, কিন্তু রোগীর যখন শীত ও কম্প থাকে তখন তাহাকে কখনও শীতল জল পান করাইতে নাই। ঐ-অবস্থায় সকল রোগে সর্বদা গরম জলই পান করান কর্তব্য। ঘর্মের সময়ও জ্বর রোগীকে শীতল জল পান করান উচিত নয়। জ্বর রোগীর জলে কয়েক ফোঁটা নেবুর রস দেওয়া বিশেষ ভাবে আবশ্যক। তাহাতে তাহার অত্যন্ত উপকার হয়।

বাতব্যাধিতে জলপান অত্যন্ত উপকারী। ইহা রক্তকে তরল করে এবং দেহের ভিতর সঞ্চিত য়ুরিক এ্যাসিড (uric acid) ও অন্যান্য বিষ

গলাইয়া দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। প্রচুর জল পানে ঘর্ম বৃদ্ধি হয় বলিয়াও বাতব্যাধিতে জলপান অত্যন্ত ফলপ্রদ।

যাহারা অত্যন্ত মোটা হইয়া যায়, বাষ্পস্নান ও খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতিই তাহাদের প্রধান চিকিৎসা। কিন্তু তাহারা প্রচুর জলপান করিলেই কেবল দেহের ভগ্ন কোষগুলি দেহ হইতে সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে।

বহুমূত্র রোগে যথেষ্ট জলপান করিলে জলের সহিত দেহ-সঞ্চিত অতিরিক্ত শর্করা মূত্র ও ঘর্মের সহিত বাহির হইয়া যায় এবং তাহাতে রোগী যথেষ্ট ফল পায়। আমি একটি রোগীর কথা জানি, সে কেবল উষাপান করিয়াই দুরন্ত বহুমূত্র রোগ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল।

একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার বলিয়াছেন, যদি প্রত্যেক লোক প্রতিদিন আট আউন্স গ্লাসের আট গ্লাস জল পান করে এবং মাংসাহার পরিত্যাগ করে, তবে দুই পুরুষের ভিতর পৃথিবী হইতে বহুমূত্র রোগ সম্পূর্ণ উঠিয়া যাইতে পারে (H. S. Gambers—Miracles of water, P, 23)।

কামলা রোগে দিনে দশ বার গ্লাস জল পান করিলে, কামলা রোগ আরোগ্য হয়।

যাহাদের দীর্ঘ দিনের অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা অন্য প্রকার পেটের অসুখ আছে, তাহারা দুইবেলা আহারের এক ঘণ্টা পূর্বে এক গ্লাস করিয়া শীতল জল পান করিলে আশ্চর্য ফল পাইবেন।

জল পানের ইহাই নিয়ম যে, আহারের সময় জল পান না করিয়া আহারের এক ঘণ্টা হইতে দেড় ঘণ্টা পূর্বে জল পান করিতে হয়। ভাল করিয়া চিবাইয়া খাইলে লালা প্রভৃতি পাচক রস এত পরিমাণে খাদ্য দ্রব্যের ভিতর নামিয়া আসে যে, আর জল পান করিবার আবশ্যক করে না।

আহারের সময় অথবা অব্যবহিত পর জল, সোডা, লেমনেড অথবা অন্য প্রকার পানীয় পান করিলে পাচক রস সমূহের শক্তি নষ্ট হয় এবং

এই কু-অভ্যাসের জন্যই অধিকাংশ সময় কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়।

প্রকৃতির ইহা নিয়ম নয় যে, আমরা আহারের সময় জল পান করিব। আমরা দেখি বনের পশুগুলি এক সময়ে আহার করে এবং অপর সময়ে জলপান করে। জলপানের জন্য পরে দলবদ্ধ হইয়া তাহারা নদী অথবা কোন জলাশয়ে যায়। গৃহপালিত কুকুর ও বিড়ালগুলি যখন আহার করে, তখন তাহারা জলপান করে না। সমস্ত প্রাণীর পক্ষেই ইহা স্বাস্থ্যরক্ষার অতি শ্রেষ্ঠ নিয়ম।

প্রকৃতির এই নিয়মটি মানিয়া চলিলেই দুরারোগ্য কোষ্ঠকাঠিন্য ও অজীর্ণ রোগ হইতে অতি অল্প দিনে মুক্ত হওয়া যায়। আহারের সময় জল না খাইলে পাচক রস সমূহ পূর্ণ ভাবে ভুক্ত পদার্থের উপর কার্য করিতে পারে। সুতরাং খুব দুর্বল রোগীরও হজমশক্তি ইহা দ্বারা বৃদ্ধি পায়। আবার যাহাদের কোষ্ঠকাঠিন্য আছে, আহারের সহিত জল পান পরিত্যাগ করিলে, ভুক্ত দ্রব্য সম্পূর্ণ হজম হওয়ার জন্য অন্ত্রের এরূপ ক্ষমতা হয় যে, দিনে একবার কি দুইবার সঞ্চিত মল সে বাহির করিয়া দেয়।

দীর্ঘ দিনের অভ্যাসের জন্য প্রথম প্রথম আহারের পর অথবা আহারের সময় পিপাসা পাইতে পারে, কিন্তু তিন চারদিন পর দেখা যাইবে যে আর পিপাসা পায় না।

কিন্তু নিয়মিত জলপান তাহার জন্য কোন অবস্থাতেই বন্ধ করিতে নাই। কারণ জলই দেহের পক্ষে প্রাণ স্বরূপ। কিন্তু জলপানের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় আহারের এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা পূর্বে, পেট যখন খালি থাকে এবং আহারের তিন চার ঘণ্টা পরে, যখন ভুক্তদ্রব্য হজম হইয়া যায় (Reddie Mallett—Nature's way, P. 16-17)।

পেট যখন খালি থাকে তখনই প্রচুর জল পান করা কর্তব্য। একবার এক গ্লাস জল পান করার পর সেই জলটা দেহ হইতে বাহির হইয়া গেলেই

আবার জল পান করা যাইতে পাবে। এই ভাবে খুব ভোরে প্রয়োজনানুসারে দুই তিন গ্লাস জল, মধ্যাহ্ন আহারের পূর্বে এক গ্লাস, মধ্যাহ্ন আহারের তিন ঘণ্টা পর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কয়েক গ্লাস এবং রাত্রিতে আহারের পূর্বে একবার শীতল জল পান করিলেই তবে ঠিক ঠিক জল পান করা হয়।

পানীয় গ্রহণ করার ইহাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। কিন্তু এই পদ্ধতি যে কত প্রয়োজনীয় তাহা আমি প্রকাশ করিতে পারিলাম কিনা সন্দেহ। মনে হয় ঘরের ছাদে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া এই কথাটা প্রচার করা উচিত।

আহারের সময় জলপানের কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া আহারের পূর্বে এইরূপে জল পান করিলে কোনরূপ পেটের অসুখ থাকিতে পারে না। সুতরাং অতি অল্প দিনে দেহ সবল, সুস্থ ও পুষ্ট হয়।

আহারের পূর্বে জল পান করিলে ক্ষুধা ও হজম শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং পাকস্থলী সবল হয়। পাকস্থলীর ভিতর যে-সকল খাদ্যদ্রব্য পচিয়া থাকে জল পানে তাহা সম্পূর্ণ ধৌত হইয়া যায়। সুতরাং এক ঘণ্টা পর যখন নূতন খাদ্য পাকস্থলীতে আসে তখন পাচক রস ও খাদ্য দ্রব্যের ভিতর আর তৃতীয় কোন পদার্থ থাকে না। এই জন্য আহারের পূর্বে জল পানে অজীর্ণ, পাকস্থলীর জ্বালা, পেট ফাঁপা প্রভৃতি অতি অল্প দিনে আরোগ্য হয়।

ইহাতে মন্থর যকৃৎ সবল হয় এবং প্রচুর পিত্ত রস নির্গত হইয়া ভুক্ত পদার্থের ভিতর নামিয়া আসে।

ইহা দ্বারা মূত্র-প্রবাহ অব্যাহত হয়, প্রচুর প্রস্রাব হয়, মূত্র পরিষ্কার ও দুর্গন্ধশূন্য হয় এবং মূত্রাশয় (kidney) রক্ত হইতে যে-মূত্র ছাঁকিয়া লয় তাহার সেই কাজ অত্যন্ত লঘু হইয়া যায়। আমাদের মূত্রাশয় তলপেটের কটিদেশে (in the lumber region) উদরবেষ্টন ঝিল্লীর পশ্চাতে

মেরুদণ্ডের উভয় দিকে অবস্থিত। ইহা প্রায় চার ইঞ্চি দীর্ঘ। রক্ত হইতে মূত্র ছাঁকিয়া লইয়া দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়াই মূত্রাশয়ের কাজ। মূত্রাশয় দেহের অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র। এইরূপ জল পান মূত্রযন্ত্রের ব্যাধিতে অত্যন্ত ফলদায়ক হয়।

ইহাতে অন্ত্রের কীটতরঙ্গবৎ গতি বৃদ্ধি পায় এবং অন্ত্রের ভিতর মল দীর্ঘ দিন থাকিয়া পচিয়া উঠিতে পারে না।

ইহা দ্বারা রক্ত তরল ও পরিষ্কার হয় এবং সর্বদেহে সুচারুরূপে রক্ত সঞ্চালিত হয় (Elma Stuart—What must I do to get well? and how can I keep so? 32nd. Edition, p. 22—24)।

সাধারণ পানীয় জল বেশ শীতল (70 F) হওয়াই উচিত। কিন্তু জ্বর ও কোষ্ঠবদ্ধতায় একটু বেশী শীতল জল (৬০° হইতে ৬৫°) হইলেই ভাল হয়। কিন্তু জল পানের বিশেষ একটা পদ্ধতি আছে। কলস হইতে জল গড়াইয়া ঢক ঢক করিয়া না গিলিয়া, একটা গ্লাসে জল ঢালিয়া তাহাই অন্য আর একটা গ্লাসে বার বার ঢালাঢালি করিয়া তবে পান করা উচিত। ইহাতে জলের ভিতর বায়ু প্রবিষ্ট হয় এবং জলে প্রাণের সঞ্চার হয়। এই ভাবে জল পান করিলে সেই জল দেহের পক্ষে অত্যন্ত উপকারে আসে। দুগ্ধ সরবত প্রভৃতিও ঠিক এইভাবে পান করা উচিত।

জলপান হিতকারী হইলেও কোন কোন সময়ে জলপানে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। পাকস্থলীর আকার বৃদ্ধি পাইলে, ঠাণ্ডা লাগিয়া বুকে বেদনা হইলে এবং অত্যন্ত শ্রান্তি ও ঘর্মের সময় জলপান করা উচিত নয়। অত্যন্ত দুর্বল যে রোগী তাহাদের বিশেষ সতর্কতার সহিত জলপান করা উচিত। জলপানে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ নিয়ম ইহাই যে, যতটা জল সহ্য হয়. অর্থাৎ যতটা পান করিতে কষ্ট না হয়, ততটাই পান করা উচিত। অতিরিক্ত জলপান অল্প জলপানের মতই দূষণীয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্নানে আরোগ্য

[১]

বাজারে টনিক নামে যে বিভিন্ন জাতীয় উত্তেজক ঔষধ বিক্রয় হয়, তাহারা ক্ষণকালের জন্য স্নায়ুমণ্ডলীকে চঞ্চল করিয়া দেহের ভিতর কৃত্রিম একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করে। আমরা তাহাকে শক্তি বলিয়া ভ্রম করি। কিন্তু পরক্ষণেই তাহা অধিকতর অবসাদে নামিয়া আসে। পক্ষান্তরে শীতল জলের স্পর্শে সমস্ত দেহে যে জীবনীশক্তির উদ্দীপনা হয়, তাহার পশ্চাতে অবসাদ আসে না এবং তাহা দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয়।

এই জন্য শীতল জলে স্নানই সর্বাপেক্ষা বড় টনিক এবং কেবল স্নানের দ্বারাই বহু রোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়।

প্রাচীন রোমকেরা বাহুবলে বিশাল সাম্রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রায় ৫ শত বৎসর পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে বিস্তৃত স্নানাগার ব্যতীত তাঁহাদের চিকিৎসার আর কোনরূপ বন্দোবস্ত ছিলনা। স্নানাগারই ছিল তাঁহাদের একমাত্র হাঁসপাতাল। রোমক সৈন্যেরা কোথায়ও পৌঁছিবার পূর্বেই সেখানে তাহাদের জন্য স্নানাগার প্রস্তুত করা হইত। রোম তাঁহার সৈন্যগণকে প্রতিদিন স্নান করাইয়াই সর্বরোগ হইতে মুক্ত রাখিতেন (F. W. Powel—Water treatments, P. 24—30)।

প্রাচীন গ্রীসে স্পার্টার লোকেরা তাহাদের বীরত্বের জন্য বিখ্যাত ছিল। ঐ-দেশের গভর্ণমেণ্ট আইন করিয়া সর্বসাধারণের জন্য স্নান

বাধ্যতামূলক করিয়াছিলেন। কারণ রোগ হইতে দেহকে মুক্ত রাখিবার পক্ষে স্নানই প্রধান উপায়।

সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণ এই কথাটা জানিতেন। এই জন্যই তাঁহারা প্রাতঃস্নান, মধ্যাহ্নস্নান, সায়ং স্নান, গ্রহণে স্নান, নন্দা স্নান, মকর স্নান, বারুণী স্নান প্রভৃতি পদে পদে স্নানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

আধুনিক ডাক্তারগণও স্নানের উপকারিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছেন এবং তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ইহা দ্বারা সর্বপ্রকার রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করা যাইতে পারে।

একবার মিশরে বৃটীশ সৈন্যদলের ভিতর টাইফয়েড রোগের প্রবল প্রাদুর্ভাব হয়। ইহা এমন ব্যাপক ভাবে আক্রমণ করে যে, অল্প সময়ের মধ্যেই সৈন্যদলের এক পঞ্চমাংশ অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং প্রতিদিন রোগীর সংখ্যা বাড়িতে থাকে। যাহারা টাইফয়েডে আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহাদের ভিতরে অনেকের নিউমোনিয়া দেখা দেয়। তখন সৈন্যদলের প্রধান ডাক্তার সমস্ত সৈন্যদলকে সমুদ্রের পাড়ে মার্চ্চ করাইয়া নিয়া প্রত্যেক সৈন্যকে দিনে তিনবার স্নান করাইতে আরম্ভ করেন। একান্ত আশ্চর্যের বিষয় ইহাই, ইহার দুই তিন দিনের ভিতরেই নূতন রোগের আক্রমণ কম হইয়া আসে এবং অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই রোগের নূতন আক্রমণ সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায় (J. H. Kellogg, M. D.—Rational Hydrotherapy, P. 532)।

প্রকৃতপক্ষে ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। দেহের জীবনীশক্তি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (vital resistance) যখন কমিয়া যায়, তখনই মাত্র আমাদের রোগ হইতে পারে। তাহার পূর্বে কোন জীবাণুই কোন রোগ উৎপন্ন করিতে পারে না। শীতল জলে স্নান করিলে জীবনী শক্তি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই জন্য

একমাত্র নিয়মিত স্নান দ্বারাই বহু রোগ হইতে মুক্ত থাকা যাইতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার স্নানই অন্যতম প্রধান উপায়।

বিলাতের প্রসিদ্ধ ডাক্তার কারি (Dr. James Currie) বলিয়াছেন, 'যদি কেহ অসংখ্য প্লেগ রোগীর ভিতর থাকে এবং প্রতিদিন নিয়মানুযায়ী স্নান করে, তবে প্লেগের দ্বারা সে আক্রান্ত হয় না।' আর এক জন বিখ্যাত ডাক্তার (Alfred Martinet, M. D.) বলিয়াছেন, 'জীবাণুর আক্রমণ রোধ করিতে স্নানের মত আর কিছুই নাই (Clinical Therapeutics, P. 875)। যখন দেশে মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয় তখন দিনে দুই তিন বার শীতল জলে স্নান করাই রোগ হইতে মুক্ত থাকিবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

দেহকে সুস্থ রাখিতে হইলে নিয়মিত দুইবেলা স্নান একটি শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। নিয়মিত স্নানে হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়, ক্ষুধার সৃষ্টি হয় এবং একটা অনবদ্য আনন্দ ও তৃপ্তিতে সমস্ত মন ভরিয়া উঠে।

আমাদের দেশে স্নান করিয়া আহার করিবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। তাহার কারণ এই, স্নানের দ্বারা পাকস্থলী সবলতা লাভ করে এবং পাকস্থলী হইতে প্রচুর পাচক রস খাদ্যদ্রব্যের ভিতর নামিয়া আসে। এই জন্য ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

আধুনিক গবেষণায় ইহা নিঃশেষে প্রমাণিত হইয়াছে যে, টাইফয়েড, কলেরা এবং অন্য কোন প্রকার জীবাণুই পাকস্থলীর সুস্থ পাচক রসের ভিতরে দীর্ঘ সময় থাকিতে পারে না। এই জন্য নিয়মিত শীতল স্নানে (cold bath) বহু রোগ হইতে মুক্ত থাকা যায়।

ইহা দ্বারা অন্ত্রের রস শোষণের ক্ষমতাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তাহার ফলে দেহ পুষ্টি লাভ করে।

হঠাৎ শীতল জলের স্পর্শে আসার জন্য সমস্ত দেহের ভিতরই

একটা উদ্দীপনা আসে। ইহাতে লিভার ও কিডনির কাজ ভাল হয়। সুতরাং লিভার প্রতিদিন দেহের যে-বিষ ধ্বংস করে এবং কিডনি রক্ত হইতে যে-বিষ অনুক্ষণ ছাকিয়া দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়, তাহাদের সে-কাজ অব্যাহত ভাবে চলে।

হার্টটি ভাল রাখিতে নিয়মিত স্নানের মত আর কিছুই নাই। শীতল জলে হার্টটি এত সবল হয় যে, এলকহল, ডিজিটেলিস, ষ্ট্রিকনিয়া প্রভৃতি পৃথিবীর যে-কোন ঔষধের পক্ষে ঐ-রূপ স্থায়ী নির্দোষ ফল উৎপন্ন করা অসম্ভব।

যাঁহারা বেশী মাথার কাজ করেন, দুই বেলা স্নান তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর। স্নানের পর মাথায় নূতন রক্ত প্রবাহিত হয় এবং মন যদি ঘোলাটে ও কুয়াসাচ্ছন্ন থাকে, স্নান করিয়া আসা মাত্র মনের মেঘ কাটিয়া যায়। এই জন্য নিয়মিত পদ্ধতি অনুযায়ী স্নানের দ্বারা বুদ্ধি বৃত্তিই (intellectual functions) প্রখরতা লাভ করে।

শীতল স্নানের দ্বারা রক্তের ক্ষারধর্মই (alkalinity) যথেষ্টরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং রক্তের ক্ষারত্ব যথেষ্ট পরিমাণ থাকিলে, সহজে কোন রোগ আক্রমণ করিতে পারে না।

স্নানের দ্বারা যে রোগ প্রতিহত হয়, তাহার অন্যতম প্রধান কারণ ইহাই যে, ঘর্ষণ সহ স্নানে দেহ হইতে অতিরিক্ত তাপ বাহির হইয়া যায়। আমাদের দেহে প্রতিনিয়তই তাপ উৎপন্ন হইতেছে। এই তাপ অত্যধিক হইয়া উঠিলেই, দেহের ভিতর রোগ-বিস্তারের অনুকূল অবস্থা সৃষ্ট হয়। প্রতিদিন দুই বেলা ঘর্ষণ সহ স্নানের দ্বারা দেহের এই অতিরিক্ত তাপ বাহির করিয়া দিতে পারিলে, কেবল ইহা দ্বারাই বহু রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

স্নান যে দেহকে পরিষ্কার এবং লোমকূপগুলি মুক্ত রাখে সেই দিকটাও তুচ্ছ করিবার নয়। কারণ পরিচ্ছন্নতাই স্বাস্থ্য লাভের অন্যতম প্রধান উপায়।

(২)

রোগে স্নান

কেহ কেহ সামান্য অসুখ হইলেই স্নান বন্ধ করে। ইহা কতকটা ডাকাত আসিলে হাতিয়ার পরিত্যাগ করার মত ব্যাপার।

স্নান যেমন রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে, রোগ হইতেও ইহা তেমনি মুক্তি দেয়।

আমেরিকার নিউইয়র্ক হাঁসপাতালে কতগুলি টাইফয়েড রোগীকে পর পর স্নান করাইয়া দেখা গিয়াছে, পূর্বে যেখানে শতকরা মৃত্যু সংখ্যা ৩০ হইতে ৪০ ছিল, জল-চিকিৎসায় তাহাদের সংখ্যা প্রায় শূন্যে দাঁড়াইয়াছে।

ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত জল-চিকিৎসক ডাঃ ব্রাণ্ড ১,২২৩টি টাইফয়েড রোগীর প্রথমাবধি জল-চিকিৎসা করেন। ইহাদের ভিতর ১২টি রোগীর মাত্র মৃত্যু হয় অর্থাৎ শতকরা এক জনেরও কম (J. H. Kellogg, M. D.—Rational Hydrotherapy, p. 586)।

কেবল টাইফয়েড বলিয়া নয়, সর্বপ্রকার জ্বরেই স্নান একান্ত অপরিহার্য। ডাঃ মার্টিনেট, এম, ডি, বলিয়াছেন, জ্বরঘ্ন যত ব্যবস্থা আছে, তাহার মধ্যে জল-চিকিৎসাই সর্বপ্রধান (Clinical Therapeutics, p. 875)।

বিভিন্ন হাঁসপাতালে নিউমোনিয়া রোগীদের প্রথমাবধি নিয়মানুযায়ী জল-চিকিৎসা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, মৃত্যুসংখ্যা প্রচলিত মৃত্যুহারের অর্ধেকেরও কমে নামিয়া যায়। বসন্ত প্রভৃতি রোগেও অনুরূপ ফল লাভ করা গিয়াছে।

আমাদের দেহে প্রতিনিয়ত যে তাপ উৎপন্ন হয়, তাহার ১০ ভাগের ৯ ভাগ তাপই চর্মের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া যায়। এই তাপ টানিয়া

নিতে জলের মত আর কিছুই নাই। অই জন্য সর্ব প্রকার জ্বর রোগীকেই স্নান করান কর্ত্তব্য।

যেমন কুইনাইন প্রভৃতি বিষাক্ত ঔষধ দ্বারা জ্বর কমান যায়, স্নানের দ্বারাও ঠিক সেই ভাবে জ্বর কমাইয়া আনা যাইতে পারে। ঔষধের যে উপকারিতা, ইহাতে তাহার সমস্তই থাকে, কিন্তু অপকারিতা মাত্রই থাকে না। প্রবল জ্বরের সময় বহু অবস্থায় এক বার স্নানেই জ্বর অর্ধ ডিগ্রি হইতে দুই ডিগ্রি পর্যন্ত নামাইয়া আনা যায়।

কিন্তু রোগীর দেহের উত্তাপ কখনও খুব বেশী কমাইতে নাই। দেহের সঞ্চিত দূষিত পদার্থ ও রোগ বিষ নষ্ট করিবার জন্য যখনি প্রকৃতি কোনরূপ চেষ্টা করে, তখনি তাহার ভিতর একটা উত্তাপ থাকে। লুইকুনে বলিয়াছেন, There is no disease without fever and no fever without disease—জ্বর ব্যতীত কোন রোগ নাই, রোগ ব্যতীত কোন জ্বরও নাই (The New Science of Healing, p. 82)। রোগের সময় শরীরে যদি যথেষ্ট তাপ না থাকে, রোগীর পক্ষে তাহা ভাল লক্ষণ নয়। য়ুরোপীয় চিকিৎসাবিধির প্রবর্তক হিপোক্রেটাস্ (Hippocrates) বলিয়াছেন, 'আমাকে একটু জ্বর দাও, আমি তাহা দ্বারা সমস্ত রোগ আরোগ্য করিব।'

রোগবিষ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত শরীরে যথেষ্ট তাপ থাকাই বরং ভাল। এই তাপ ব্যতীত প্রকৃতি কোন রোগই আরোগ্য করিতে পারে না। কিন্তু এই জ্বরের তাপ যখন অত্যন্ত প্রবল হয়, তখন ইহা যে কেবল রোগবিষই দগ্ধ করে তাহা নয়, ইহা আমাদের দেহের রক্ত ও রসকেও আহুতি গ্রহণ করে। এই জন্য জ্বরের সময় দেহে শীতল জল প্রয়োগ করিয়া দেহের উত্তাপ এমন ভাবে আয়ত্তে রাখিতে হয়, যেন জ্বরের উত্তাপ দেহের কোন অনিষ্ট করিতে না পারে।

প্রবল জ্বরের সময় রোগীকে বাষ্প-স্নান প্রভৃতি প্রয়োগ করা চলে না।

তখন পদ্ধতি অনুযায়ী রোগীকে স্নান করাইয়াই বাষ্প-স্নানের ফল লাভ করা যাইতে পারে। শীতল জলের স্পর্শে চর্ম প্রথম সঙ্কুচিত হইলেও তাহার প্রতিক্রিয়ায় লোমকূপগুলি এরূপ প্রসারিত হয় যে, ঐ-প্রসারিত দ্বার পথে দেহের যথেষ্ট বিষ বাহির হইয়া যায় এবং রোগীর জ্বর আপনা হইতে কমে।

স্নানের দ্বারা দেহের রক্তকণিকা বিশেষত শ্বেতকণিকাগুলি বহুলাংশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ঐ-সকল কণিকা রোগজীবাণু ধ্বংস করিয়া ফেলে। এই জন্য জ্বরের সময় ইহা দেহ হইতে অতিরিক্ত তাপ টানিয়া নিয়াই যে কেবল জ্বর কমায় তাহা নয়, ইহা জ্বরের মূল কারণকে ধ্বংস করিয়াই জ্বর কমায়।

স্নানের পর দেহের বিষধ্বংস ও বিষ মোক্ষণকারী যন্ত্রগুলির ক্ষমতাও এরূপ বাড়িয়া যায় যে, তাহারা রোগবিষ ও রোগজীবাণু দেহের ভিতর ধ্বংস করিয়া ফেলে অথবা দেহ হইতে ঝাঁটাইয়া বাহির করিয়া দেয়। টাইফয়েড রোগীদিগকে স্নান করাইয়া দেখা গিয়াছে, সাধারণত মূত্রে যে-পরিমাণ বিষ নির্গত হয়; স্নানের পর সেই বিষের মাত্রা পাঁচগুণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

এই জন্য জ্বর থাকিলেই যে রোগীকে স্নান করাইতে হয় তাহা নয়, যে-কোন রোগই হউক তাহাতেই রোগীকে স্নান করান কর্তব্য। এই জন্য রোগীর অবস্থানুসারে পূর্ণস্নান হইতে স্পঞ্জ বাথ প্রভৃতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

রোগের সময় স্নানের প্রধান গুণ ইহাই যে, ইহাতে রোগী এত আরামে থাকে যে, কোন্ দিক দিয়া যে রোগ কাটিয়া যায় সে কিছুই বুঝিতে পারে না। জ্বর প্রভৃতি রোগে সাধারণত বিভিন্ন উপসর্গ আসিয়া জুটে। কিন্তু রোগের প্রথম হইতেই যদি রোগীকে স্নান করান যায় তবে পেটফাঁপা, পেটের অসুখ, মাথাধরা, কর্ণপ্রদাহ, নিউমোনিয়া, হার্টের

প্রদাহ, মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ, রক্তবমন এবং পক্ষাঘাত প্রভৃতি উপসর্গ কখনও প্রকাশ পাইতে পারে না এবং ডাক্তারী বইতে প্রত্যেকটি রোগের যে সাধারণ লক্ষণের উল্লেখ থাকে তাহার বহু লক্ষণই প্রকাশ পায় না।

সাধারণত রোগ হইতে উঠিলে দেখা যায়, রোগীর শরীর আধখানা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রোগের প্রথমাবধি জল-চিকিৎসা চালাইলে শরীর বিশেষ খারাপ হয় না এবং রোগশেষে প্রায় বোঝাই যায় না যে, তাহার কোন একটি অসুখ হইয়াছিল।

রোগের সময় স্নান করাইলে বহু রোগলক্ষণও আশ্চর্য ভাবে অন্তর্হিত হয়।

স্নায়ুমণ্ডলীকে স্নিগ্ধ করিয়া রোগীর নিদ্রা উৎপাদন করিতে স্নানের মত আর কিছুই নাই।

রোগের ভিতর অনেক সময় ফুসফুস, লিভার, প্লিহা ও মস্তিষ্ক প্রভৃতি স্থানে রক্তাধিক্য হয়। ঐ-অবস্থা দূর করিবার জন্য এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারেরা এই শতাব্দীতেও জোঁক লাগাইয়া থাকেন। কিন্তু শীতল জলে স্নানের পর স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ায় চর্মে সমস্ত রক্ত ছড়াইয়া পড়ে এবং আভ্যন্তরীণ রক্তাধিক্য মন্ত্রের মত আরোগ্য হয়।

রোগের সময় যেমন স্নান আবশ্যক, রোগের পরও তেমনি স্নানের প্রয়োজন। প্রকৃতি যখন রোগবিষ ধ্বংস করিতে চায়, তখন দেহের ভিতর অতিরিক্ত একটা তাপ সে সৃষ্টি করে। ইহা তাহার ধ্বংস-মূর্তি। জ্বরের পর আবার সে গঠন মূলক কার্যে নিযুক্ত হয়। পরিমিত স্নানের দ্বারা দেহ তখন স্নিগ্ধ রাখিলে প্রকৃতি তাহার ভিতর দেহ-সংস্কারের অনুকূল অবস্থা পায়।

কিন্তু স্নান সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা অত্যন্ত বিসদৃশ। এমন কি আমাদের দেশের অনেক ডাক্তার পর্যন্ত শীতল জলের নামে শিহরিয়া উঠেন।

একবার কলিকাতায় আমি যে-ঘরে থাকিতাম, তাহার পার্শ্বের ঘরে হরিপদ ঘোষ নামে একটি ছেলের প্রবল জ্বর হয়। ভোর বেলা হইতেই ছেলেটি এমন চীৎকার করিতে থাকে যে, পার্শ্বের ঘরে আমার লেখাপড়া করাই অসম্ভব হইয়া উঠে। ছেলেটি একটি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার। সে ডাক্তারের লোক বলিয়া আমি প্রথমে তাহার কাছে যাই নাই। তাহার পর দেখি, এগারটা বাজিয়া যায়, তথাপি কেহ তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে না। তখন আমি তার কাছে যাই। গিয়া দেখি তাহার জ্বর ১০৪° র উপর—রোগ-যন্ত্রণায় সে ছটফট করিতেছে। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিছানা হইতে নামাইয়া হিপ-বাথে বসাইয়া দেই। আশ্চর্যের বিষয় এই, জলে বসিবার দশ মিনিটের মধ্যে তাহার অস্থিরতা কমিয়া যায়। মিনিট কুড়ি তাহাকে টাবে রাখি। তাহার পর নিয়ম অনুযায়ী তাহার সর্বদেহ ধোয়াইয়া, আট দশ মগ জল দিয়া ভাল করিয়া স্নান করাইয়া বিছানায় পাঠাইয়া দেই। বিছানায় নিয়াই তাহার সর্বদেহ কম্বল দ্বারা আবৃত করি এবং কতকটা গরম জল খাইতে দেই। ইহাতে তাহার বেশ একটু ঘাম হইয়া যায়।

কিন্তু ইতিমধ্যে ডাক্তারের কাছে গিয়া কে বলে যে, আমি তার কম্পাউণ্ডারকে মগের পর মগ জল ঢালিয়া স্নান করাইয়া দিয়াছি। ডাক্তার শুনিয়া পাগলের মত অগ্নিমূর্তি হইয়া ছুটিয়া আসে। তাহাকে কোন কথা বলিবার পূর্বেই সে আমাকে এমন ভাবে গালাগালি করিতে আরম্ভ করে যে, আমি বেকুব বনিয়া যাই। আমার অত্যন্ত রাগ হয়, কিন্তু আমি উত্তর করি না। বাড়ীর অন্য সকল লোকও বলিতে থাকে, ছেলেটার নিশ্চয় নিউমোনিয়া হইবে। পরের দিন ভোর বেলা ছেলেটা ঘুম হইতে উঠিলে সকলে দেখিতে আসিল, নিউমোনিয়া কতটা অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু দেখা গেল, তাহার আর জ্বরই নাই। ডাক্তার কয়দিন পর দুঃখিত হইয়া আমার সহিত ভাব করিতে আসিল। কিন্তু আমার এমন রাগ হইয়াছিল যে, তিন মাসের ভিতর তাহার সঙ্গে কথা বলি নাই।

[৩]

স্নান পদ্ধতি

সুস্থ ও অর্ধসুস্থ অবস্থায় অবগাহন স্নানই সর্বোত্তম। সরোবরে, নদীতে, হ্রদে, সমুদ্রে যেখানে সুবিধা সেখানেই স্নান করা যাইতে পারে। সহরের লোকেরা চৌবাচ্চা হইতে জল লইয়া স্নান করিতে পারেন! কিন্তু রোগীদিগকে বিশেষ পদ্ধতি অনুযায়ী স্নান করান কর্তব্য।

যদি রোগী উঠিয়া বসিতে পারে এবং যথেষ্ট সবল থাকে তবে গৃহের ভিতর তাহাকে পূর্ণ স্নান প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পূর্ণ স্নান (full bath)

স্নানের পূর্বে রোগীর মাথা, মুখ, ঘাড়, তলপেট ও উরুসন্ধি (কুঁচকি) প্রভৃতি স্থান শীতল জল দ্বারা ভাল করিয়া ধুইয়া লওয়া আবশ্যক। তাহার পর রোগীর মাথায় একটা ভিজা তোয়ালে জড়াইয়া তাহার দেহের উপর শীতল জল ঢালিয়া দিতে হয়। প্রথম বার এক পাত্র জল বুকের উপর ঢালিয়া পরের পাত্র পিঠের উপর ঢালা কর্তব্য। এই ভাবে বুকে ও পিঠে কয়েক পাত্র জল ঢালিয়া স্নান শেষ করা আবশ্যক। বুকে ও পিঠে এই ভাবে জল ঢালিলে ফুসফুস ও হার্ট যথেষ্টরূপ সবলতা লাভ করে।

অনেক সময় রোগী শীতল জলে প্রবল ভাবে আপত্তি করে। ঐ-অবস্থায় তাহাকে ক্রম-পরিমিত-স্নান (graduated bath) প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রথম উষ্ণজলে স্নান আরম্ভ করিয়া, কতক্ষণ পর পর ঐ-জলের সহিত ক্রমশ শীতল জল মিশাইয়া জল ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করিয়া আনিতে হয়। অথবা পুরাতন রোগীদিগের পক্ষে, প্রত্যহ অপেক্ষাকৃত অধিক শীতল জলে রোগীকে স্নান করান যাইতে পারে। যেমন ক্রমশ

অধিক শীতল জল ব্যবহার করিয়া পরে সম্পূর্ণ শীতল জল ব্যবহার করিতে হয়, তেমনি স্নানের সময়ও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করা আবশ্যক। রোগীদিগকে প্রথম খুব অল্প সময়ের জন্য স্নান করাইয়া ক্রমশ স্নানের সময় দীর্ঘ করাই কর্তব্য। জ্বর রোগে প্রথম প্রথম রোগীকে তিন চার মিনিটের জন্য স্নান করাইয়া তাহার পর দশ বারো মিনিটের জন্য স্নান করানো যাইতে পারে। এইরূপ স্নানে রোগী ক্রমশঃ শীতল জলে অভ্যস্ত হইয়া উঠে এবং কখনও রোগীর কোনরূপ অনিষ্ট হইতে পারে না।

রোগীকে শীতল জলে স্নান করাইবার সময় কিছুমাত্র বিশ্রাম না দিয়া সর্বদা খালি হাতে তাহার দেহ মর্দন করা আবশ্যক। তাহাতে রোগীর ঠাণ্ডা লাগিবার ভয় থাকে না এবং দেহ হইতে যথেষ্ট পরিমাণ তাপ নামিয়া যাইতে পারে। স্নানের পরও মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া রোগীর দেহ শুষ্ক তোয়ালে বা পরিষ্কার বিছানার চাদর দ্বারা মোছাইয়া দেওয়া কর্তব্য। তাহার পরও রোগীর সর্বদেহ বিশেষত বুক ও পিঠ হাত দিয়া ঘর্ষণ করিয়া গরম করিয়া দিয়া অল্প কতক্ষণের জন্য গলা পর্যন্ত কম্বল প্রভৃতি দ্বারা আবৃত রাখা আবশ্যক।

টবে স্নান

বাড়িতে বড় টব থাকিলে রোগীকে টবেও শীতল জলে (৬৮° হইতে ৮০° ডিগ্রি) পূর্ণ স্নান প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগীর মাথা, ঘাড় ও মুখ খুব শীতল জলে (৫০°) ধোয়াইয়া এবং মাথাটি ভিজা তোয়ালে দ্বারা আবৃত রাখিয়া রোগীকে যথাসম্ভব দ্রুত টবে আনিয়া শোয়াইতে হয়। যদি রোগীর ঘাড় বাহির হইয়া থাকে, তবে বুকে দোষ হওয়া সম্ভব। এই জন্য রোগীর গলা পর্যন্ত জলে ডুবাইয়া রাখা আবশ্যক। ঐ-সময় রোগীর দেহ সর্বদার জন্য ঘর্ষণ করা প্রয়োজন। মাঝে মাঝে রোগীকে টবে বসাইয়া মাথায় শীতল জলের ধারা দেওয়া কর্তব্য। ঐ-জল বুক ও

পিঠ গড়াইয়া নামিবে। সাধারণত ৫ সেকেণ্ড হইতে ২০ মিনিট পর্যন্ত রোগীকে এই ভাবে স্নান করান যাইতে পারে। রোগীর কম্পের মত ভাব হইবার পূর্বেই তাহাকে টব হইতে তুলিয়া লওয়া আবশ্যক। তাহার পর সর্বশরীর দ্রুত মুছিয়া ঘর্ষণ প্রভৃতির দ্বারা চর্মের তাপ ফিরাইয়া আনিয়া কতক্ষণের জন্য গলা পর্যন্ত কম্বল ঢাকা অবস্থায় রাখিয়া দেওয়া কর্তব্য।

যদি রোগীকে অপেক্ষাকৃত মৃদু-স্নান প্রয়োগ করা সঙ্গত মনে হয়, তবে তাহাকে তোয়ালে স্নান প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

তোয়ালে স্নান (Sponge bath or Towel bath)

রোগীকে এক খানা জলচৌকির উপর গরম জলে (১০৪° হইতে ১১০°) পা ডুবাইয়া বসাইয়া অথবা মেজের উপর একটি গরম জলের পাত্রের উপর দাঁড়া করাইয়া অথবা রোগীকে বিছানায় শোয়াইয়াই তাহার পায়ের দুই দিকে দুইটা গরম জলের বোতল অথবা পায়ের নীচে গরম জলের থলি (hot water bag) দিয়া প্রথমে তাহার মাথা, মুখ, ঘাড় ও কুঁচকি ও জননেন্দ্রিয়ের উপরিভাগ ভাল করিয়া ধুইয়া দিতে হয়। রোগী নিজেই কুঁচকি প্রভৃতি স্থান ভিজা তোয়ালে দ্বারা মুছিয়া ফেলিতে পারে। অবশেষে রোগীর বুক ও তলপেট, তাহার পর পিঠ, হাত ও পা একটু চাপ দিয়া দ্রুতহস্তে মুছিয়া দিতে হয়। তোয়ালের জল ফুরাইয়া গেলে পুনরায় তোয়ালে ভিজাইয়া নেওয়া যাইতে পারে। ইহার পর এক খানা শুষ্ক তোয়ালে দ্বারা রোগীর সর্বশরীর ভাল করিয়া মুছিয়া উষ্ণ পাদ-স্নান (foot bath) হইতে তাহাকে সরাইয়া নিতে হয়। অথবা তাহার পায়ের নীচ হইতে গরম জলের বোতল প্রভৃতি সরাইয়া দিতে হয়। তখন দুই ঘটি শীতল জল রোগীর পায়ের উপর ঢালিয়া দেওয়া উচিত অথবা শীতল জলে ভিজান গামছা দ্বারা রোগীর পা দুইটি

মোছাইয়া দেওয়া কর্তব্য। তাহার পর রোগীর সর্বদেহ, বিশেষত বুক ও পিঠ খালি হাতে ঘর্ষণ করিয়া গরম করিয়া দিয়া, কতক্ষণের জন্য গলা পর্যন্ত কম্বল ঢাকিয়া রাখিয়া দেওয়া উচিত।

[৪]

স্নানে সতর্কতা

কিন্তু যেমন তেমন এলোমেলো ভাবে স্নান করিলেই উপকার হয় না। স্নানের উদ্দীপক ফল তখনই মাত্র লাভ হয়, যখন জলের তাপটা দেহের তাপ হইতে কম থাকে এবং জলটা শীতল হয়। কেহ কেহ সর্দির ভয়ে গরম জলে স্নান করেন। ইঁহাদের সর্দি জীবনেও কখনঁ সারে না। সর্দি লাগিবার সম্ভাবনা হইতে মুক্ত থাকিবার সর্বপ্রধান উপায়ই শীতল জলে স্নান করিয়া চর্মকে শীতল জলে অভ্যস্ত করিয়া লওয়া (William D. Zoethout—A Text-book of Physiology, p. 360)। শীতল জল লোমকূপগুলিকে বন্ধ করিয়া ঠাণ্ডা হইতে দেহকে যে রক্ষা করে, তাহা নয়। নিয়মিত স্নানে রক্ত আসিয়া চর্মে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দেহের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় (vital resistance) এই জন্য সর্দি সারে।

রোগের প্রথম অবস্থায় কখন কখন উষ্ণ জলে স্নান করান আবশ্যক হয়। কিন্তু তখনও বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, জলের উত্তাপ যাহাতে ধীরে ধীরে কমাইয়া আনা যায় এবং যাহাতে রোগী সত্বর শীতল জলে অভ্যস্ত হইতে পারে।

সাধারণত শীতল জলে অল্প ক্ষণের জন্যই স্নান করা কর্তব্য। যতক্ষণ স্নানে আরাম বোধ হয় ততক্ষণ কেবল স্নান করা উচিত। কিন্তু অত্যধিক সময়ের জন্য স্নান করিলে উদ্দীপনার পরিবর্তে অবসাদ আসে।

আবার জ্বরের সময় অল্প স্নানে কোন কাজ হয় না। প্রবল জ্বরের সময় পুনঃ পুনঃ পূর্ণস্নান বা তোয়ালে স্নান প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া দেহের তাপ কমাইয়া আনিতে হয়।

যখন জ্বর খুব বেশী থাকে, দেহে অস্থিরতা ও জ্বালাপোড়া থাকে, তখনই স্নানে সর্বাপেক্ষা বেশী উপকার হয়। কিন্তু ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে যখন কাঁপাইয়া প্রবল শৈত্যবোধের সহিত জ্বর আসে অথবা যখন চর্ম শীতল, ওষ্ঠ নীলবর্ণ অথবা গাত্রে কম্প বর্তমান থাকে, তখন কোন অবস্থাতেই শীতল জলে স্নান করা উচিত নয়। জ্বর রোগে প্রাথমিক শীতল অবস্থা (cold stage) কাটিয়া গেলেই মাত্র স্নান করা যাইতে পারে।

স্নানের পূর্বে বিশেষ ভাবে লক্ষ করা আবশ্যক, শরীর গরম আছে কিনা। যদি গরম না থাকে তাহা হইলে স্বাস্থ্যের অবস্থা অনুসারে ব্যায়াম করিয়া, রৌদ্রে ঘুরিয়া বা মর্দন করিয়া পূর্বে শরীরটি গরম করিয়া লইয়া শরীর গরম থাকিতে থাকিতে স্নান করা কর্তব্য। স্নানের পরও আবার মর্দন প্রভৃতির দ্বারা দেহটি গরম করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

দুর্বল লোকদিগকে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত স্নান করান আবশ্যক। সবল লোকদিগের অপেক্ষা দুর্বল লোকদিগের দেহে তাপ উৎপাদক ক্ষমতা অনেক কম থাকে। এই জন্য দুর্বল রোগীদিগকে খুব বেশী শীতল জলে এবং বেশী সময়ের জন্য স্নান করাইতে নাই। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক, শীতল জলে যদি কাহারও প্রয়োজন থাকে, তাহা আছে সর্বাপেক্ষা দুর্বল রোগীর। কারণ শীতল জলের মত জীবনীশক্তির উদ্দীপক আর কিছুই নাই।

খুব ছোট শিশুগণও ঠাণ্ডা জল সহ্য করিতে পারে না এবং বেশী শীতল জলে তাহাদিগকে স্নান করাইলে সহজে আবার দেহ গরম হইতে চায় না। এই জন্য নাতিশীতোষ্ণ অথবা ঈষদুষ্ণ জলই (৭০° হইতে ৮০° F)

তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। অথাপি শিশুদিগকে প্রতিদিন স্নান করান আবশ্যক। ইহা শিশুদিগের দেহ-বৃদ্ধির পক্ষে যেমন আবশ্যক, তেমনি তাহাদিগকে রোগমুক্ত রাখিবার জন্যও একান্ত ভাবে প্রয়োজন। অনেক শিশুর প্রায় মূত্র বন্ধ হয়। নিয়মিত স্নানে ঐ-রূপ কখনো হইতে পারে না। শীতকালে শিশুদিগকে তৈল মাখাইয়া কতক্ষণ রৌদ্রে রাখিয়া তাহার পর যদি স্নান করান হয়, তবে তাহাদের কান্তি ও পুষ্টি আশ্চর্য ভাবে বর্ধিত হয়।

বয়ঃসন্ধির কিছু পূর্ব হইতেই মেয়েদিগকে দিনে দুই বার স্নানে অভ্যস্ত করা আবশ্যক। ঐ-রূপ করিলে তাহাদের স্রাব খুব ভাল হয় এবং স্ত্রী-ব্যাধি অনেকটাই আসিতে পারে না। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগকে মাসিকের সময় কখনও স্নান করান উচিত নয়। ঐ-তিন দিন তাহাদের সর্বপ্রকার স্নানই বর্জন করা উচিত। অথাপি ঐ-সময় যদি প্রবল জ্বর থাকে তবে ঈষদুষ্ণ জলে বা নাতিশীতোষ্ণ জলে গা মোছাইতে কখনও অন্যথা করিতে নাই। প্রবল জ্বরের সময় মৃদু জলচিকিৎসায় স্রাব বন্ধ হয় না। কিন্তু ঐরূপ জ্বরের সময় অপেক্ষা করিলে রোগীর দেহে বিজাতীয় পদার্থ এরূপ মাতিয়া (fermented হইয়া) উঠিতে পারে যে, তখন রোগকে আয়ত্তাধীনে আনাই কঠিন হইতে পারে (Lindlahr—Practice of Natural Therapeutics, P. 80)।

অত্যন্ত বৃদ্ধদের স্নান সম্বন্ধেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। খুব বেশী বৃদ্ধ ব্যক্তিদের অত্যন্ত শীতল জল সহ্য হয় না। এই জন্য যাঁহাদের দীর্ঘ দিনের অভ্যাস না আছে, তাহাদের নাতিশীতোষ্ণ জলেই (৭৫° হইতে ৮৫° F.) স্নান করা কর্তব্য।

সুস্থ দেহে প্রতিদিন নিয়মিত সময়েই স্নান করা আবশ্যক। প্রত্যেকেরি দিনে অন্তত দুইবার স্নান করা কর্তব্য। গ্রীষ্মকালে যতক্ষণ

দেহ চায় ততক্ষণই স্নান করা চলিতে পারে ; কিন্তু শীতকালে খুব অল্প সময়ের জন্য স্নান করা আবশ্যক।

আহারের পর দুই ঘণ্টার মধ্যে পূর্ণস্নান গ্রহণ করা কখনও কর্তব্য নয়। স্নানের পরও চর্মের তাপ ফিরিয়া আসিলেই কেবল অন্ন বা পথ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে।

দেহের উত্তপ্ত অবস্থায় স্নান করা খুব ভাল। কিন্তু শ্রান্ত (exhausted) অবস্থায় কখনও স্নান করিতে নাই। অত্যধিক পরিশ্রম করার পর যদি শ্রান্তি আসে তবে পরিপূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের পরই কেবল স্নান করা কর্তব্য।

স্নানের সময় যথেষ্টরূপে দেহ ঘর্ষণ করা আবশ্যক। তোয়ালে খানা খসখসে হইলে ভাল হয়। খসখসে তোয়ালে দ্বারা দেহ ঘর্ষণ করিলে দেহ পরিষ্কার হয় এবং লোমকূপগুলি মুক্ত হয়।

যখন এইরূপ পদ্ধতি অনুযায়ী স্নান করা যায়, তখনই মাত্র স্নানের পরিপূর্ণ ফল লাভ হইয়া থাকে।

সপ্তম অধ্যায়

রোগ আরোগ্য হয় কিরূপে

চিকিৎসকেরা গর্ব করিয়া থাকেন, তাঁহারা রোগ আরোগ্য করেন—ঔষধ দ্বারাই নাকি সকল রোগ আরোগ্য হয়। কিন্তু হাতে সামান্য একটি আঁচড় লাগিলেও পৃথিবীর কোন ডাক্তারের বা ঔষধের ক্ষমতা নাই তাহা জোড়া লাগাইতে পারে। প্রকৃতি ভিতর হইতে ভরিয়া তুলিলেই তবে তাহা জোড়া লাগে।

কৃষক ক্ষেত্রে শস্য উৎপন্ন করে, কিন্তু সত্যই কি সে উৎপন্ন করে? ক্ষেত্র হইতে সে আগাছা উপড়াইয়া ফেলে, ক্ষেত্রে সার দেয়, পোকা হইতে গাছ রক্ষা করে এবং তাহাতে প্রচুর আলো ও বাতাস লাগাইবার ব্যবস্থা করে। ইহাই মাত্র কৃষক করিতে পারে। তাহার এক চুল বেশীও না। প্রকৃতিই তাহার রহস্যময় প্রক্রিয়ায় তিল তিল করিয়া গাছ বড় করিয়া তোলে, গাছে ফুল ফুটায় এবং ফল ধরায়। কৃষক চেষ্টা করিয়া প্রকৃতিকে সাহায্য করিতে পারে মাত্র, কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও একটি কুঁড়ি সে ফুটাইতে পারে না। প্রকৃতি ফুটাইলে তবে ফুল ফোটে। তেমনি রোগ আরোগ্য ব্যাপারেও আমরা বিজাতীয় পদার্থ দেহ হইতে দূর করিয়া, দেহকে পুষ্টিকর খাদ্য যোগাইয়া এবং আলো ও বাতাসে দেহখানি রাখিয়া প্রকৃতিকে সাহায্য করিতে পারি মাত্র, কিন্তু প্রকৃতি নিজেই ভিতরে ভিতরে দেহখানির সংস্কার-কার্য সম্পন্ন করে। পৃথিবীর সব চেয়ে বড় যে ডাক্তার তিনিও নিজে দেহের কিছু মাত্র উন্নতি করিতে পারেন না।

প্রকৃতি সংস্কার করে বলিয়াই দেহের সংস্কার হয়।

ভগবান আমাদের দেহের ভিতরেই রোগ আরোগ্য ও দেহ রক্ষার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। রক্তই রোগ আরোগ্যের প্রধান যন্ত্র। রক্তই দেহকে দূষিত পদার্থ হইতে মুক্ত করে এবং ইহাই দেহের সকল অংশে পুষ্টি বহন করিয়া নেয়। যন্ত্রের সাহায্যে রক্তকে পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, রক্তের ভিতর তিন প্রকারের উপাদান আছে—লাল কণিকা (Red corpuscles), শ্বেতকণিকা (White corpuscles) ও রক্তরস (Plasma)। এই রক্তরসের ভিতর লাল ও শ্বেতকণিকাগুলি ভাসিয়া বেড়ায়। ইহাদের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে। আমাদের রক্তের ভিতর যত শ্বেতকণিকা আছে, তাহার চার পাঁচ শত গুণ প্রায় লাল কণিকা [illegible]। লাল কণিকাগুলি লাল বলিয়াই রক্তের বর্ণ লাল হয়। ইহারা ফুসফুস হইতে অক্সিজেন টানিয়া আনিয়া দেহের সর্বত্র বহন করিয়া নেয়। এই অক্সিজেনের দ্বারাই শরীরে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়।

দেহের শ্বেতকণিকাগুলিকে সাধারণত যোদ্ধৃ-কণিকা বলা হয়। যখন কোন ফোঁড়া বা ক্ষত হইতে বিষাক্ত পদার্থ অথবা রোগ-জীবাণু দেহের ভিতর প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, তখন সহস্র সহস্র শ্বেতকণিকা আসিয়া সুশিক্ষিত সৈন্যের মত ক্ষতের চারিদিকে ব্যূহ রচনা করিয়া দাঁড়ায়। দূষিত ক্ষত হইতে বিষ যাহাতে দেহে প্রবেশ করিতে না পারে, সেই জন্য তাহারা এই ভাবে বেড়া দেয়। এই জন্য ফোঁড়া হইলে তাহার চারিদিক শক্ত হইয়া উঠে। ঐ-স্থানে রোগজীবাণুগুলির সহিত শ্বেতকণিকাগুলির রীতিমত যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে যে-সকল শ্বেতকণিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহাদের দেহই প্রধানত পুঁজ গঠন করে। যে-পর্যন্ত দেহাক্রমণকারী শত্রু সমূলে বিনষ্ট না হয়, সেই পর্যন্ত ইহারা সমান ভাবে যুদ্ধ চালায়। আমাদের দেহ এমনি আশ্চর্য সক্রিয় যন্ত্র যে, যখনি আমাদের দেহের কোন স্থানে প্রদাহ বা ফোঁড়া হয় তখনি প্রকৃতি এই শ্বেতকণিকাগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

খাদ্য, পানীয় ও নিঃশ্বাসের সঙ্গে সর্বদা সহস্র সহস্র জীবাণু আমাদের দেহে প্রবেশ করিতেছে। যদি শ্বেতকণিকাগুলি না থাকিত, তাহা হইলে আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারিতাম না। শ্বেতকণিকাগুলি সর্বদাই আমাদের শত্রুর সঙ্গে যুঝিয়া আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। আবার দেহের জীবকোষগুলি অনুক্ষণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। এইগুলি দেহ মধ্যে সঞ্চিত হইয়া উঠিলে, তাহার ভিতর নানা রোগ-জীবাণু সৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু কোন কোষ নষ্ট হওয়া মাত্র শ্বেতকণিকাগুলি তাহা গ্রাস করিয়া হজম করিয়া ফেলে। এই জন্য দেহের শ্বেতকণিকাগুলি একাধারে আমাদের দেহের যেমন প্রহরী, তেমনি তাহারা মেথর।

দেহের রক্তরসেরও স্বাধীন ভাবে রোগজীবাণু ধ্বংস করিবার ক্ষমতা আছে। বিভিন্ন রোগে বিভিন্ন জাতীয় রোগবিষ (toxin) নষ্ট করিবার জন্য প্রকৃতি ইহার ভিতর বিভিন্ন প্রকারের প্রতিবিষ সৃষ্টি করে।

আমাদের লিভারটিকে food inspector—খাদ্য পরীক্ষক বলা হইয়া থাকে। দেহের প্রধান প্রবেশ পথে জিহ্বা যেমন প্রহরী, দেহের ভিতর লিভার তেমনি প্রহরীর কাজ করে। আমরা যাহা কিছু আহার করি, তাহারি সারাংশ প্রথম যায় লিভারে। লিভার তাহা হইতে দূষিত পদার্থ ছাকিয়া রাখিয়া বিশুদ্ধ খাদ্যরস রক্তের ভিতর ঢালিয়া দেয়। দেহের রক্ত-স্রোতকেও লিভার বিশেষ ভাবে পরিষ্কার করে এবং রক্তের বিষ নষ্ট করে। যকৃতের কারখানায় এই কাজ দিবারাত্রি অনুক্ষণ চলিতেছে।

আমাদের প্লিহা ও বিভিন্ন গ্রন্থিগুলিও দেহের যথেষ্ট বিষ ও জীবাণু ধ্বংস করে। এই জন্য বিভিন্ন রোগে লিভার, প্লিহা ও গ্রন্থিগুলি বড় হইয়া উঠে।

আমাদের অন্ত্র, মূত্রগ্রন্থি (Kidney) এবং ঘর্মগ্রন্থিগুলিও মল, মূত্র ও ঘর্মের আকারে দেহের যথেষ্ট বিষ বাহির করিয়া দেয়।

প্রকৃতি দেহকে সুস্থ ও নীরোগ রাখিবার জন্য এবং রোগমুক্ত করিবার নিমিত্ত দেহের ভিতরে এইরূপ আশ্চর্য ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে।

বনের যে-সকল পশুপক্ষী থাকে, সময় সময় তাহারা গুরুতর আঘাত পায়। কখন কখন বহু পশুর দুরারোগ্য ব্যাধি হয়। তাহাদের জন্য কোন ডাক্তার আসে না। অথচ আমাদের অপেক্ষা অনেক সহজে তাহারা আরোগ্য লাভ করে। ইহাদিগকে আরোগ্য করে কে? প্রকৃতিই ইহাদিগকে ভিতর হইতে আরোগ্য করিয়া তোলে।

আমেরিকার একজন খুব বড় ডাক্তার (Dr. Nicholas Senn) তাঁহার ব্যবসায়ের বহু ক্ষতি করিয়া ক্যান্সার রোগের কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য আফ্রিকা গিয়াছিলেন। তিনি আফ্রিকার বহু অর্ধসভ্য ও অসভ্য উলঙ্গ জাতির ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইলেন। অনেক দিন আফ্রিকার ভিতর ঘুরিয়া তিনি ইহাই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলেন, কোন্ জাতির ভিতর রোগের প্রভাব কিরূপ। তিনি দেখিলেন, যে-সকল জাতি তাহাদের জীবনযাত্রায় বনের পশুপক্ষীর যতটা কাছে, তাহাদের ভিতর ক্যান্সারের আক্রমণ ততটা কম। তিনি দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন, যে-সকল জাতি বনের পশুদের মতই অসভ্য, তাহাদের ভিতর স্থূলতা, মৃগীরোগ, স্নায়বিক দুর্বলতা প্রভৃতি সভ্যতার ব্যাধি মাত্রই নাই। তাহারা অন্য অনেক ব্যাধি হইতেও মুক্ত। যক্ষ্মারোগের কথা কদাচিৎ কেহ তাহাদের ভিতর জানে। যাহারা সমুদ্রের উপকূলে থাকিয়া সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহাদের ভিতরই কেবল যক্ষ্মারোগ দেখা যায় (Kilka—Naturl ways of cure, P. 10)।

বনের এই সব পশুপাখী এবং অর্ধসভ্য এই সব মানুষ সুস্থ হয় এবং থাকে কেমন করিয়া? আমাদের ভিতরই দেহ রক্ষা করিবার এবং রোগ আরোগ্য করিবার সকল ব্যবস্থা রহিয়াছে, এই জন্যই উহারা সুস্থ থাকে এবং সুস্থ হয়।

আমরা দেখি দাঁতের ভিতর যদি একটা কাঁটা ফোটে, তবে জিহ্বাটা অজ্ঞাতসারে সর্বদা সেখানে যায়। যে-পর্যন্ত কাঁটা বাহির না হয়, সে-পর্যন্ত তাহার শান্তি নাই। আমাদের দেহের যে-কোন অঙ্গই অসুস্থ হউক না, যে-পর্যন্ত তাহা পুনরায় সুস্থ না হয়, সে-পর্যন্ত প্রকৃতি শান্ত হয় না।

দেহকে দোষমুক্ত করিবার জন্য প্রকৃতি সর্বদাই এইরূপ সজাগ রহিয়াছে। তাহার বাধা দূর করিয়া এবং তাহার যন্ত্রগুলিকে সঞ্জীবিত করিয়া তাহাকে সাহায্য করাই রোগের প্রধান চিকিৎসা। হিপবাথ ও ষ্টিমবাথ প্রভৃতির দ্বারা দেহকে দোষমুক্ত করিয়া যখন স্নান প্রভৃতির দ্বারা দৈহিক যন্ত্রগুলিকে সবল করিয়া তোলা হয়, তখন সে আপ্রাণ শক্তি নিয়োগ করিয়া সুস্থ দেহকে আপনিই সবল করিয়া তুলে। প্রকৃতিকে এইভাবে সাহায্য করিয়া দেহকে সুস্থ রাখিবার এবং রোগমুক্ত করিবার এমন নির্দোষ উপায় আর নাই।

ঔষধ দ্বারা রোগ আরোগ্য করিবার চেষ্টা করা কিন্তু অধিকাংশ অবস্থায় ইহা উপকার অপেক্ষা অপকারই করে বেশী। দেহের রক্তস্রোত দূষিত হওয়ার জন্যই সর্বদা রোগের সৃষ্টি হয়। ঔষধ তাহার উপর নূতন বিষের মত যাইয়া পড়ে। প্রকৃতি দেহের বিষেই অস্থির থাকে। এখন রোগবিষ ও ঔষধের বিষ, দুইটা বিষের সঙ্গে তার লড়িতে হয়। এই দুই প্রকার বিষের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যদি সে জয়লাভ করিতে পারে, তবে সে বাঁচে। না পারিলে পুরাতন ও জীর্ণ একটা কুসংস্কারের বেদীমূলে সে তাহার জীবনকে বলি প্রদান করে।

ঔষধ যদি বিষাক্ত হয়, তবে তো অনিষ্ট করেই, যদি বিষাক্ত নাও হয়, তথাপি দেহের রুগ্ন অবস্থায় তাহা দেহের পক্ষে বিষ তুল্যই হয়। কিন্তু ঔষধের মোহ জনসাধারণকে হিপনটাইজড্ করিয়া রাখিয়াছে। যদি ডাক্তার রোগীর দেহে খুব মোটা স্থচ বসাইয়া দেন অথবা বিষাক্ত

ঔষধে সমস্ত মুখটা জ্বলিয়া উঠে, তবে রোগী বোঝে যে তাহার চিকিৎসা হইতেছে। এইজন্য ডাক্তারেরা জানিয়া বুঝিয়াও অনেক সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধেও রোগীদিগকে ঔষধ দিতে বাধ্য হন। ইংলণ্ডের একজন বড় ডাক্তার তাঁহার রোগীদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পাউরুটি দিয়া বড়ি প্রস্তুত করিয়া (bread pill) তাহাই একটু রঙাইয়া রোগীদিগকে দিতেন। কারণ রোগীরা ঔষধ না হইলে সন্তুষ্ট হইবেনা। এই সকল রোগীর নিকট বুদ্ধিমান হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারেরা সুগার-অফ-মিল্ক বেচিয়া প্রতি বৎসর বহু টাকা উপার্জন করিয়া থাকেন।

কিন্তু মানুষের সৃষ্ট বিষের উপর নির্ভর না করিয়া ভগবানের বিধানের উপর বিশ্বাস রাখাই উচিত; অন্ধের মত নয়—বুদ্ধিমানের মত ও যুক্তিপূর্বক। ভগবানের যে-নিয়মে আকাশের কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র পরিচালিত হইতেছে, সেই নিয়মেই আমাদের দৈহিক প্রকৃতিও চলিতেছে। আমরা যদি ভগবানের সৃষ্ট এই প্রকৃতিকে অনুসরণ করিয়া চলি, তবে আমাদের কোনরূপ অসুখই হইতে পারে না। অসুখ হইলেও প্রকৃতির বাধা দূর করিয়া এবং প্রকৃতিকে সাহায্য করিয়া সর্বরোগ হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারি।

অষ্টম অধ্যায়

দুর্ব্বল রোগীর চিকিৎসা

হিপবাথ, ষ্টিমবাথ ও পূর্ণস্নানে অধিকাংশ রোগ আরোগ্য হইতে পারে সত্য, কিন্তু এখন অনেক রোগী আছে, যাহারা এত দুর্ব্বল যে, তাহাদিগকে হিপবাথে বসান যায় না, ষ্টিমবাথ দেওয়া চলে না এবং স্নান করাইলেও দেহ সহজে উত্তপ্ত হইতে চায় না। এই সকল রোগীর জন্য অপেক্ষাকৃত, মৃদু পদ্ধতি আবশ্যক। যে-সকল রোগী হিপবাথ গ্রহণ করিতে পারে না, তাহারা ভিজা কোমরপটি (wet girdle) পরিয়া সহজে কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইতে পারে। খুব দুর্ব্বল রোগীকে ষ্টিমবাথ বিশেষত দীর্ঘ সময়ের জন্য ষ্টিমবাথ কখনও দেওয়া সঙ্গত নয়। কিন্তু ভিজা চাদরের প্যাকে ((wet-sheet pack) তাহাদের একই উপকার হয়। যাহাদের পক্ষে পূর্ণস্নান গ্রহণ করা অসম্ভব। তোয়ালে স্নান প্রভৃতি গ্রহণেও তাহাদের' সমানই ফললাভ হয়। এই সকল পদ্ধতি যদিও দুর্ব্বল লোকদিগের জন্য, তথাপি সবল রোগীদের পক্ষেও এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে কোন বাধা নাই। বরং ইহা দ্বারা সকলেই বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারে।

তবে ইহা বোঝা আবশ্যক, সবল ও দুর্ব্বল রোগী উভয়ের চিকিৎসার নীতি একই প্রকার। কোষ্ঠ পরিষ্কার, ঘর্ম উৎপাদন, জলপান এবং স্নানের দ্বারা যেমন সবল রোগীদিগকে চিকিৎসা করিতে হয়, দুর্ব্বল রোগীদের চিকিৎসারো তাহাই রীতি। কেবল প্রবল চিকিৎসা তাহাদের চলেনা বলিয়া, তাহাদের জন্য মৃদু পদ্ধতির ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

দুর্ব্বল রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধির উপায়

যে-সকল দুর্বল রোগী হিপবাথে বসিতে অক্ষম অথবা যাহাদের হিপবাথ লইবার সুবিধা নাই, হিপবাথের পরিবর্তে ভিজা কোমরপটি (the wet girdle) গ্রহণই তাহাদের সর্বোত্তম ব্যবস্থা। একদিন মাত্র কয়েকবার অথবা সমস্ত রাত্রির জন্য ব্যবহারে ইহা দ্বারা অত্যন্ত দ্রুত কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া যায়।

ভিজা কোমরপটি (The wet girdle)

সাধারণত আট নয় ইঞ্চি প্রশস্ত একখানা নেকড়া জলে ভিজাইয়া এবং জল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া না পড়ে এইভাবে নিংড়াইয়া নাভির চারিপাঁচ অঙ্গুলি ঊর্ধ্ব হইতে সমস্ত তলপেট ও কোমরের চাকিদিকে ঐ-

ভিজা কোমর-পটি (The wet girdle)
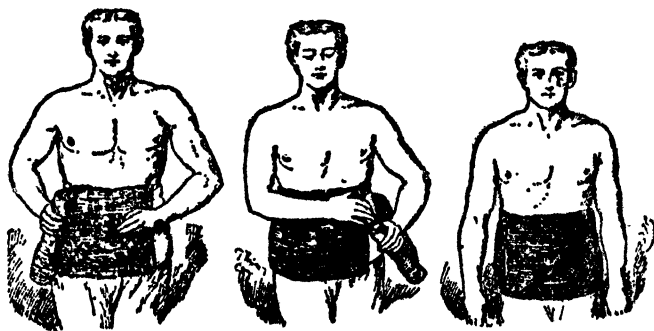
নেকড়াখানি জড়াইতে হয়। ঐ-নেকড়াখানি দুই হইতে চারবার ঘুরাইয়া আনিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। দেহে তাপ যত বেশী থাকিবে তত বেশী বার ঘুরান কর্তব্য। মিহি ও পুরাতন যে বস্ত্র, তাহাই সর্ব প্রকার পটি প্রভৃতির পক্ষে প্রশস্ত।

ঐ-নেকড়া জড়াইয়া এক খানা দীর্ঘ ফ্লানেল, অভাবে ছোট আলোয়ান ভাঁজ করিয়া উহা দ্বারা এমন ভাবে পটি আবৃত করিতে হয় যেন ভিজা নেকড়ার সঙ্গে বায়ুর সংস্পর্শ না হইতে পারে অথচ রক্ত চলাচল বন্ধ না হয়। তাহার পর ফ্লানেলটিকে নেকড়ার সঙ্গে ভাল করিয়া সেপ্টিপিন দ্বারা আটকাইয়া দিতে হয় অথবা পেট ও পিঠের চারিদিকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দিলেও চলে। ইহা অল্প কতক্ষণ মাত্র শীতল থাকে, তাহার পরই গরম হইয়া উঠে। যদি ভিজা নেকড়া গরম না হয়, তাহা হইলে নেকড়া অপেক্ষাকৃত কম বার ঘুরাইয়া আনা কর্ত্তব্য। অথবা তলপেটের চারিদিকে আরও বেশী ফ্লানেল বা আলোয়ান প্রভৃতি জড়াইতে হয়। মোট কথা পটির নীচে একটা উত্তাপ সৃষ্টি করা চাই। তাহা হইলেই কেবল উপকার হইবে। কিন্তু আবার এত বেশী ফ্লানেলও জড়ান উচিত নয় যে, রোগীর সমস্ত শরীর গরম হইয়া উঠে। উহা রোগীর পক্ষে প্রীতিপ্রদ হইবে অর্থাৎ অত্যন্ত গরমও হইবে না ঠাণ্ডাও হইবে না, এইরূপ করিয়া পটি প্রয়োগ করিতে পারিলেই কেবল উপকার হয়। এই পটি প্রয়োগে এই কথাটি বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে খালিপেটে অথবা প্রধান আহারের অন্তত দুই ঘণ্টা পর ইহা দিনে অন্তত দুই বার দুই ঘণ্টা করিয়া নিতে হয়। একবার প্রাতে ও একবার অপরাহ্ণে ইহা লওয়া যাইতে পারে। রাত্রির পথ্য সকাল সকাল শেষ করিয়া ঘুমাইবার পূর্ব্বে ইহা আর একবার নেওয়া আবশ্যক। ঐ-পটি সারা রাত্রির ভিতর আর খুলিতে নাই। ভোর বেলা উঠিয়া উহা খুলিয়া ফেলিতে হয়। প্রত্যেক বার পটি খুলিয়াই সমস্ত তলপেট ও মেরুদণ্ডের যে-অংশ আবৃত থাকে, তাহা ভালরূপ নিংড়ানো একখানা সিক্ত তোয়ালে দ্বারা মুছিয়া ফেলিয়া, পুনরায় একটু ঘর্ষণ করিয়া তাহার উপর জামা কাপড় পরিয়া ঐ-স্থান গরম করিয়া লওয়া আবশ্যক।

এই পটির স্থবিধা এই, ইহা লইয়া দৈনিক কাজ কর্ম করিবার কোন অস্থবিধা হয় না এবং রাত্রিতে ঘুমের ব্যাঘাত হয় না।

ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের ভিতর মল বিষাক্ত হইয়া গেলে, মলের গতি রুদ্ধ হইলে অথবা সাধারণ কোষ্ঠবদ্ধতায় ইহা মন্ত্রশক্তির মত কার্য করে। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই এই পটির প্রচলন আছে। বিগত এক শত বৎসর যাবৎ জার্মেনীর ঘরে ঘরে এই পটি ব্যবহৃত হইতেছে। ঐ-দেশে এই পটিকে বলে—Neptune's girdle।

স্ত্রীরোগে ভিজা কোমর-পটি।

কিন্তু ইহার উপযোগিতা কেবল এই ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ নয়। উপর ও তলপেটের বিভিন্ন যন্ত্রের রোগে এই পটি প্রয়োজনানুসারে উপরে উঠাইয়া এবং নীচে নাবাইয়া অত্যন্ত সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পাকস্থলীও লিভারের অস্থখে ইহা ঐ-দুইটি স্থান ঢাকিয়া কতকটা উর্ধ্ব দিকে তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। স্ত্রীলোকদিগের জরায়ু প্রভৃতির রোগে ইহা নাভির নীচে সমস্ত তলপেটের উপর প্রয়োগ করা কর্তব্য।

পাকস্থলী বড় হইলে এবং ঝুলিয়া পড়িলে (dilatation and

prolapse) অথবা খাইবার পর পেট ভার বোধ হইলে এই পটিতে বিশেষ উপকার হয়।

পুরাতন অজীর্ণে (chronic dyspepsia) ইহা অত্যন্ত ফলপ্রদ। যে কোনরূপ অজীর্ণই হইক না, তাহা আরোগ্যের ইহা অপেক্ষা ভাল উপায় আর নাই। কিন্তু ইহাতে ভিজা নেকড়া খুব ভালভাবে নিংড়াইয়া শুষ্কপ্রায় করিয়া প্রয়োগ করা আবশ্যক। উদরাময়ে (diarrhea) ইহা এক অথবা দুই ঘণ্টা অন্তর অন্তর পরিবর্তন করিয়া প্রয়োগ করিলে অত্যন্ত উপকার হয়। অজীর্ণ ও কোষ্ঠবদ্ধতা দুইটি পরস্পর বিরোধী রোগ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অজীর্ণ কোষ্ঠবদ্ধতারি সন্তান। কোষ্ঠবদ্ধতার মূল কারণ দূর হইলে অজীর্ণ আপনা হইতে যায়। ভিজা কোমর পটি পেটের সঞ্চিত দূষিত পদার্থ ও অতিরিক্ত উত্তাপ লোমকূপের প্রসারিত দ্বার পথে বাহির করিয়া দেয় এবং উহা তলপেটে রক্তকে টানিয়া তলপেটের বিভিন্ন যন্ত্রকে সবল করে। এই জন্য ইহা দ্বারা কোষ্ঠবদ্ধতা ও অজীর্ণ দুই-ই আরোগ্য হয়।

পাকস্থলী ও লিভারের উপর ইহা বাঁধিলে ঐ-দুইটি যন্ত্র বিশুদ্ধ হয় এবং উহাদের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

যাহাদের পাকস্থলী বা অন্ত্র ফাঁপিয়া উঠে এবং যাহাদের অন্ত্রের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া গিয়াছে এই পটিতে তাহাদের বিশেষ উপকার হয়। ঐ-অবস্থায় নেকড়া খুব শীতল জলে ডুবাইয়া ও খুব নিংড়াইয়া প্রয়োগ করা আবশ্যক এবং উহা অত্যধিক ফ্লানেল দ্বারা আবৃত করা উচিত নয়। পটি দুই তিন ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যবহার করিয়া প্রত্যেক ঘণ্টায় পরিবর্তন করিয়া দেওরা কর্তব্য। ঢাকা ইসলামিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ আব্দুল হাকিম, এম, এ, বহুকাল যাবৎ পেটের বিভিন্ন রোগে ভুগিতে ছিলেন। অবশেষে তাঁহার এমন অবস্থা হইল যে, কিছুই তিনি হজম করিতে পারিতেন না। সর্বদাই তাঁহার

পেট কাঁপিয়া থাকিত। ঐ-অবস্থা হইতে তাঁহার হৃৎকম্প, শ্বাসকষ্ট এবং মস্তিষ্কের বেদনা প্রভৃতি উৎপন্ন হইল। তিনি তখন জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া পড়িলেন। ঐ-অবস্থায় আমি তাঁহাকে একটি ভিজা চাদরের প্যাক (wet-sheet pack) দিয়া তাহার পর ভিজা কোমর পটির ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। এই পটি ব্যবহার করিবার সাত দিনের ভিতরই তাঁহার পেটের অবস্থা প্রায় স্বাভাবিক হইয়া গেল এবং তিনি সাধারণ সকল পথ্যই গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। ইহার পর জল-চিকিৎসার দ্বারা অন্যান্য রোগেও তিনি যথেষ্ট উপকার লাভ করিয়াছেন।

এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় আন্ত্রিক ক্ষত (duodenal ulcer) সাধারণত আরোগ্য হয় না। এই রোগে পনের বিশ বৎসর পর্যন্তও লোক ভোগে! কিন্তু জল-চিকিৎসা এবং প্রধানত এই পটির দ্বারা ইহা সহজে আরোগ্য লাভ করে। খিদিরপুরের শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় দীর্ঘদিন যাবৎ আন্ত্রিক ক্ষত এবং পেটের বিভিন্ন রোগে ভুগিতেছিলেন। এই জন্য তিনি বহু চিকিৎসা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে প্রায় কোন ফল হয় নাই। তিনি জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া গিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে কয়েকটা দিন ভিজা চাদরের প্যাক প্রভৃতির দ্বারা সর্বদৈহিক চিকিৎসা করিয়া তাহার পর প্রতি রাত্রে ভিজা কোমর পটি ব্যবহার করিতে দেই এবং বিশেষ পথ্যের ব্যবস্থা করি। এই চিকিৎসা তিন মাস চালাইবার পরই তাঁহার অন্ত্রের অবস্থা স্বাভাবিক হয়। দুর্গামোহন বাবুর আরও ভয়ানক ভয়ানক কতগুলি রোগ ছিল। তাঁহার হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দুর্বল ছিল, সর্বদাই সর্দি লাগিত, মাঝে মাঝে গলা দিয়া রক্ত পড়িত, বুকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, তিনি থাইথিস হইয়াছে বলিয়া ভয় করিতেন। অম্লরোগে তিনি অত্যন্ত কষ্ট পাইতেন এবং তাঁহার আরও অনেক ব্যাধি ছিল, তিন মাস পর বিভিন্ন জল-চিকিৎসায় তাঁহার হার্ট সবল হইয়া গেল, বুকের দোষ নষ্ট হইল এবং মোটের উপর সমস্ত দেহ সাধারণ সুস্থ লোকের মত হইল।

যে অন্ত্রপ্রদাহ পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া আসে (recurring appendicitis) তাহাতেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ঐ-অবস্থায় ইহা তলপেটের নিম্নাংশে প্রয়োগ করিতে হয়।

গর্ভাবস্থায় এই পটি ব্যবহারে গর্ভিণী গর্ভসঞ্চারের আনুসঙ্গিক বহু রোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন। স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাশয়ের যে-কোন রোগে ইহা অত্যন্ত ফলপ্রদ।

সর্বপ্রকার পুরাতন মেরুদণ্ড বেদনায় ইহা বিশেষ ভাবে উপকার করে। তলপেটের অভ্যন্তরে কোথাও ঘা, টিউমার অথবা ক্যান্সার হইলে অথবা স্নায়বিক দুর্বলতায় অথবা কঠিন অগ্নিমান্দ্যে ইহাতে উপকার হয়।

এই পটি কোষ্ঠ পরিষ্কারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইলেও রোগীর জ্বর থাকিলে ঐ-জন্য কখনও পটি প্রয়োগ করিতে নাই। রোগীর জ্বর থাকিলে কোমর পটির পরিবর্তে সবল রোগীকে কটিস্নান এবং সবল ও দুর্বল উভয় রোগীকেই তলপেটের কাদামাটির উষ্ণকর পটি প্রয়োগ করা কর্তব্য।

[২]

দুর্বল রোগীর উত্তাপ চিকিৎসা

ভিজা চাদরের প্যাক (Wet-sheet pack)

ভিজা চাদরের প্যাককে বাষ্প-স্নানের অনুকল্প বলা চলিতে পারে। তিন চার খানা পুরু লোমের কম্বল খাটের উপর পাতিয়া ভিজা চাদরের প্যাক লইতে হয়। তিন চার খানা কম্বল ঘরে না থাকিলে দুই খানা লেপের উপর এক খানা লোমের কম্বল পাতিয়া লইলেও কাজ চলিতে পারে। কম্বল বিছাইয়া তাহার উপর শীতল জলে ভিজান

একখানা বিছানার চাদর টান করিয়া পাতিতে হয়। চাদর খানা খুব বেশী করিয়া নিংড়াইতে নাই। রোগী ঐ-চাদরের উপর শুইলে যেখানে তাহার পিঠ থাকিবে, তাহার ঠিক নীচে রোগীর বগল হইতে তলপেটের শেষ সীমা পর্যন্ত ঢাকা যায়, এমন আর একখানা ভিজা কাপড়ের টুকরা চাদরের উপর পাতিয়া দিতে হয়। চাদরের উপর শুইবার পূর্বে খুব ভাল করিয়া মাথা, মুখ ও ঘাড় ধুইয়া লওয়া কর্তব্য। তাহার পর যতটা অনায়াসে সহ্য হয় ততটা গরম এক গ্লাস জল কয়েক ফোঁটা নেবুর রস সহ পান করিয়া চাদরের উপর আসিয়া শুইতে হয়।
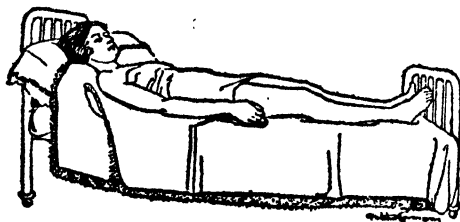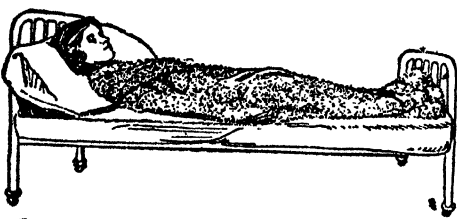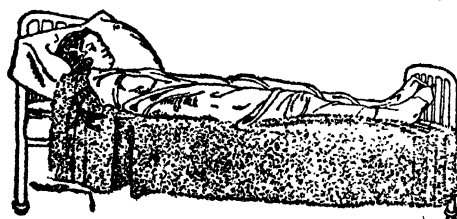
ভিজা চাদরের প্যাক (Wet-sheet peck)

রোগীকে চাদরের উপর শোয়াইয়াই প্রথম চাদরের উপর পাতা বস্ত্রখণ্ড দ্বারা রোগীর বগল হইতে তলপেটের শেষসীমা পর্যন্ত ভাল করিয়া আবৃত করা কর্তব্য। তাহার পর রোগীর হাত দুইখানা লম্বমান ভাবে দেহের পার্শ্বে রাখিয়া বড় চাদর খানা দ্বারা পুনরায় রোগীর গলা পর্যন্ত সমস্ত দেহ এমন ভাবে ঢাকিয়া দিতে হয় যেন শরীরের প্রত্যেক অংশ

শীতল চাদরের সহিত সংস্পর্শে আসে। এইরূপ করিলে রোগীর কখনও ঠাণ্ডা লাগিতে পারে না। এই জন্য চাদর খানা দ্বারা ঢাকা দিবার সময় চাদর খানি দুই পায়ের ভিতর ও হাতের ফাঁকে ফাঁকে ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিতে হয়। চাদর ঢাকা দিবার সময় রোগীর পরিধেয় বসন কৌশলে সরাইয়া লওয়া কর্তব্য। রোগীর যদি স্নায়বিক দুর্বলতা থাকে কি রোগী যদি অত্যন্ত দুর্বল হয়, তবে তাহার একখানা বা দুই খানা হাত চাদরের বাহিতে (কিন্তু কম্বলের মধ্যে) রাখা যাইতে পারে। চাদর মুড়ি দিয়াই একখানা কম্বল দ্বারা রোগীকে এমন ভাবে ঢাকা দিতে হইবে যেন চাদরখানি সকল দিক হইতে ভাল ভাবে আবৃত হয়। রোগীকে একখানা কম্বল দ্বারা জড়াইয়াই তাহার পায়ের নীচে একটা গরম জলের থলি (hot water bag) অথবা দুইটা গরম জলের বোতল অথবা দুই-ই রাখিয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহার পর অপর দুই খানা কম্বল বা লেপ দ্বারা পর পর রোগীকে গলা পর্যন্ত সমস্ত দেহ আবৃত করিতে হয়। রোগীকে প্যাকের ভিতর রাখিবার পরই শীতল জলে ভিজান এক খানা গামছা দ্বারা তাহার মাথা ঢাকিয়া দেওয়া কর্তব্য। যতক্ষণ রোগী মোড়কের ভিতর থাকে, ততক্ষণ ঐ-গামছা মাথায় রাখিয়া গরম হইয়া উঠিলেই মাঝে মাঝে পরিবর্তন করিয়া দিতে হয়।

এই মোড়ক সাধারণত ৪৫ মিনিট হইতে এক ঘণ্টা পর্যন্ত লইতে হয়। শীতকালে এক ঘণ্টার জন্য না লইলে কাজ হয় না। ভিজা চাদরের প্যাকে ষ্টিমবাথের মত দর দর করিয়া ঘর্ম বাহির হয় না। মোড়কের ভিতর ইহাতে যে-ঘর্ম বাহির হয়, তাহা প্রায়ই অদৃশ্য ঘর্ম (insensible perspiration)। ঘর্ম বৃদ্ধি করিতে হইলে প্রত্যেক দশ মিনিট অন্তর অন্তর রোগীকে অর্ধ গ্লাস করিয়া গরম জল পান করিতে দেওয়া উচিত। যদি ভিতরের চাদর খানি পাতলা দেওয়া হয় এবং বাহিরের কম্বলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে সহজেই প্রচুর ঘর্ম নির্গত হইতে পারে।

প্যাক শেষ হইলে রোগীর কম্বল প্রভৃতি সরাইয়া নিয়া দুর্বল রোগীর পক্ষে ঈষদুষ্ণ জল এবং সবল লোকের পক্ষে সাধারণ জলে তোয়ালে ডুবাইয়া এবং পরে নিংড়াইয়া লইয়া তাহা দ্বারা সর্বদেহ খুব ভাল করিয়া ডলিয়া ডলিয়া মাজিয়া দিতে হয়। তাহার পর এক খানা ভিজা তোয়ালে পর পর রোগীর দেহের বিভিন্ন অংশের উপর পাতিয়া দেহের তাপ স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত উহার উপর ঘর্ষণ করিয়া দেহ হইতে তাপ তুলিয়া নিতে হয়। ইহাতে ঘর্মের সহিত নির্গত সমস্ত বিষ বিদুরিত হয় এবং সমস্ত দেহে জীবনীশক্তির উদ্দীপনা হয়। গা মুছাইয়া দিবার পরই রোগীকে আবশ্যকীয় ১৫ হইতে ৩০ মিনিট পর্যন্ত হিপবাথ দেওয়া কর্তব্য। ষ্টিমবাথ প্রভৃতি সর্বপ্রকার উষ্ণ-স্নানের পরই হিপবাথ প্রয়োগ করা আবশ্যক। তাহার পর রোগী দেহের অবস্থা অনুসারে পূর্ণস্নান (full bath) বা স্পঞ্জবাথ গ্রহণ করিবেন। গায় ঠাণ্ডা হাওয়া না লাগাইয়া ঘরের ভিতর স্নান করাই কর্তব্য। যে-সকল রোগী এত দুর্বল যে, হিপবাথ লইতে অক্ষম, তাহারা অর্ধ ঘণ্টা পর্যন্ত অথবা যতক্ষণ আরাম বোধ হয় ততক্ষণ তলপেটে ভিজা গামছা রাখিয়া বার বার বদলাইয়া দিবেন। ষ্টিমবাথ লওয়ার পর যে-সকল নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়, ভিজা চাদরের প্যাকেও তাহারই অনুসরণ করিতে হয়। কারণ ভিজা চাদরের প্যাক ষ্টিমবাথেরই প্রকার ভেদ মাত্র। এই জন্য প্যাক নিবার পূর্বে তলপেট বিশেষ ভাবে পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক এবং প্যাক লওয়ার পর কয় দিন পর্যন্ত প্রতি বার কয়েক ফোঁটা নেবুর রস সহ প্রচুর জল পান করা কর্তব্য।

ভিজা চাদরের প্যাকের উপকারিতা

যদিও শীতল জলে ভিজাইয়া এই প্যাক দেওয়া হয়, তথাপি ইহা শীতল নয়। ভিজা চাদর দুই তিন মিনিটের জন্য হয়তো শীতল থাকে, কিন্তু তাহার পরই দেহের তাপে তাহা উত্তপ্ত হইয়া উঠে। তখন রক্ত চর্মের

শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ছুটিয়া আসে। ইহাতে রোগীর দেহের সমস্ত লোমকূপ খুলিয়া যায় এবং সেই প্রসারিত সহস্র সহস্র দ্বারপথে দেহের দূষিত পদার্থ গুমট গরমে গলিয়া দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়।

ষ্টিমবাথে যে-কাজ হয়, এই প্যাকেও অবিকল তাহাই হয়। কিন্তু এই প্যাক ষ্টিমবাথ হইতেও শ্রেষ্ঠ। শরীরটি অত্যন্ত উত্তপ্ত না করিয়া শীতল অবস্থার ভিতর দিয়া শরীর হইতে ঘর্ম বাহির করিবার যে পদ্ধতি জলচিকিৎসা-জগতে তাহার তুলনা নাই। দুর্বল ও সবল সকলের জন্যই ইহা সমভাবে প্রযোজ্য।

যখন কোন রোগ আসিতেছে আসিতেছে মনে হয়, শরীরের এইরূপ অবস্থায় তলপেটটি পরিষ্কার করিয়া লইয়া একবার মাত্র ভিজা চাদরের প্যাক লইলে সেই রোগের পক্ষে দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করা একরূপ অসম্ভব হয়। ইহা দ্বারা যে রোগ চাপা দেওয়া হয় তাহা নয়, এই প্যাকের দ্বারা দেহসঞ্চিত বিজাতীয় পদার্থ এবং তাহার ভিতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বিভিন্ন জীবাণু ও জীবাণু-বিষ চর্মের পথে এবং পরে মলমূত্রের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। এই জন্য উহাদের আক্রমণ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত প্রকৃতিকে আর রোগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। রোগ হইলেও ইহা দ্বারা অতি অল্প সময়ে রোগমুক্ত হওয়া যায়।

দেহে বিষাক্ত পদার্থের সঞ্চয়ের জন্যই অধিকাংশ জ্বর প্রভৃতি রোগে রোগীর মৃত্যু হয়। দেহসঞ্চিত বিষ দেহের মর্মস্থানকে (vital centres) ও অন্যান্য দৈহিক যন্ত্রগুলিকে অসাড় ও ধ্বংস করিয়া ফেলে। তাহার জন্যই রোগীর মৃত্যু ঘটে। সুতরাং রোগ হওয়া মাত্রই কালবিলম্ব না করিয়া ভিজা চাদরের প্যাক দ্বারা দেহকে বিজাতীয় ও বিষাক্ত পদার্থ হইতে মুক্ত করিলে রোগীর মৃত্যু হওয়া কঠিন হয়।

সাধারণত জ্বর প্রভৃতি রোগে বাহিরের চর্ম অত্যন্ত সঙ্কুচিত ও শক্ত থাকে। এই জন্যই দেহের ভিতর হইতে উত্তাপ বাহির হইতে পারেনা

এবং দেহের অভ্যন্তর ভাগ অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকে। ভিজা চাদরের প্যাকের সিক্ত উত্তাপ লোমকূপগুলি খুলিয়া দেয় এবং ঐ-মুক্ত পথে যথেষ্ট উত্তাপ বাহির হইয়া যায় বলিয়া জ্বর আপনি কমে।

ডাক্তারেরা ঔষধের দ্বারা জ্বর কমায়। কিন্তু অনেক সময় ঔষধে এই জন্যই জ্বর কমে যে, তাহা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া, শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া, শ্বেত ও লোহিত কণিকা এবং দৈহিক সমস্ত যন্ত্রগুলি অল্পাধিক অসাড় করিয়া ফেলে। অর্থাৎ প্রকৃতি দেহের বিষ ধ্বংস করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতে উদ্যত হয়, প্রকৃতির সেই শুভ চেষ্টাকে দাবাইয়া দিবার জন্যই জ্বর কমে। কিন্তু ভিজা চাদরের প্যাক অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে লোমকূপ খুলিয়া দিয়া এবং দেহের বিষাক্ত জিনিস বাহির করিয়া দিয়া মন্ত্রের মত জ্বর আরোগ্য করে।

এক বার আমি দেশ হইতে যখন কলিকাতা আসি, তখন আমার ভাগিনেয়র প্রবল জ্বর হয়। পরের দিন আমার কলিকাতা রওনা হওয়ার কথা। কিন্তু আমার ভগ্নী এ-অবস্থায় আমাকে কিছুতেই রওনা হইতে দিবেন না। আমি তখন তাহাকে বলিলাম, 'তোমার ছেলেকে আরোগ্য করেই আমি যাব।' আমি তখন শ্রীমানকে তাড়াতাড়ি মধু-সহ একটা পিচকারি দিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া দিয়া তাহার এক ঘণ্টা পর একটা ভিজা চাদরের প্যাক দিলাম। তাহার পর দেহ কয়েকবার শীতল জলে মোছাইয়া দেওয়া হইল। ইহার ফলে সেই দিনই রাত্রিতে জ্বর কমিতে লাগিল এবং পরের দিন দেখা গেল জ্বর নাই। আমি তখন কলিকাতা চলিয়া আসিলাম। ভিজা চাদরের প্যাক দ্বারা এই ভাবে দুই তিন দিনে বিভিন্ন জাতীয় বহু জ্বর আমি আরোগ্য করিয়াছি।

এই প্যাকের দ্বারা এত বিষ দেহ হইতে নাবিয়া যায় যে, প্যাক খুলিবার সময় তাহার ভিতর হইতে একটা উৎকট গন্ধ বাহির হয়। যাহারা তামাক খায় তাহাদিগকে দীর্ঘ সময় মোড়কে রাখিলে চাদরের ভিতর

হইতে দস্তুরমত তামাকের গন্ধ বাহির হয়। যাহাদের দেহে যথেষ্ট দূষিত পদার্থ থাকে অনেক সময় তাহাদের দেহনির্গত বিষে চাদর কতকটা হরিদ্রা বর্ণ হইয়া যায়। এই জন্য ইহা দ্বারা বহু রোগ আরোগ্য লাভ করে।

পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করিবার ইহা অতি চমৎকার উপায়। কটিস্নান প্রভৃতির সহিত মাঝে মাঝে ভিজা চাদরের প্যাক গ্রহণ করিলে এবং আহার নিয়ন্ত্রণ করিলে অত্যন্ত দুরারোগ্য কোষ্ঠবদ্ধতাও দূর হয়।

বুকের যাবতীয় অসুখেই ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। বিশেষত কাশি সংযুক্ত পুরাতন ব্রঙ্কাইটিসে এবং পুরাতন প্লুরিসি রোগে ইহাতে অত্যন্ত উপকার হয়। কলিকাতার অন্যতম সহকারী ইনকাম ট্যাক্স অফিসার মিঃ সামসুদ্দীন আহাম্মদ দীর্ঘ দিন যাবৎ পুরাতন ব্রঙ্কাইটিসে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার সামান্য কারণেই সর্দি লাগিত এবং সারা বৎসরই প্রায় সর্দি থাকিত। এই প্যাক একটি দেওয়ার পর দেখিলাম, তাঁহার বুক স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে এবং বুকের কোথাও ব্রঙ্কাইটিসের শব্দ নাই। ইহা ব্যতীত তাঁহার চিরস্থায়ী কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লরোগ, হার্টের দুর্বলতা প্রভৃতি বিভিন্ন রোগ ছিল। কিছু দিন জলচিকিৎসা চালাইবার পর এই সকল অবস্থা হইতে তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

হাঁপানি রোগীকে সুস্থ ও রোগমুক্ত করিতে ইহার মত খুব অল্পই আছে। কেশব সেন ষ্ট্রীটের শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ মিত্র মহাশয়ের চেহারা দেখিলে কেহ মনে করিতে পারিত না যে তিনি বাঁচিয়া উঠিবেন। হাঁপানি তাঁহার প্রতি দিনের সহচর ছিল এবং সমস্ত দেহে হাড় কয়খানা মাত্র অবশিষ্ট ছিল। তাঁহাকে এক দিন ভিজা চাদরের প্যাক দিবার পরই তাঁহার টান কমিয়া গেল এবং বুকে হাঁপানির আর কিছু মাত্র শব্দ রহিল না। তাঁহার পেট ফাঁপা, অম্ল, কোষ্ঠবদ্ধতা, কলাইটিস, অনিদ্রা প্রভৃতি

বিভিন্ন রোগ ছিল। ইহার পর আরও দুই মাস চিকিৎসা করিয়া তিনি মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

উদরাময় রোগে (intestinal catarrh) এবং প্লিহা, যকৃৎ ও মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যে ইহা আভ্যন্তরীণ যন্ত্র হইতে রক্ত চর্মে টানিয়া আনিয়া মুহূর্তে রোগ ও রক্তাধিক্য দূর করিয়া দেয়। পুরাতন উদরাময় রোগীদিগকে এই প্যাক মাসে দুই বার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু রোগীর দেহে যদি যথেষ্ট মাংস না থাকে তবে কুড়ি পঁচিশ মিনিট পর রোগীর দেহ গরম হইয়া উঠা মাত্রই ঐ-প্যাক সরাইয়া লইতে হয়।

কামলা (Jaundice) রোগে ইহা চর্মের চুলকানি ও উত্তেজনা যাদু মন্ত্রের মত দূর করে এবং দেহের যথেষ্ট বিষ বাহির করিয়া দিয়া রোগীকে সুস্থ করে।

কিন্তু ইহা দ্বারা কোন্ কোন্ রোগ আরোগ্য হয়, তাহার ফিরিস্তি দেওয়া বৃথা। দেহ সঞ্চিত বিভিন্ন জাতীয় দূষিত পদার্থই সমস্ত রোগের মূল কারণ। ইহার দ্বারা দেহের দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়, এই জন্য ইহার যুক্তিযুক্ত প্রয়োগ দ্বারা প্রায় সমস্ত রোগই আরোগ্য হইতে পারে।

ইহা দ্বারা ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড প্রভৃতি সর্বপ্রকার জ্বর, সর্দি, কাশি, ঘুংড়িকাস (whooping cough), হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা ও ফুসফুসের সমস্ত ব্যাধি, দুষ্টব্রণ, পৃষ্ঠব্রণ, হাম, বসন্ত, আমাশয়, পেটের অসুখ, বাত, গণোরিয়া, উপদংশ, হিষ্টিরিয়া, অন্ত্র-প্রদাহ রোগ (appendicitis), ডিপথিরিয়া ও প্লেগ প্রভৃতি সমস্ত তরুণ ব্যাধি (acute disease) আরোগ্য হয়।

ইহা দ্বারা পুরাতন ব্যাধিও (chronic disease) সমভাবে আরোগ্য লাভ করে। কারণ সমস্ত রোগ একই কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা অজীর্ণ (dyspepsia), অনিদ্রা, স্নায়বিক দুর্বলতা, যকৃতের ফোড়া, মৃগীরোগ (epilepsy), পাকস্থলীর ক্ষত (gastric ulcer),

সর্বপ্রকার হৃদ্রোগ, উন্মাদ রোগ এবং পক্ষাঘাত প্রভৃতি আরোগ্য হয় (Henry Lindlahr, M. D.—Practice of Natural Therapeutics, P. 86—89)।

ছোট খাট রোগ সাধারণত এক বার প্যাক প্রয়োগেই আরোগ্য হয়। কিন্তু পুরাতন রোগে ইহা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা আবশ্যক। পূর্ণ সময়ের জন্য প্যাক প্রয়োগ করিলে সাধারণত মাসে তিন বার প্রয়োগেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু তরুণ রোগে প্রায়োজন হইলে সপ্তাহে দুইবারও প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

প্যাক গ্রহণে সতর্কতা

রোগীকে ভিজা চাদরের উপর শোয়াইবার পূর্বেই ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ করা আবশ্যক, রোগীর দেহ গরম আছে কিনা। যদি রোগীর দেহে শীত অথবা কম্প থাকে, কিম্বা রোগী শিশু, অতি বৃদ্ধ অথবা অতি দুর্বল হয়, তবে তাহার দেহ একবার গরম করিয়া লইয়াই তাহার পর প্যাক প্রয়োগ করা উচিত। এই জন্য রোগীর ঊর্ধ্ব মেরুদণ্ড ও উপর দিকের সমস্ত পিঠের উপর দশ পনর মিনিট গরম সেক দিয়া, অথবা তাহাকে একটা চেয়ারের ভিতর ৪ হইতে ৭ মিনিটের জন্য একটা বাস্পস্নান প্রয়োগ করিয়া অথবা মাথায় ভিজা গামছা দিয়া রৌদ্রে রোগীকে কতক্ষণ ঘুরাইয়া লইয়া শরীর গরম হওয়ার অব্যবহিত পরই রোগীকে চাদরের উপর নিয়া শোয়াইতে হয় অর্থাৎ চাদরের উপর শুইবার পূর্বে শরীরটা এরূপ গরম হওয়া আবশ্যক যেন চাদরে শুইলে আরাম বোধ হয়। কিন্তু রোগীর যদি জ্বর থাকে অথবা সুস্থ দেহে শরীর যদি শীতল না থাকে তবে দেহ গরম করিবার আবশ্যক হয় না।

কাহারো কাহারো এই ধারণা আছে যে, জ্বরের সময় রোগীর যখন অত্যন্ত শীত বোধ হইতে থাকে, তখন তাহাকে ভিজা চাদরের প্যাক দিতে

নাই। কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভ্রম। কারণ তখনি রোগীর দেহে থারমোমিটার দিলে দেখা যাইবে যে, রোগীর দেহে প্রবল উত্তাপ রহিয়াছে। জ্বরের সময় ভিতরে রক্ত চলিয়া যায় বলিয়া বাহিরের চর্ম্মে রক্তাভাব হেতু শৈত্য অনুভূত হয়। ভিজা চাদরের মোড়ক দ্বারা রক্তকে চর্ম্মে টানিয়া লইয়া আসিলেই কম্প ও শৈত্য আপনা হইতে অন্তর্হিত হয়।

রোগীর কোন অঙ্গে যদি প্রদাহ থাকে, তবে এই প্যাক ব্যবহারে কতকটা সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। ঐ-অবস্থায় প্যাকের নীচে আক্রান্ত অঙ্গের উপর আর একখানা পটি দিতে হয়। ঐ-পটি দেহের তাপ এবং আক্রান্ত যন্ত্রের আয়তন অনুসারে দুই ভাঁজ হইতে আট ভাঁজ এবং ছয় হইতে বার বর্গ ইঞ্চি পর্যন্ত হইতে পারে। দেহের তাপ যত বেশী হইবে ঐ-পটি তত পুরু রাখা আবশ্যক। ফুসফুস, লিভার, প্লিহা, পাকস্থলী, মূত্রাশয়, অন্ত্রপুচ্ছ (appendix) অথবা স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাশয়ের রোগ প্রভৃতিতে এইরূপ আক্রান্ত অঙ্গের উপর বড় প্যাকের নীচে দ্বিতীয় আর একটা পটি দেওয়া আবশ্যক।

কতগুলি রোগের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এই প্যাক বর্জন করাই কর্তব্য। বসন্ত প্রভৃতি উদ্গমযুক্ত রোগে গুটি ভালরূপ বাহির হইবার পর এই প্যাক প্রয়োগ করা কর্তব্য হয়। দেহে অত্যধিক পাচড়া ও ব্রণ প্রভৃতি থাকিলেও প্যাক প্রয়োগ করিতে নাই। হৃদ্রোগের চরম অবস্থায়, অত্যধিক স্নায়বিক দুর্বলতায়, কৃশতা সহ বহুমূত্রে এবং অত্যন্ত দুর্বল রোগীদিগকে কখনও দীর্ঘ সময়ের জন্য ভিজা চাদরের মোড়ক (sweating wet-sheet pack) প্রয়োগ করা উচিত নয়।

[৩]

দুর্ব্বল রোগীর স্নান

সবল ও দুর্বল সকল রোগীর পক্ষেই স্নান একান্ত আবশ্যক। কিন্তু সবল রোগীর পক্ষে যে-পদ্ধতি প্রযোজ্য দুর্বল রোগীর পক্ষে তাহা প্রযোজ্য

নয়। যে-সমস্ত রোগী বিছানার সঙ্গে লাগিয়া গিয়াছে, যাহাদের জীবনী শক্তি কম অথবা জল ছুঁইতেই যাহাদের ভয় হয়, কখনও শীতল জলে তাহাদের পূর্ণ স্নান প্রয়োগ করিতে নাই। এই সকল রোগীকে পূর্ণ স্নানের পরিবর্তে মৃদু স্পঞ্জ বাথ (mild sponge bath) অথবা তোয়ালে স্নান (towel bath) প্রয়োগ করিতে হয়। দুর্বল রোগীরা ঐ-সকল মৃদু স্নানেই পূর্ণ স্নানের ফল লাভ করিতে পারে।

রোগী যদি খুব দুর্বল হয়, তবে তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া রাখিয়াই মৃদু তোয়ালে স্নান প্রয়োগ করা কর্তব্য। একখানা অয়েল ক্লথের উপর চাদর বিচাইয়া তাহার উপর রোগীকে গলা পর্যন্ত কম্বল ঢাকা অবস্থায় শোয়াইয়া প্রথম রোগীর মাথা, মুখ ও ঘাড় ভাল করিয়া শীতল জল দ্বারা ধুইয়া দিতে হয়। তাহার পর প্রতিবার রোগীর দেহের এক একটি অংশ অনাবৃত করিয়া ঐ-স্থান শীতল জলে ভিজান তোয়ালে দ্বারা ৫ সেকেণ্ড পর্যন্ত মোছাইয়া শেষে ৫ সেকেণ্ড পর্যন্ত ঐ-স্থান খালি হাতে ঘর্ষণ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহার পর ৫ হইতে ১০ সেকেণ্ড পর্যন্ত সময় পৃথক শুকনা তোয়ালে দ্বারা ঐ-স্থান মোছাইয়া, অবশেষে ঐ-অংশ কম্বল দ্বারা ঢাকিয়া আবার দেহের অন্য অংশ ঐ-ভাবে মোছাইতে হয়। প্রথম রোগীর এক হাত, তাহার পর অন্য হাত, শেষে পর পর তলপেট, বুক, পা ও জানুর উপরের দিক এবং সর্বশেষে পিঠ, পা ও জানুর পিছনের দিক মোছান কর্তব্য। তোয়ালে স্নান প্রয়োগ করিবার সময় রোগীর কুঁচকি ও জননেন্দ্রিয়ের উপরিভাগ ভিজা তোয়ালে দ্বারা যাহাতে ভাল করিয়া মোছান হয়, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এই ভাবে সর্বশরীর একবার মোছাইয়াই প্রয়োজন হইলে পুনরায় এই পদ্ধতিতে মোছান যাইতে পারে। যদি রোগীর হাত পা ঠাণ্ডা থাকে তবে তোয়ালে খুব বেশী করিয়া নিংড়াইয়া লওয়া আবশ্যক।

অথবা দুর্বল রোগীকে শীতল ঘর্ষণ (cold friction) প্রয়োগ করা

যাইতে পারে। রোগীর মাথা, মুখ ও ঘাড় শীতল জল দ্বারা ধুইয়া লইয়া তাহাকে গলা পর্যন্ত এক খানা কম্বল দ্বারা আবৃত করিতে হয়। তাহার পর কম্বলের নীচে রোগীর দেহের এক অংশ শীতল জলে ভিজান তোয়ালে দ্বারা আবৃত করিয়া যে-পর্যন্ত তোয়ালে গরম না হইয়া উঠে সে-পর্যন্ত তোয়ালের উপর ঘর্ষণ করা কর্তব্য। তাহার পর উহা সরাইয়া নিয়া ঐ-অংশের উপর অন্য একখানি শুকনা তোয়ালে বিছাইয়া পুনরায় ঘর্ষণ করিয়া ঐ-অংশে রক্তাভ করিয়া দিতে হয়। পরে ঐ-স্থান কম্বল দ্বারা আবৃত করিয়া আবার দেহের অন্য অংশ ধরা আবশ্যক। ইহা মনে রাখা প্রয়োজন তোয়ালে দ্বারা রোগীর দেহ ঘর্ষণ করিতে হয় না, রোগীর দেহের উপর তোয়ালে বিছাইয়া তাহার উপর ঘর্ষণ করিতে হয়।

কিন্তু রোগী যদি অত্যন্ত শিশু বা অত্যন্ত দুর্বল হয়, তবে রোগীর মাথা পূর্বে ধোয়াইয়া দিয়া, পরিচর্যাকারীর দুই খানা হাত শীতল জলে ডুবাইয়া তাহা দ্বারা রোগীর সমস্ত বুক তিন চার বার দ্রুত হস্তে জোর দিয়া ঘর্ষণ করিতে হয়। তাহার পর এক খানা শুকনা বস্ত্র বুকের উপর ফেলিয়া তাহা দ্বারা বুক ঘর্ষণ করিয়া গরম ও লাল করিয়া দিতে হয়। এই ভাবে পর পর সমস্ত দেহ মুছিয়া দেওয়া কর্তব্য। ইহাকে সিক্ত হস্ত ঘর্ষণ (wet hand rubbing) বলে।

প্রয়োজন হইলে এই সকল স্নান এক সঙ্গেই বার বার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। জ্বর না থাকিলে রোগীকে দিনে এইরূপ দুই তিন বার স্নান করান কর্তব্য। কিন্তু প্রবল জ্বর কমাইবার জন্য এই সকল মৃদু স্নান প্রায় না থামাইয়া সুদীর্ঘ সময়ের জন্য প্রয়োগ করা আবশ্যক।

এই সকল স্নানেও জলের উত্তাপ ক্রমশ কমাইয়া আনিতে হয় এবং ক্রমশই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের জন্য রোগীকে স্নান করাইতে হয়। তোয়ালে স্নানে প্রথম রোগীকে শীতল জলে (৬৫°) স্নান করাইয়া জলের উত্তাপ প্রতিদিন দুই এক ডিগ্রি করিয়া কমাইয়া অবশেষে রোগীকে

খুব শীতল জলে (৪০°) স্নান করান কর্তব্য। প্রথমে তোয়ালে খুব বেশী করিয়া নিংড়াইয়া প্রায় শুষ্ক করিয়া লওয়া উচিত। তাহার পর ক্রমশই তোয়ালে খুব কম করিয়া নিংড়াইতে হয় এবং পরে প্রচুর জল সহ তোয়ালে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

এই সকল স্নান প্রয়োগ করিবার সময়ও বিশেষ ভাবে লক্ষ রাখা আবশ্যক, যাহাতে স্নানের সময় শরীর শীতল না থাকে। যদি শরীর তখন উষ্ণ না থাকে তাহা হইলে মেরুদণ্ডে কতক্ষণ সেক দিয়া রোগীর শরীর গরম করিয়া লইয়া তাহার পর তাহাকে স্নান করান কর্তব্য।

এই সকল স্নান সকল দুর্বল রোগীর পক্ষে উপযুক্ত হইলেও, কতগুলি রোগে ইহা বিশেষ উপযোগী। বহুমূত্র রোগ, স্বাভাবিক অপেক্ষা দেহের নিম্ন তাপ (in subnormal temperature), সূতিকা জ্বর, পুরাতন আমাশয়, ম্যালেরিয়া জ্বর, অচেতন নিদ্রা (coma), প্লেগ, ডেঙ্গুজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কুষ্ঠরোগ, অত্যধিক কৃশতা, রিকেট (rickets), পুরাতন মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ (chronic nephritis), হিষ্টিরিয়া, রক্তশূন্যতা, যক্ষ্মা প্রভৃতি সর্বপ্রকার ক্ষয় রোগ, জ্বরের পর আরোগ্য অবস্থায়, অজীর্ণ, পুরাতন বাতব্যাধি, পাকস্থলীর ক্ষত, হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা, নিউরেস্থেনিয়া, গ্রন্থিবাত এবং বার্ধক্যে ও শৈশবে এই সকল স্নান বিশেষ ভাবে হিতকর।

[৪]

সিজ বাথ

রোগ আরোগ্যের জন্য দেহকে বিজাতীয় পদার্থ হইতে মুক্ত করা যেমন আবশ্যক, দেহের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করাও তেমনি প্রয়োজন। এই জন্য দুর্বল রোগীর পক্ষে সিজ-বাথ অত্যন্ত উপকারী। কারণ ইহা দ্বারা জীবনী-শক্তি অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হয় এবং জীবনী-শক্তি সবল হইলে দেহে রোগ থাকাই অসম্ভব হইয়া উঠে।

এক কথায় সিজ-বাথ অর্থ লিঙ্গ-স্নান। একটি নির্জন ঘরে একটি জল পাত্রে সের দুই শীতল জল লইয়া ঐ-জলে একখানা ছোট নেকড়া ডুবাইয়া ঐ-জল দ্বারা অনবরত লিঙ্গমুণ্ডের ত্বক সামান্য রগড়াইয়া রগড়াইয়া ধুইয়া ফেলিতে হয়। জল যত শীতল হয় তত ভাল। কিন্তু এরূপ শীতল যেন না হয় যে, হাতে সহ্য হয় না। মেটে কলসীর বাসী জলই সিজ-বাথের পক্ষে সর্বোত্তম। বরফ কখনও সিজ-বাথে ব্যবহার করিতে নাই। সিজ-বাথে জল এইরূপ ভাবে লিঙ্গমুণ্ডে দিতে হইবে যে, জল যেন লিঙ্গমুণ্ডের মাংস স্পর্শ না করে। লিঙ্গের যে বহিরাবরণ তাহা টানিয়া বাম হস্তের দুইটি অঙ্গুলি দ্বারা এরূপ ভাবে ধরিতে হইবে, যেন লিঙ্গমুণ্ডের মাংস ভিতরে থাকে এবং উপরের ত্বক অঙ্গুলি দুইটির অপর পার্শ্বে থাকে। ঐ-বাহিরের ত্বকের উপরই নেকড়ার সাহায্যে জল তুলিয়া জল সমেত নেকড়াখানি আলগোছে অনবরত বুলাইতে হয়। এইরূপ সতর্কতার সহিত ইহা করিতে হইবে যে, কোন অবস্থায় যেন জোরে ঘর্ষণ না লাগে। নেকড়া একবার জলে ডুবাইলে যতটা জল উঠে, তাহা দ্বারা প্রতিবার বুলাইয়া নিতে হয়। ঘরের ভিতর জল বাহির হইবার যেখানে ছিদ্র থাকে সেইখানে একখানা জল-চৌকির উপর পা ফাঁক করিয়া বসিলেই ভাল ভাবে সিজ-বাথ নেওয়া যায়। ইহাতেও পা এবং ঊর্ধ্বদেহ শুষ্ক রাখা আবশ্যক। কিন্তু যদি পাছা (buttocks) জলে ভিজিয়া যায়, তাহাতেও কিছু দোষ হয় না।

যে-সব রোগী শয্যা হইতে উঠিতে পারে না, তাহাদের বিছানার ভিতরই একটা বাটি রাখিয়া অপর একটা বাটি হইতে জল তুলিয়া সিজ-বাথ দেওয়া যাইতে পারে। বিছানা যাহাতে ভিজিয়া না যায়, তাহার জন্য নীচে একখানা অয়েল ক্লথ পাতিয়া নেওয়া আবশ্যক।

সাধারণত ১৫ মিনিট হইতে অর্ধ ঘণ্টা পর্যন্ত সিজ-বাথ নেওয়া উচিত। শিশুদের ১০।১৫ মিনিটই যথেষ্ট। প্রয়োজন হইলে দিনে তিনবার ইহা নেওয়া যাইতে পারে।

মুসলমানদিগের সিজ-বাথ নিবার নিয়ম

সিজ-বাথে যে-ত্বকের উপর জল প্রয়োগ করার বিধি, মুসলমানেরা তাহা কাটিয়া ফেলেন। কিন্তু তাঁহারা অন্যভাবে সিজ-বাথ নিয়া সমান ফল লাভ করিতে পারেন। জননেন্দ্রিয়ের নীচের দিকে জোড়া মুখের মত যে-চর্ম রহিয়াছে, মুসলমানেরা ঐ-চর্মের উপর সাধারণ সিজ-বাথের মত নেকড়ায় করিয়া জল তুলিয়া লইয়া মৃদুভাবে ঘর্ষণ করিবেন। ইহাতেই সিজ-বাথ নেওয়ার কাজ হইবে।

স্ত্রীলোকদিগের সিজ-বাথ

সিজ-বাথে স্ত্রীলোকদিগেরই উপকার হয় সর্বাপেক্ষা বেশী। প্রায় সকল স্ত্রী-রোগের জন্যই সিজ-বাথের ব্যবস্থা করা হয়।

স্ত্রীলোকেরা জল তুলিয়া লইয়া কেবল জননেন্দ্রিয়ের বহির্ভাগস্থ দুই পার্শ্বদেশ বুলাইয়া বুলাইয়া ধুইবেন। জল কখনও ভিতরে প্রবেশ করিবে না। সর্বদা লক্ষ রাখিতে হইবে জোরে যেন কখনও ঘর্ষণ করা না হয় (Louis kuhne)।

সিজবাথের উপকারিতা

সিজবাথের উপকারিতা সম্বন্ধে লুইকুনে বলিয়াছেন, "আমাদের দেহের আর কোন স্থানেই এতগুলি স্নায়ু শেষ হয় নাই। কেবল লিঙ্গমুণ্ডে জল প্রয়োগ করিয়াই সমস্ত স্নায়ুকে শীতল করা যায়। এই স্থানকেই সমস্ত জীবন-বৃক্ষের মূল বলা যাইতে পারে। এই স্থানকে জল দ্বারা ধৌত করিলে কেবল যে আভ্যন্তরীণ দুষিত তাপ নষ্ট হয় তা নয়, ইহা দ্বারা সমস্ত স্নায়ু-মণ্ডলী সঞ্জীবিত হয়। এক কথায় বলিতে গেলে, ইহা দ্বারা দেহের অণুতে পরমাণুতে পর্য্যন্ত জীবনী-শক্তির উদ্দীপনা হয় (Louis Kuhne—The New Science of Healing, P. 113)।"

প্রকৃতপক্ষে স্নায়ুই আমাদের দেহের রাজা। স্নায়ুগুলিকে সঞ্জীবিত করিতে পারিলে সমস্ত দেহই তাহা দ্বারা সঞ্জীবিত হয়। আমাদের স্নায়ুগুলি প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত,—মস্তিষ্ক, মেরুরজ্জু ও স্নায়ুতন্তু। মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জু হইতে অসংখ্য স্নায়ুতন্তু বাহির হইয়া দেহের সকল স্থানে চলিয়া গিয়াছে। দেহের ভিতর এমন স্থান নাই যেখানে স্নায়ুতন্তু (nerves) না আছে।

এই স্নায়ুগুলি দুই প্রকারের। এক প্রকারের স্নায়ু সর্বপ্রকার অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করিয়া নেয়। তাহাদিগকে সংজ্ঞাবাহী (sensory nerves) বলে। অন্য প্রকার স্নায়ু মস্তিষ্ক হইতে আদেশ বহন করিয়া আনে। তাহাদিগকে চেষ্টাবাহী (motor nerves) বলে।

এই স্নায়ুগুলির কাজ কতকটা টেলিগ্রাফের তারের ন্যায়। কোথাও দেহে আঘাত লাগিলে সংজ্ঞাবাহী স্নায়ুগুলি তৎক্ষণাৎ তাহা মস্তিষ্কে তার করে, তখন আমরা বেদনা বোধ করি। মস্তিষ্ক তখনি চেষ্টাবাহী স্নায়ুর ভিতর দিয়া আদেশ পাঠায়। তখন আমরা মস্তিষ্কের নির্দেশ অনুসারে অঙ্গ সরাইয়া লই বা আক্রমণ করি। আমাদের স্নায়ুগুলি এইরূপে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আমাদের দেহের সমস্ত যন্ত্রগুলিও পরিচালন করিতেছে। স্নায়ুর জন্যই আমাদের পাকস্থলী হজম করিতে পারে, অন্ত্র হইতে মল বাহির হইয়া যায়, মূত্রগ্রন্থি, ফুসফুস, হার্ট এবং দেহের প্রত্যেকটি যন্ত্র নিজ নিজ কার্য সমাধা করে। আমাদের চিন্তা এমন কি স্মরণ করার কাজও স্নায়ুমণ্ডলীর কার্যের অংশ। এই জন্য সিজবাথের দ্বারা স্নায়ুমণ্ডলীকে শীতল করিলে, তাহার প্রতিক্রিয়ায় সমস্ত দেহের স্নায়ুগুলি এরূপ উদ্দীপনা লাভ করে যে, দেহে কোন রোগ থাকাই অসম্ভব হইয়া উঠে।

যে-সমস্ত রোগী উত্থানশক্তি রহিত সিজবাথে তাহাদেরই উপকার হয় সর্বাপেক্ষা বেশী। এই সকল রোগীকে দিনে তিন বার সিজবাথ দেওয়া কর্তব্য।

যাহাদের ঘুম হয় না, তাহারা দিনে হিপবাথ গ্রহণ করিয়া শয়নের পূর্বে সিজ-বাথ লইলে এবং বারান্দায় ঘুমাইলে অতি সত্বর রাত্রিতে জাগিয়া থাকার যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

কোনরূপ পরিশ্রমের পর শরীর খুব গরম হইয়া গেলে সিজ-বাথ মন্ত্রের মত সমস্ত দেহ শীতল করিয়া দেয়। আধঘণ্টা সিজবাথ নিলে দারুণ যে শ্বাসকষ্ট তাহাও পড়িয়া যায়। হাঁপানি, নিউমোনিয়া, ডিপথিরিয়া ও ক্যানসার প্রভৃতি রোগে দারুণ শ্বাসকষ্ট অতি অল্প সময়ে সিজবাথে বন্ধ হয়। কুড়ি মিনিট সিজবাথের পর অনেক সময় রোগী আপনা হইতে ঘুমাইয়া পড়ে।

একটি বৃদ্ধ রোগীর শয্যাপার্শ্বে যাইয়া এক দিন দেখি, হাপরে বাতাস দিবার সময় যে-শব্দ হয়, তাঁহার নাকের ভিতর শ্বাসের তেমনি শব্দ হইতেছে। আমি তখনি তাহাকে সিজ বাথের বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। ভদ্রলোক অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। তৎক্ষণাৎ বাথ নিতে আরম্ভ করিলেন। পনের মিনিট পর তাহার ঘরে পুনরায় যাইয়া দেখিলাম, তাঁহার শ্বাস স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে।

রোগীর যদি হিপবাথ নিবার ক্ষমতা থাকে, তবে পৃথক ভাবে তাহার সিজবাথ না নিলেও চলে। কারণ হিপবাথে সিজবাথের সমস্ত উপকারই হয়। এই জন্য সিজবাথটা বর্তমানে এক রকম উঠিয়া গিয়াছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সিজবাথ বলিতে হিপবাথ লোকে বোঝে। হিপবাথে মেরুদণ্ড ডুবাইয়া বাথ নিলে সিজবাথে যে কাজ হয়, উহাতে তাহাই হইয়া থাকে। কিন্তু রোগীর যদি হিপবাথ নেওয়ার ক্ষমতা না থাকে তবে তাহাকে সিজবাথ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

নবম অধ্যায়

রোগ চিকিৎসায় জলের অন্যান্য ব্যবহার

[১]

মনুষ্যদেহের অধিকাংশ রোগই ষ্টিম-বাথ ও হিপ-বাথ প্রভৃতি সর্বদেহের সাধারণ চিকিৎসা (general treatment) দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে। কিন্তু সকল সময় সর্বদৈহিক চিকিৎসার আবশ্যক হয় না। বহু ক্ষেত্রেই কেবল বিশেষ অসুস্থ অঙ্গের চিকিৎসার দ্বারা রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। আবার অনেক সময় সর্বদৈহিক চিকিৎসার পরও বিভিন্ন প্রকারে আক্রান্ত বিভিন্ন অঙ্গের জন্য বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসার আবশ্যক হয়।

শীতল পটি (cold compress)

জলচিকিৎসায় শীতল পটির ব্যবহার খুব বেশী। ভিজা নেকড়া অনাবৃত রাখিয়া উত্তপ্ত হইবার পূর্বেই পরিবর্তন করিয়া দিলে, তাহাকে শীতল পটি বলে। প্রয়োজনানুসারে দুই হইতে পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর ইহা পরিবর্তন করিয়া দেওয়া চলিতে পারে। শীতল পটি সর্বদাই খুব যত্ন করিয়া প্রয়োগ করা কর্তব্য। দেহের যে-অংশের উপর ক্রিয়া করিবার জন্য পটি প্রয়োগ করা হয়, সেই অংশের আক্রান্ত স্থলের চারিদিকে অনেকটা দূর পর্যন্ত পটিদ্বারা আবৃত করা প্রয়োজন। যদি দেহের এমন কোন অংশে শীতল পটি প্রয়োগের আবশ্যক হয়, যাহা জলে ডুবান যায় তবে ঐ-অঙ্গ শীতল জলে ডুবাইলেও শীতল পটির কাজ হয়।

বিভিন্ন রোগে দেহের বিভিন্ন স্থানে এই পটি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। স্নায়ু ও ধমনী প্রভৃতির দ্বারা বাহিরের চর্মের সহিত আমাদের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাবলির সংযোগ রহিয়াছে। সেই জন্য বিভিন্ন যন্ত্রের রোগে ঐ-যন্ত্রের উপরস্থ চর্মের উপর শীতল পটি প্রয়োগ করিয়া উহার উপর প্রভাব (reflex effect) বিস্তার করা যাইতে পারে।

প্রবল জ্বরের সময় রোগীর মাথায়, ঘাড়ে ও মুখের উপর সুদীর্ঘ সময়ের জন্য শীতল পটি প্রয়োগ করিলে জ্বর দ্রুত কমিয়া আসে, প্রলাপ বন্ধ হয়, মাথার বেদনা ও রক্তাধিক্য কমিয়া যায় এবং সহজে রোগীর ঘুম আসে। জ্বরের সময় ঐ-পটির দ্বারা রোগীর সমস্ত মাথা ও ঘাড় আবৃত করা আবশ্যক।

জ্বর রোগীর তলপেটে অর্ধঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা পর্যন্ত শীতল পটি প্রয়োগ করিয়াও জ্বর দুই ডিগ্রি পর্যন্ত নামাইয়া আনা যায়। জ্বরের সময় দিনে তিন চার বার অর্ধঘণ্টার জন্য এই পটি প্রয়োগ করা আবশ্যক। জ্বর কমাইয়া আনিতে তলপেটের শীতল পটির মত আর কিছুই নাই। জ্বরের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই পটি চালান আবশ্যক।

প্রবল জ্বরে মেরুদণ্ডের উপরে শীতল পটি প্রয়োগেও জ্বর অনেক কমিয়া যায়।

উদরাময়ে (diarrhea) যখন পেট গরম থাকে তখন তলপেটের উপর ভিজা গামছা দ্বারা পুরু করিয়া পটি প্রয়োগ করিলে পরিমিত দাস্তের পর ইহা আপনিই দাস্ত বন্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু সুদীর্ঘ সময়ের জন্য এই পটি প্রয়োগ করিতে হইলে প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর তলপেটে গরম সেক দিয়া তাহার পর আবার শীতল পটি প্রয়োগ করা আবশ্যক।

আহারের পূর্বে পাকস্থলীর উপর অর্ধঘণ্টার জন্য শীতল পটি প্রয়োগ করিলে মন্দাগ্নি বা ক্ষুধাহীনতা দুর হয়। শীতল পটির উপর বরফের থলি

রাখিলে আরও বেশী কাজ হয়। পুরাতন অজীর্ণ রোগে ইহাতে সহজেই ক্ষুধা জন্মে এবং হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়।

মুখ ও উর্দ্ধ মেরুদণ্ডের উপর একসঙ্গে শীতলপটি প্রয়োগ করিলে নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীগুলি সঙ্কুচিত হয় এবং তাহার জন্য নাসিকা হইতে রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়।

মুখ ও ঘাড়ের উপর সুদীর্ঘ সময়ের জন্য শীতল পটি প্রয়োগে মস্তিষ্কের ধমনীগুলি (vessels) সঙ্কুচিত হয় এবং তাহার ফলে মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য নষ্ট হয়।

হৃৎকম্পে ও (palpitation of the heart) হৃৎপিণ্ডের উপর দিনে দুইবার অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্য শীতল পটি রাখিলে অত্যন্ত উপকার হয়। প্রথম ১৫ মিনিটের জন্য পটি রাখিয়া ক্রমশ সময় বৃদ্ধি করিতে হয়। পটি তুলিয়া নিবার পর ঐ-স্থান ঘর্ষণ করিয়া লাল ও গরম করিয়া দেওয়া আবশ্যক। অথবা গরম জলে ভিজান নেকড়া দ্বারা মুছিয়া ঐ-স্থান গরম করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

আভ্যান্তরীণ ও বহির্দেশের সর্বপ্রকার প্রদাহে (inflamation) শীতল পটি মন্ত্রশক্তির মত কার্য করে। প্রদাহের প্রথম অবস্থায় সুদীর্ঘ সময়ের জন্য শীতল পটি প্রয়োগ করিয়া দুই তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর ৫ হইতে ১০ মিনিটের জন্য গরম সেক দেওয়া আবশ্যক। প্রদাহের গতি এবং জীবাণুর বিস্তার রোধ করিতে শীতল পটির মত আর কিছুই নাই।

আগুনে পোড়ায় ব্যথা ও যন্ত্রণা জল পটিতে আশ্চর্য ভাবে মিলাইয়া যায়। কাহারও কাহারও ধারণা, আগুনে পোড়া ঘায়ে জল দিলে অমনি ফোস্কা পড়ে। কিন্তু ফোস্কা পড়ে তখনই যখন অল্প সময়ের জন্য জল দেওয়া হয়।

আগুনে কোন স্থান পুড়িলে অমনি সেই স্থান শীতল জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। জলে ডুবানের সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রণা অর্দ্ধেক কমিয়া যায় এবং

ক্রমশ কমিতে থাকে। যখন যন্ত্রণা আর থাকে না, তখন জল হইতে দগ্ধ স্থান তুলিয়া লইয়া তাহার উপর পুরু জলপটি অথবা পুরু করিয়া খুব শীতল কাদা মাটি দিতে হয়। ইহাতে বার ঘণ্টার মধ্যে পোড়া ঘা সারিয়া যায় এবং ক্ষতের কোন চিহ্নও থাকে না। একবার ছাপড়ায় লুচি ভাজিবার সময় আমার ছোট বোন শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর হাতে কড়াই উল্টাইয়া গিয়া ফুটন্ত ঘি পড়িয়া যায়। শ্রীমতী তখনই তাহার হাতটা এক বালতি জলের ভিতর ডুবাইয়া দেয় এবং প্রায় এক ঘণ্টা ঐ-অবস্থায় রাখে। তাহার পর যখন সে হাত তুলিয়া আনে তখন দেখা যায়, ঐ-স্থানে পোড়ার কিছু মাত্র চিহ্ন নাই।

যদি দেহের এমন স্থান পুড়িয়া যায় যে, সে-স্থান ডুবাইবার সুবিধা হয় না, তবে সেখানে শীতল কাদামাটি অর্ধ-ইঞ্চি পুরু করিয়া দিলেই জলে ডুবাইবার কাজ হয়। মাটি যখনই গরম হইয়া উঠে তখনই পরিবর্তন করিয়া দেওয়া দরকার।

যদি কাপড়ে আগুন লাগিয়া সর্বদেহ পুড়িয়া যায়, তাহা হইলে তখন তখন রোগীকে চৌবাচ্চায় ভিতর নিয়া গলা পর্যন্ত ডুবাইয়া রাখিতে হয়। পাড়াগাঁয়ের লোকেরা এই অবস্থায় পুকুরে অথবা নদীতে নামিয়া থাকিতে পারেন। আবশ্যক মত একদিন অথবা তাহার বেশীও জলে থাকা যায়। ইহাতে নিউমোনিয়া প্রভৃতি হইবার ভয় থাকে না আবার আগুনে পোড়ার জন্য মৃত্যুও অসম্ভব হয়। কিন্তু ঐ-সময় বিশেষ ভাবে লক্ষ রাখা আবশ্যক ঘাড় দুইটি যাহাতে জলের নীচে থাকে। এক বার আমার ছোট ভাই বাধ্য হইয়া কিছুদিন ঢাকা মিটফোর্ড হাঁসপাতালে ছিল। ঐ-সময় একটি সদ্য দগ্ধ রোগী আসে, তাহার সর্বদেহ আগুনে পুড়িয়া কাল হইয়া গিয়াছিল এবং কোথাও কোথাও বড় বড় ফোস্কা পড়িয়া উচু হইয়া উঠিয়াছিল। হাঁসপাতালের ডাক্তার সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহাকে গলা পর্যন্ত ডুবাইয়া পুকুরের ভিতর রাখিয়া দেন। ঐ-অবস্থায় ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত সে

থাকে। এক দিন পর তাহাকে জল হইতে তোলা হয়। তখন দেখা যায় তাহার দেহে একটি ফোস্কা নাই, কোথাও একটি পোড়ার চিহ্ন নাই, একটু বেদনা নাই পর্যন্ত।

বর্তমানে ক্ষত চিকিৎসায় পৃথিবীর সর্বত্রই শীতল জলপটি ব্যবহৃত হইতেছে। ক্ষতের উপর ব্যাণ্ডেজ, প্ল্যাষ্টার ও মলম প্রভৃতি চাপাইয়া ক্ষত স্থানকে এখন প্রায়ই ভারাক্রান্ত করা হয় না। বর্তমানে অস্ত্রাঘাত শুকাইবার জন্য য়ুরোপে কেবল শীতল জলপটির ব্যবহার করা হয়। ইহাতে বড় বড় অস্ত্রাঘাত অতি অল্প সময়েই আরোগ্য হয়।

ক্ষত স্থান হইতে যখন প্রবল ভাবে রক্তপাত হইতে থাকে, তখন বড় একটা জলপাত্রের ভিতর আহত স্থান ডুবাইয়া বেদনা ও রক্ত বন্ধ হইলে একখানা ভিজা নেকড়ার পুরু পটি ক্ষত স্থানের উপর দিতে হয়। যদি ক্ষত স্থান জলে ডুবাইবার সুবিধা না থাকে, তবে অনেকটা নেকড়া শীতল জলে ভিজাইয়া ক্ষত স্থানের উপর রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ঘা যত বড় হইবে ভিজা নেকড়াও তত পুরু হওয়া আবশ্যক।

জলপটি প্রয়োগে থেঁতলানো স্থানেরও বিশেষ কাজ হয়।

নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস নামে যশোহর জিলার একটি ছেলে কলিকাতার একটি প্রেসে কার্য করিত। একদিন প্রেস চালাইবার সময় অসতর্কতা বশত তাহার হাতের দুইটা আঙ্গুল মেশিনে চাপা পড়ে। আঙ্গুলের নখ দুইটা তৎক্ষণাৎ ফাটিয়া যায় এবং ফাটা স্থান হইতে রক্ত বাহির হইতে থাকে। প্রেসের একটি ভদ্রলোক তাহাকে ধরিয়া একখানা নেকড়ায় মিথিলেটড স্পিরিট দিয়া তাহার হাতের আঙ্গুল দুটি বাঁধিয়া দেয় এবং সাবধান করিয়া দেয়, আঙ্গুলে যেন জল না লাগে। কিন্তু ইহাতে তাহার বেদনা পড়ে না এবং যন্ত্রণা ক্রমশ বাড়িতে থাকে। তখন নেবানো বাতিটির মত মুখখানা করিয়া সে আমার কাছে আসে। আমি তৎক্ষণাৎ তাহার হাতের ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি খুলিয়া বড় একটা জলের বাটিতে তাহার

হাত ডুবাইয়া রাখিয়া দেই। তাহার হাতে যে দারুণ যন্ত্রণা হইতেছিল, শীতল জলে ডুবান মাত্রই সেই যন্ত্রণা অর্ধেক হইয়া যায়। তিন ঘণ্টা ঐ-ভাবে সে হাত জলে ডুবাইয়া রাখে। বেদনা তখন আর প্রায় ছিল না। তখন একখানা ভিজা নেকড়া তাহার হাতে জড়াইয়া দেওয়া হয় এবং বারবার তাহা জলে ভিজাইতে বলা হয়। দুইদিন পর্যন্ত এই নেকড়া বারবার জলে ভিজাইয়া সে আঙুলে জড়াইয়া রাখে। এই দুই দিনের মধ্যেই তাহার হাতের ঐ-দারুণ আঘাত সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় এবং হাতের নখটা যে উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল তাহাও অবিকৃত থাকে।

শীতল জল প্রয়োগে আঘাত ও ক্ষতজনিত সমস্ত যন্ত্রণা নির্বাপিত হইতে বাধ্য। যদি জলপটি দিবার পরও বেদনা থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, জল যথেষ্ট শীতল হয় নাই। তখন অধিকতর শীতল জল দিলে বেদনা নিশ্চয় পড়িয়া যায়।

কিন্তু শীতল পটিতে যথেষ্ট উপকার হইলেও, ইহা অবিচ্ছিন্ন ভাবে সুদীর্ঘ সময়ের জন্য প্রয়োগ করিতে নাই। তাহাতে রক্তের গতি বন্ধ হয় এবং ঐ-স্থানে একটা অবসাদ আসে। ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, রক্তই সকল রোগ আরোগ্য করে। সুতরাং কোথাও শীতল পটি প্রয়োগ করিলে, প্রত্যেক ৩০ মিনিট হইতে এক ঘণ্টা অন্তর অন্তর ৩ হইতে ৫ মিনিটের জন্য তাহা সরাইয়া লইয়া শুষ্ক ফ্লানেল দ্বারা ঐ-স্থান ঘর্ষণ করিয়া লাল ও গরম করিয়া দিতে হয়। অথবা তাহা অপেক্ষাও ভাল হয় যদি দুই তিন মিনিটের জন্য সেক দেওয়া যায়। ক্ষত প্রভৃতিতে সর্বদাই তাহা করা আবশ্যক। সেক দিবার পর পুনরায় আবার শীতল পটি প্রয়োগ করিতে হয়। প্রথম অবস্থায় শীতল পটি খুব ঘন ঘন পরিবর্তন করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহার পর বেদনা প্রভৃতি যখন কম হইয়া আসে, তখন ২০ হইতে ৩০ মিনিট পর পর পটি পরিবর্তন করিয়া দিলেই সর্বাপেক্ষা ভাল ফল লাভ করা যায়।

[২]

গরম প্যাক (Heating compress)

জলপটি শীতল ও গরম উভয় প্রকারেই প্রয়োগ করা যায়। যখন ইহা অনাবৃত রাখিয়া ঘন ঘন পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হয়, তখন তাহাকে শীতল পটি বলে। আবার উহাই ফ্লানেল জড়াইয়া দীর্ঘক্ষণের জন্য প্রয়োগ করিলে তাহাকে গরম প্যাক বলা হয়। গরম জল দিয়া যে ইহা প্রয়োগ করিতে হয় তাহা নয়। শীতল পটি কতক্ষণ পর্যন্ত ফ্লানেল দ্বারা আবৃত রাখিলে আপনিই তাহা গরম হইয়া উঠে। এই জন্য ইহাকে গরম প্যাক বলা হয়।

গরম প্যাক কতকটা ভিজা চাদরের প্যাকেরি অনুরূপ। ভিজা চাদরের প্যাক সর্বদেহের জন্য ব্যবহৃত হয়, আর ইহা গলা, বুক, তলপেট প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে অপেক্ষাকৃত ছোট করিয়া প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। স্থান ভেদে এই প্যাককেই বুকের প্যাক (chest pack), মধ্যকায়ের প্যাক (trunk pack) অথবা গলার প্যাক (throat pack) বলা হইয়া থাকে।

বুকের প্যাক (chest pack)

একখানা ভিজা নেকড়া বগল হইতে পাঁজরের হাড় পর্যন্ত বুক ও পিঠ ঘুরাইয়া আনিয়া তাহার উপর একখানা দীর্ঘ ফ্লানেন বা আলোয়ান ঘুরাইয়া বাঁধিয়া দিলেই বুকের প্যাক প্রয়োগ করা হয়।

সাধারণত জল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া না পড়ে এ-ভাবে নেকড়াখানা নিংড়ান আবশ্যক। রোগীর জ্বর থাকিলে নেকড়ার ভিতর জল একটু বেশী রাখিতে হয় এবং জলও শীতল হওয়া প্রয়োজন। রোগী যদি বৃদ্ধ, শিশু অথবা দুর্বল হয় অথবা তাহার চর্ম শীতল থাকে, তবে ঐ-নেকড়া যথাসম্ভব নিংড়াইয়া প্রয়োগ করা কর্তব্য অথবা গরম জলে

ডুবাইয়া প্রয়োগ করা আবশ্যক। নেকড়া খানা যথাসম্ভব পাতলা কাপড়ের হওয়া প্রয়োজন। উহা ২ হইতে ৬ বার ঘুরাইয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে। চর্ম যত উত্তপ্ত থাকে তত বেশী পুরু করিয়া প্যাক দেওয়া আবশ্যক। সাধারণ অবস্থায় দুই ভাঁজ ফ্লানেল দ্বারা ভিজা নেকড়া ঢাকিয়া দেওয়া কর্তব্য। রোগীর চর্ম অত্যন্ত শীতল হইলে তিন চার ভাঁজ ফ্লানেল দ্বারাও ঢাকিয়া দেওয়া যায়। উপরের ফ্লানেল এ-ভাবে প্রয়োগ করা আবশ্যক যেন ভিজা নেকড়ার সহিত বায়ুর কোন সংযোগ না থাকে এবং ভিতরে একটা উত্তাপের সঞ্চার হয়। কিন্তু তাহার জন্য অত্যধিক ফ্লানেল দিয়াও এরূপ ভাবে আবৃত করা উচিত নয়, যাহাতে রোগী অস্বস্তি বোধ করে এবং রোগীর সমস্ত শরীর অত্যধিক গরম হইয়া উঠে অথবা প্যাকের নীচে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়। ফ্লানেল জড়াইয়া নেকড়ার সহিত সেফ্টিপিন দিয়া অথবা দড়ি দিয়া ভাল করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। প্যাক নীচে নামিয়া না যায় এই জন্য ঘাড়ের উপর দিয়া দুই দিকের কাপড় বাঁধিয়া দিতে পারিলেও ভাল হয়।

বুকের প্যাক গ্রহণ করিয়া শীতকাল হইলে লেপ কম্বল প্রভৃতির দ্বারা গলা পর্যন্ত সমস্ত শরীর ঢাকিয়া রাখা কর্তব্য। গ্রীষ্মকালে সাধারণ একখানা চাদর গায়ে ফেলিয়া রাখিলেই চলে। প্যাক সরাইয়া লওয়ার পর অন্যান্য সকল প্যাকের মতই প্যাকের স্থান দ্রুতহস্তে সিক্ত তোয়ালে দ্বারা রগড়াইয়া ঠাণ্ডা করিয়া তাহার পর পুনরায় গায় কাপড় জড়াইয়া আর এক বার চর্মের তাপ ফিরাইয়া আনিতে হয়।

এই প্যাক সাধারণত দেড় ঘণ্টার জন্য প্রয়োগ করাই যথেষ্ট। যদি নেকড়া ইহার পূর্বেই শুকাইয়া যায়, তবে পূর্বেই প্যাক খুলিয়া ফেলা উচিত। যতক্ষণ ভিতরের নেকড়া ভিজা থাকে, ততক্ষণই প্যাকে উপকার হয়।

অনেক সময় এমন হয়, ভিতরে এমন একটা কিছু অসুখ হইয়াছে

ডাক্তারেরা যাহার কারণ নির্ণয় করিতে পারেন না। এই অবস্থায় এইরূপ একটা প্যাকেই অনেক সময় তাহা আরোগ্য হয়।

বুকের দোষযুক্ত সর্বপ্রকার রোগেই ইহা দ্বারা আশ্চর্য উপকার হইয়া থাকে।

সর্দি ও সর্দিজ্বর এই প্যাকের দ্বারা মন্ত্রের মত আরোগ্য লাভ করে। প্রবল নাসাস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে জ্বর থাকিলে এক বার মাত্র প্যাকেই সর্দি ও জ্বর সারিয়া যায়। কিন্তু রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে কোষ্ঠটি পূর্বে অবশ্যই পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক।

ইনফ্লুয়েঞ্জা আরোগ্যের ইহা অব্যর্থ ব্যবস্থা। বহু ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগীকে একবার মাত্র বুকের প্যাক দিয়া এক দিনে আমি তাহাদের জ্বর আরোগ্য করিয়াছি।

ব্রঙ্কাইটিস, ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া ও নিউমোনিয়া রোগ আরম্ভ হইবার পূর্বে এই প্যাক প্রয়োগ করিলে বহু অবস্থায় আক্রমণ ব্যর্থ হয়। রোগের সময়ও অল্প কয়েকটি প্যাকেই রোগ আরোগ্য লাভ করে। ওয়েলেসলি স্কোয়ারে একটি সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভদ্রলোকের একটি ছোট ছেলের খুব কঠিন ব্রঙ্কাইটিস হয়। তিনি এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা না করাইয়া আমাকে ডাকেন। আমি যাইয়া শিশুটিকে এক ঘণ্টার জন্য বুকের প্যাক দেই। তাহার পরে দুই দিন তিনি নিজেই প্যাক দেন। ছেলেটি তাহাতেই আরোগ্য লাভ করে।

পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস ও প্লুরিসিতেও এই প্যাকে অত্যন্ত উপকার হয়। এই সকল রোগে ৫ হইতে ৮ মিনিটের জন্য বুকে খুব গরম সেক দিয়া তাহার পর প্যাক দেওয়া কর্তব্য। রোগীর জ্বর না থাকিলে এই রোগে এক সঙ্গে দুই তিন ঘণ্টার জন্য এই প্যাক প্রয়োগ করা আবশ্যক।

যক্ষ্মারোগে বুকের মোড়কের মত ফলপ্রদ খুব কমই আছে। ইহা রোগীর কাসি, জ্বর ও রাত্রির ঘর্ম কমাইয়া দেয় এবং দেহে শ্বেতকণিকা বৃদ্ধি করিয়া রোগীকে আরোগ্য করিয়া তুলিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

কলিকাতার বিভিন্ন স্থলের কয়েকটি লোক, তাহাদের কাহারও শ্লেষ্মার সঙ্গে রক্ত থাকিত, কাহারও প্রায়ই সর্দি হইত, কাহারও বা প্রায়ই
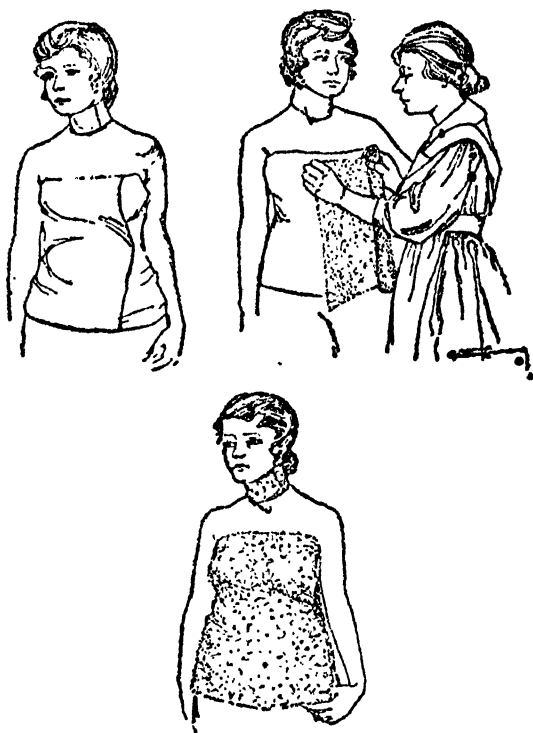
মধ্যকায়ের প্যাক (Trunk pack)

এই প্যাক আর একটু ছোট হইলেই বুকের প্যাক বলে।

সর্দির সঙ্গে জ্বর হইত ; মাঝে মাঝে বুকের প্যাক ব্যবহার করার ফলে তাহাদের ফুসফুস এরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে যে, তাহাদের যক্ষ্মাদ্বারা আক্রান্ত হইবার অবস্থা (predisposition) সম্পূর্ণ কাটিয়া গিয়াছে।

বুকের প্যাক যদি তলপেটের নিম্নাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়া দেওয়া

যায়, তবে তাহাকে মধ্যকায়ের প্যাক (trunk pack) বলে যে-সকল রোগীকে ভিজা চাদরের প্যাক (wet-sheet pack) প্রয়োগ করা অসুবিধাজনক, তাহাদিগকে এই প্যাক প্রয়োগ করিয়া প্রায় সমানই ফল লাভ করা যাইতে পারে। এই জন্য যে-অবস্থায় ভিজা চাদরের প্যাক প্রযোজ্য, সেই অবস্থাতেই মধ্যকায়ের প্যাক (ট্রাঙ্ক প্যাক) প্রয়োগ করা যাইতে পারে। শিশুদিগকে ভিজা চাদরের প্যাক দেওয়া চলে না। কিন্তু তাহার পরিবর্তে তাহাদিগকে এই প্যাক দেওয়া যায়। ইহা বুকের মোড়কের পরিবর্তেও সমান সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করা চলে।

দেহের কোন যন্ত্রে প্রদাহ থাকিলে, ভিজা চাদরের প্যাক যেরূপে প্রয়োগ করিতে হয় ঠিক সেই ভাবে প্রদাহযুক্ত অঙ্গের উপর প্যাকের নীচে বড় ও পুরু করিয়া অন্য এক খানা ভিজা নেকড়া ভাঁজ করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

গলার প্যাক (Throat pack)

এক খানা ভিজা নেকড়া দেহের উত্তাপ অনুসারে দুই হইতে ছয় বার ঘুরাইয়া এবং তাহার উপর ফ্লানেল জড়াইয়া গলায় প্যাক দেওয়া যাইতে পারে। পূর্ণবয়স্কদিগের জন্য নেকড়া খানি প্রস্থে ৪ ইঞ্চি হওয়া আবশ্যক। গলার ঘা (pharyngitis), গলার প্রদাহ, স্বরভঙ্গ, টনসিল প্রদাহ, ডিপথিরিয়া এবং ঘুংড়িকাশি (whooping cough) প্রভৃতিতে সময় সময় এই প্যাক অলৌকিক ঘটনার মত কার্য করে।

স্বামী জ্ঞানানন্দ নামে একজন সন্ন্যাসীর গলায় হঠাৎ বেদনা হয় এবং তাঁহার স্বরও বিকৃত হয়। তাঁহার গলার বেদনা এত বৃদ্ধি পায় যে, হাত দ্বারা গলা স্পর্শ করিতে তাঁহার কষ্ট হয় এবং তাঁহাকে সামান্য কিছু খাওয়ানও কঠিন হইয়া উঠে। আমি তাঁহার গলার চারিদিকে একটা প্যাক বাঁধিয়া দেই। ঠাণ্ডা লাগিয়া নাকি তাঁর গলায় ব্যথা হইয়াছিল। সুতরাং

যখন একখানা নেকড়া শীতল জলে ডুবাইয়া তাঁহার গলার চারিদিকে জড়াইতে থাকি তখন তিনি অত্যন্ত ভয় পাইয়া যান। অবশেষে উহা ফ্লানেল দ্বারা জড়াইয়া দিলে তিনি কতকটা আশ্বস্ত হন। আমি দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত ঐ-প্যাক রাখিয়া দেই। ঐ-সময়ের পর যখন ঐ-প্যাক খোলা হইল, তখন দেখা গেল, গলার বেদনা নাই, ঢোক গিলিতে কষ্ট হয় না এবং গলার ভিতর কোনরূপ অস্বস্তি পর্যন্ত নাই।

গলার প্যাক (Throat pack)

এই সমস্ত প্যাক ঠাণ্ডা জলে নেকড়া ভিজাইয়া নিতে হয়। কিন্তু প্রথম অবস্থায় কয়েক মিনিট ইহা ঠাণ্ডা থাকিলেও ফ্লানেল দ্বারা ঢাকিবার জন্য দুই এক মিনিট পরেই ইহা গরম হইয়া উঠে। তখন ইহা গরম প্যাকে রূপান্তরিত হয়। এই জন্য ইহাকে গরম প্যাক (Heating pack) বলা হয়। নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে অনেকগুলি পয়সা ব্যয় করিয়া এ্যান্টিফ্লোজেষ্টাইন ব্যবহার করা হয়। তাহা প্রথম কতক্ষণ গরম থাকে, তাহার পর শীতল হইয়া যায়। কিন্তু এই সকল প্যাক যতক্ষণ সিক্ত রাখা যায়, ততক্ষণই উত্তপ্ত থাকে এবং উষ্ণ অবস্থায় এ্যান্টিফ্লোজেষ্টাইনের যে উপকার, সিক্ত থাকা পর্যন্ত উহা সেই উপকার দিতে থাকে। অথচ এ্যান্টিফ্লোজেষ্টাইনের যা দোষ তাহা ইহাতে কিছু মাত্র নাই।

প্যাক দেওয়ার পর ভিতরে তাপ সঞ্চিত হওয়া মাত্রই ভিতরের বদ্ধ রক্ত চর্মে ছুটিয়া আসে, লোমকূপগুলি খুলিয়া যায় এবং প্রসারিত লোমকূপের ভিতর দিয়া আক্রান্ত অঙ্গের যথেষ্ট বিষ বাহির হইয়া যায়। এই জন্য কত রোগে যে এই সকল প্যাকে উপকার হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আংশিক বাষ্প-স্নানে যে-কাজ হয়, এই হিটিং প্যাকও অপেক্ষাকৃত অনেক স্নিগ্ধ উপায়ে সেই কাজই সম্পাদন করে। আংশিক বাষ্প-স্নানের (local steam bath) মত ইহাও দেহের যে-কোন অংশে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

[৩]

ভিজা চাদরের শীতল প্যাক
(The cooling wet-sheet pack)

ভিজা চাদরের প্যাক দ্বারা দেহকে উত্তপ্ত করিয়া যেমন দেহের তাপ বৃদ্ধি করা যায়, তেমনি ইহার বিশেষ প্রয়োগে প্রবল জ্বরের সময় ইচ্ছামত দেহের উত্তাপ কমাইয়াও আনা যায়। এই প্যাককে ভিজা চাদরের শীতল প্যাক (the cooling wet-sheet pack) বলে। রোগীর দেহের তাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলে এক খানা কম্বলের উপর এক খানা ভিজা চাদর বিছাইয়া তাহা দ্বারা রোগীর গলা পর্যন্ত সর্বদেহ ঢাকিয়া দিতে হয়। ঐ-চাদর অত্যন্ত জলসিক্ত রাখা আবশ্যক। প্রয়োজন হইলে দুইখানা চাদরও ব্যবহার করা যাইতে পারে। তাহার পর একখানা মাত্র কম্বল দ্বারা রোগীকে ঢাকিয়া কম্বলের উপর রোগীর সর্বদেহ মৃদুভাবে ঘর্ষণ করিতে হয়। অল্প কতক্ষণ পরেই চাদর উত্তপ্ত হইয়া উঠে। তখন কম্বলখানি ক্ষণকালের জন্য সরাইয়া চাদর ও শরীরের উপর শীতল জল ছিটাইয়া চাদর ও দেহ শীতল করিয়া পুনরায় তখনই আবার রোগীকে কম্বল ঢাকা দিতে হয়। রোগীর জ্বর যত বেশী হয় তত বেশী বার এইরূপ করা কর্তব্য। এক সঙ্গে তিন হইতে পাঁচ বারের জন্য ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রথম বার রোগীকে পাঁচ ছয় মিনিটের জন্য রাখিয়া দ্বিতীয় বার পাঁচ মিনিট বেশী সময়ের জন্য রাখিতে হয়। এই ভাবে পূর্ববর্তী প্যাক হইতে পরের প্যাক ক্রমশ পাঁচ মিনিট বেশী সময় রাখিয়া শেষের প্যাকটি অর্ধ ঘণ্টার জন্য রাখা কর্তব্য। প্রথম বার প্যাকে শীতল জল (৬০°

হইতে ৬৫°) প্রয়োগ করিয়া রোগীর উত্তাপ যত কমিয়া আসে পরে তত কম শীতল জল ব্যবহার করা আবশ্যক।

ইহা দ্বারা রোগীর দেহের উত্তাপ ইচ্ছা মত কমাইয়া যত ডিগ্রিতে ইচ্ছা তত ডিগ্রিতে আনা যায়। কিন্তু জ্বরকে কখনও জোর করিয়া বন্ধ করিতে নাই। যদি রোগীর দেহের উত্তাপ ১০৪° হয় তবে তাহা কমাইয়া ১০২° পর্যন্ত করা যাইতে পারে। ১০২° থাকিলে তাহা অপেক্ষা আরও দুই ডিগ্রি কমান যায় (Lindlahr, M. D.—Practice of Natural Therapeutics, p. 52, 80, 84, 148)।

শীতল জলে স্নানে যে-ফল লাভ হয়, ভিজা চাদরের শীতল প্যাক (cooling wet-sheet pack) নিলেও সেই ফলই হইয়া থাকে। সুতরাং রোগীকে টবে স্নান করাইবার পরিবর্তে সর্বদাই এই প্যাক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও তরুণ ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি জ্বর, ইরিসিপ্লাস ও প্লেগ প্রভৃতিতে ইহা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য।

[৪]

একান্তর পটি (The alternate compress)

কোন অঙ্গ হইতে দূষিত পদার্থ সরাইয়া দিতে পর্যায়ক্রমে গরম ও শীতল জল প্রয়োগের মত আর কিছুই নাই। কোন অঙ্গে যখন গরম সেক প্রয়োগ করা হয়, তখন সেই অঙ্গের রক্তবহা সূক্ষ্মতম প্রণালীগুলি পর্যন্ত প্রসারিত হয়। কারণ উত্তাপ প্রসারিত করে। সেই পথে তখন রক্ত ছুটিয়া আসে। রক্ত যখন আসে তখনই দেহ গঠনের নূতন মসলা ও জীবাণুর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য নূতন শ্বেতকণিকা লইয়া আসে। আবার তখনই ঐ-অঙ্গে শীতল জল প্রয়োগে রোগীর রক্তবহা প্রণালীগুলি সঙ্কুচিত হয় এবং রক্ত ছুটিয়া পালায়। পালাইবার সময় রক্ত আক্রান্ত অঙ্গের

দুষিত ও বিষাক্ত পদার্থ লইয়া চলিয়া যায় এবং দেহের বিভিন্ন নরদমা দিয়া তাহা বাহির করিয়া দেয়। এই ভাবে অঙ্গটাকে একবার তপ্ত ও আর একবার শীতল করিলে সেই অঙ্গে একটা পাম্পের কাজ হয়। এই জন্য দুষিত অঙ্গ অল্প সময়ে নির্দোষ হইতে পারে।

যখন কোন আক্রান্ত অঙ্গে পর্যায়ক্রমে গরম সেক ও শীতল পটি প্রয়োগ করা হয়, তখন তাহাকে একান্তর পটি (the alternate compress) বলে। গরম ও শীতল পটির ভিতর উত্তাপে যথেষ্ট পার্থক্য থাকা প্রয়োজন। জল যত গরম ও ঠাণ্ডা হয় প্রয়োগে তত উপকার হয়। প্রবল উত্তাপের পর প্রবল ঠাণ্ডা প্রয়োগ করিলে ঐ-স্থানে কোন জীবাণুই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য। কিন্তু গা পুড়িয়া যায়, জল যেন এত গরম না হয়। গরম জল প্রয়োগ করিয়াই অবিলম্বে ঠাণ্ডা জল প্রয়োগ করা আবশ্যক। তাহা হইলেই উপকার পাওয়া কেবল সম্ভব হয়।

সাধারণত ৫ মিনিটের জন্য গরম সেক দিয়া তাহার অব্যবহিত পরই ৫ মিনিটের জন্য শীতল পটি প্রয়োগ করিতে হয়। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অল্প সময়ের জন্যও গরম ও ঠাণ্ডা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু গরম ও ঠাণ্ডা প্রায়ই সম পরিমাণ সময়ের জন্য দেওয়া হইয়া থাকে। যদি তাহা না হয় তবে ঠাণ্ডা অপেক্ষা গরম কিছু বেশী সময়ের জন্য দেওয়া আবশ্যক। সর্বদাই উত্তাপের সহিত একান্তর পটি আরম্ভ করিতেহয়।

যখন দেহের কোন অংশ পাকিয়া উঠে এবং ঐ-স্থানে পুঁজ উৎপন্ন হইবার মত অবস্থা হয়, তখন একান্তর পটি প্রয়োগে বেদনা ও প্রদাহ উভয়ই নষ্ট হয়।

শয্যাক্ষত উৎপন্ন হইবার অবস্থা হইলে একান্তর পটিতে শয্যাক্ষত প্রায় সর্বদাই নিবারিত হয়।

যে-সব অঙ্গ অসাড় হইয়া গিয়াছে সেই সকল অঙ্গে ইহা প্রয়োগ করিলে যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়।

বক্ষ ও তলপেটের শোথে এবং পুরাতন প্লুরিসিতেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

আফিম অথবা অন্য কোন বিষ খাইলে রোগীর নাড়িস্পন্দন ও শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা যখন অত্যন্ত কমিয়া যায়, তখন মেরুদণ্ডের উপর একান্তর পটি প্রয়োগে তৎক্ষণাৎ নাড়ি স্বাভাবিক হয়। মদ খাইয়া অচেতন হইয়া গেলে অথবা বিষাক্ত গ্যাসের দ্বারা অচেতন হইলেও ইহাতে বিশেষ ফল হইয়া থাকে। জলে ডোবা রোগীকেও ইহা প্রয়োগ করিয়া আশাতীত ফল লাভ করা যায়। এই অবস্থায় সাধারণত ২০ সেকেণ্ড পর্যন্ত গরম জলে ভিজান ফ্লানেল দ্বারা মেরুদণ্ড মুছিয়া তাহার পর ঐ-সময়ের জন্য শীতল জলে ভিজান নেকড়া দ্বারা মেরুদণ্ড মুছিয়া ফেলিতে হয়। ইহা আবশ্যকানুযায়ী দশ পনের মিনিটের জন্য পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

দুর্বল হার্টকে সবল করিতে মেরুদণ্ডের একান্তর পটি মন্ত্রশক্তির মত কার্য করে। একবার পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী নামে একটি ভদ্রলোক চুনার হইতে চিকিৎসা করাইবার জন্য আমার নিকট আসিয়াছিলেন। বিভিন্ন রোগের ভিতর তাঁহার হার্টটি ছিল অত্যন্ত দুর্বল। প্রতি মিনিটে তাহার হার্টের স্পন্দন হইত মাত্র পঞ্চাশ। আমি তাঁহাকে একটি ভিজা চাদরের প্যাক দিয়া তাঁহার মেরুদণ্ডে ১৫ মিনিটের জন্য দিনে একবার করিয়া একান্তর পটির ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। সাত দিন পরেই দেখিলাম, তাঁহার হার্টের বিট ৭২ হইয়াছে এবং তাঁহার হার্টও অনেক ভাল হইয়াছে। এই ভাবে এই পটির দ্বারা বহু দুর্বল রোগীর হার্ট আমি ভাল করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে জল-চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি দ্বারা হার্টের বিভিন্ন রোগ এরূপ দ্রুত ও নির্দোষ ভাবে আরোগ্য হইতে পারে যে, কোন ঔষধের দ্বারা সেরূপভাবে আরোগ্য করা একান্ত অসম্ভব।

সময় সময় দেহের বিভিন্ন স্থানে পাঁচ হইতে দশ মিনিটের জন্য গরম

সেক দিয়া তাহার পর ২০ হইতে ৪০ সেকেণ্ডের জন্য শীতল পটি প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাকে উত্তাপবহুল একান্তর পটি (revulsive compress) বলে। প্রয়োজন হইলে একই সময়ে ইহা একাধিক বার প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

সর্ব প্রকার স্নায়ু শূল এবং সর্বপ্রকার বেদনায় উত্তাপবহুল একান্তর পটি প্রয়োগে অত্যন্ত উপকার হয়। যদি বেদনার সঙ্গে প্রদাহ (inflama-tion) থাকে, তবে উত্তাপবহুল একান্তর পটি প্রয়োগ করাই কর্তব্য।

তরুণ সাইটিকা, পাকস্থলীর প্রদাহ (gastritis), স্নায়ুপ্রদাহ (neuritis) এবং চক্ষুর ও দাঁতের বেদনায় ইহা অত্যন্ত ফলপ্রদ।

শীত ও কম্প থাকিতে জ্বর রোগীর মেরুদণ্ডে বা তলপেটে এই পটি প্রয়োগে শীত ও কম্প নষ্ট হয় এবং অনেক সময় ঘামাইয়া রোগীর জ্বর ছাড়িয়া যায়।

লিভারের উপর এই পটি প্রয়োগে পিত্ত নিঃসরণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেই জন্য কোষ্ঠ বদ্ধতায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। এই পটির দ্বারা লিভারের বিষ ধ্বংস প্রভৃতি সর্ব প্রকার কর্ম ক্ষমতাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

তলপেটে (abdomen) ইহা প্রয়োগে অন্ত্রের পরিপাক ও মলনির্গমন ক্ষমতা এবং ক্লোমযন্ত্র (pancreas) ও প্লিহার কর্মক্ষমতাও যথেষ্টরূপ বাড়িয়া যায়। এই জন্য দেহকে দোষমুক্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক পুরাতন রোগীর লিভারের উপর ও তলপেটে অন্তত ৭ দিন উত্তাপ বহুল একান্তর পটি প্রয়োগ করা কর্তব্য।

অনেক সময় তলপেটে এই পটি প্রয়োগ করিবার অল্পক্ষণ পরেই মলের বেগ হয় এবং রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া যায়।

আমাশয়ে এই পটি অত্যন্ত ফলপ্রদ। তলপেটের উপর কিছুক্ষণের জন্য উত্তাপ বহুল একান্তর পটি প্রয়োগ করিয়া তাহার পর ভিজা কোমর পটি (wet girdle) প্রয়োগ করিলে অত্যন্ত কঠিন আমাশয়ও সহজে আরোগ্য

লাভ করে। বালীগঞ্জের শ্রীযুক্ত যতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি পুত্রের বেসিলারি ডিসেন্টি্ হইয়াছিল। আমি তাহার তলপেটে দিনে তিনবার উত্তাপ বহুল একান্তর পটি দিয়া তাহার পর বার বার পরিবর্তন করিয়া ভিজা কোমর পটি প্রয়োগ করিতে বলি। ইহাতে তিন দিনেই তাহার মল স্বাভাবিক হয় এবং জ্বর থামিয়া যায়।

দেহের বিভিন্ন স্থানে গরম ও শীতল জলের একান্তর পটি প্রয়োগে যে ফল হয়, দেহের আক্রান্ত অঙ্গের উপর গরম ও শীতল জলের ধারা দিলেও সেই ফলই হইয়া থাকে। লিভার ও প্লিহা বৃদ্ধিতে, দেহের কোন সন্ধিস্থল শক্ত হইয়া গেলে, কোন মাংসপেশী অসাড় হইয়া গেলে (in mascular paralysis), রক্ত শূন্যতার জন্য কোন অঙ্গ ফুলিয়া উঠিলে, বাত রোগের ফলে কোন অঙ্গ শক্ত হইয়া গেলে, পায়ের পুরাতন ক্ষতে, চাম মোটা হইয়া কোন কঠিন চর্মরোগ উৎপন্ন করিলে এবং মৃদু জ্বর প্রভৃতিতে শয্যাক্ষত নিবারণের জন্য ইহা প্রয়োগ করিয়া আশ্চর্য ফল পাওয়া যাইতে পারে। আমি একটি পাঞ্জাবী ভদ্রলোককে দেখিয়াছি, ম্যালেরিয়া জ্বরে তাহার প্লিহা ও লিভার অত্যন্ত বড় হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ গরম ও ঠাণ্ডা জলের ধারা দিনে দুইবার করিয়া সাত দিন দেওয়াতেই তাহার প্লিহা ও যকৃৎ স্বাভাবিক আকার ধারণ করে।

যদি সম্ভব হয় আক্রান্ত অঙ্গ পর্যায়ক্রমে গরম ও শীতল জলের ভিতর ডুবাইয়া রাখিলেও সমানই উপকার হয়। আমার আঙুলে একবার ভয়ানক বেদনাযুক্ত একটা ব্রণের মত হয়। ঐ ব্রণের জন্য হাত খানার অবস্থা এমন হয় যে, মনে হয়, হাত খানার ওজন এক সের বৃদ্ধি পাইয়াছে। যন্ত্রণাও এত হইতে থাকে যে, আমার পক্ষে তাহা সহ্য করা অত্যন্ত কঠিন হয়। আমি তখন একটা বাটিতে গরম জল ঢালিয়া তিন মিনিট কাল কব্জি পর্যন্ত সমস্ত হাত তাহাতে ডুবাইয়া রাখি। তাহার পরই হাত তুলিয়া আর একটা শীতল জলের বাটিতে ২০ সেকেণ্ড ডুবাইয়া

আবার গরম জলে ও ঠাণ্ডা জলে পর্যায়ক্রমে ডুবাইতে থাকি। এই ভাবে ১৫ মিনিট পর্যন্ত করিবার পরই আমার আঙুলের বেদনা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়া যায়।

এই যে বেদনা পড়িয়া গেল, কেন পড়িল? গরম জল পাইয়া একবার রক্ত আসিল, আবার ঠাণ্ডা পাইয়া প্রচুর দূষিত পদার্থ লইয়া চলিয়া গেল, ইহাই বেদনা পড়িয়া যাইবার কারণ।

একটি আঙুলের পক্ষে যাহা সত্য, সমস্ত দেহের পক্ষেও তাহাই। এই জন্যই হিপবাথ অথবা স্নানের পূর্বে ষ্টিমবাথ নিয়া, রৌদ্রে ঘুরিয়া, ব্যায়াম করিয়া অথবা মর্দন দ্বারা রক্তগুলি চর্ম পর্যন্ত টানিয়া আনিয়া তবে বাথ নিতে হয়। ইহাতে সমস্ত দেহে একটা পাম্পের কাজ হয় এবং দেহের বিভিন্ন বিজাতীয় পদার্থ তাহাতে দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়।

[৫]

বরফের ব্যবহার

তীব্র উত্তাপ যেমন যথাসাধ্য বর্জনীয়, অত্যধিক ঠাণ্ডাও তেমনি যথাসাধ্য বর্জন করা কর্তব্য। তথাপি সময় সময় যখন সাধারণ শীতল জলে দ্রুত কাজ হয় না, তখন বাধ্য হইয়া বরফের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু সর্বদাই পদ্ধতি অনুযায়ী বিশেষ সতর্কতার সহিত বরফ প্রয়োগ করা আবশ্যক। অন্যথা উপকারের পরিবর্তে অপকার হইবারই সম্ভাবনা।

নগ্ন চর্মের উপর কখনও বরফ বা বরফের থলি (ice bag) প্রয়োগ করিতে নাই। দেহের কোথাও বরফ প্রয়োগের সময় সর্বদাই প্রয়োগের স্থানে একখানা জলপটি (cold compress) বিছাইয়া তাহার উপর বরফ বা বরফের থলি প্রয়োগ করিতে হয়। অথবা এক খণ্ড ফ্লানেলের উপরও বরফের থলি রাখা যাইতে পারে। যদি বরফের জলে ডুবাইয়া

শীতল পটি দেওয়া হয় তবে তাহা অনাবৃত চর্মের উপরও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তাহাতে আইস ব্যাগ প্রয়োগেরি ফল হয়। ঐ অবস্থায় কয়েক মিনিট অন্তর অন্তরই পটি পরিবর্তন করিয়া দেওয়া আবশ্যক। যদি পটি পরিবর্তন করিবার ইচ্ছা না থাকে তবে ভাঁজে ভাঁজে বরফের টুকরা ছড়াইয়া দিলেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত পটি শীতল থাকে। বরফ ও বরফের থলি অপেক্ষা বরফ জলে ভিজান শীতল পটিতেই সর্বদা বেশী কাজ হয়।

ক্ষত হইতে রক্তস্রাব বন্ধ করিতে বরফ জলের শীতল পটির মত খুব কমই আছে। যখন সাধারণ শীতল পটিতে রক্ত বন্ধ হয় না তখন বরফ জলে শীতল পটি প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু শীতল পটির মতই ইহা যথেষ্টরূপ বড় হওয়া আবশ্যক। সন্ন্যাস রোগে মস্তিষ্কের ভিতর যখন কোন ধমনী ফাটিয়া যায় তখন মাথায় বরফের থলি প্রয়োগে রোগীর জীবন অনেক সময় রক্ষা পায়। পাকস্থলী হইতে রক্তবমনে ছোট ছোট টুকরা বরফ গিলিয়া খাইলে বিশেষ ফল হয়। মূত্রযন্ত্র (kidney) হইতে রক্তস্রাব হইলে পশ্চাদ্দেশে কোমরের উপর বরফের পটি প্রয়োগ করা কর্তব্য। অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব হইলে তলপেটের উপর বরফের থলি রাখিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। জরায়ু হইতে অত্যধিক রক্তস্রাব হইলে মূত্র দ্বার এবং মূত্রদ্বার ও গুহ্যদ্বারের মধ্যের অংশ (perineum) এবং কটিদেশে বরফজলে ভিজান শীতল পটি প্রয়োগে জরায়ু সঙ্কুচিত হয় এবং রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য ইহা অত্যন্ত সহজে দূর করে। প্রবল জ্বরের সময় রোগীর মাথায়, ঘাড়ে ও মুখের উপর বরফের পটি প্রয়োগ করিলে রোগীর অত্যন্ত উপকার হয়। পরিমিত সময়ের জন্য মাথায় বরফের পটি প্রয়োগ করিলে পাগলদের প্রবল উত্তেজনাও কমিয়া যায়। কিন্তু সর্বদাই অত্যন্ত সাবধানতার সহিত মাথায় বরফ দেওয়া আবশ্যক।

মাথায় অত্যধিক ঠাণ্ডা প্রয়োগে মাথার দিকে রক্ত চলাচল বন্ধ হয় এবং হৃৎপিণ্ডের কার্যে বাধার সৃষ্টি হয়। তাহার জন্য হৃৎপিণ্ডের পেশীগুলি সময় সময় অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে।

সাধারণ প্রদাহ রোগে এই পটি ব্যবহার করিয়া অত্যন্ত ফল পাওয়া যায়। মস্তিষ্কের প্রদাহে বরফের পটি অসীম উপকার করে। প্রদাহ যুক্ত ক্ষততেও ইহা প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। অর্শ রোগে গুহ্যদ্বার ক্ষত ও প্রদাহযুক্ত হইলে বরফের পটিতে অত্যন্ত উপকার হয়।

হিষ্টিরিয়া ও অঙ্গনৃত্য রোগের (chorea) অঙ্গ-বিক্ষোভ আর যখন কিছুতেই কমেনা, তখন মেরুদণ্ডে বরফের পটি প্রয়োগে তাহা অন্তর্হিত হয়।

পাকস্থলী অথবা তাহার ঠিক বিপরীত দিকে মেরুদণ্ডের উপর বরফের থলি রাখিলে প্রায়ই বমি বন্ধ হয়। পাকস্থলীর ক্যানসারে যে-অসম্ভব যন্ত্রণা হয়, তাহাও ইহা লাঘব করে।

মেরুদণ্ডের উপর বরফের থলি রাখিলে ধনুষ্টঙ্কার (tetanus), সমুদ্র পীড়া (sea-sickness) এবং মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড ঝিল্লীর প্রদাহে (cerebro-spinal meningitis) বিশেষ উপকার হয়।

ইরিসিপ্লাসের বিস্তার বন্ধ করিতে বরফের পটির মত আর কিছুই নাই।

অহিফেন ও অন্য বিষ খাওয়ার পর যখন রোগীর নাড়িস্পন্দন লোপ পায় এবং শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়, তখন নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী এবং ওষ্ঠের উপর বরফ প্রয়োগে রোগীর অবস্থা অনেক সময় স্বাভাবিক হয়। কারণ ঐ-স্থানে শৈত্য প্রয়োগে শ্বাসপ্রশ্বাস কেন্দ্র (respiratory centre) উত্তেজনা লাভ করে।

স্নায়ুশূলে বরফের থলি প্রয়োগে অনেক সময় যথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে।

পাড়া গাঁ প্রভৃতি স্থানে যেখানে বরফ পাওয়া যায় না, সেখানে বরফের পরিবর্তে খুব শীতল কাদা মাটি বা খুব শীতল জলে ভিজান নেকড়া চর্মের উপর ব্যবহার করা যাইতে পারে।

[৫]

কুলকুচা

গলার উপরে যে-কোন অসুখে কুলকুচার দ্বারা যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়। কানের বেদনা, দাঁতের বেদনা, মুখের অথবা জিহ্বার ঘা, সর্বপ্রকার মাথাধরা প্রভৃতি এবং মাথা ও মাথার যে-কোন অংশের যে-কোন অসুখে শীতল জলে কুল্লি করিলে যথেষ্ট ফল পাওয়া যাইতে পারে। যতক্ষণ জল গরম না হয়, ততক্ষণ জল মুখে রাখিয়া কুল্লি করিতে হয়। তাহার পর জল যখন গরম হইয়া উঠে, তখন জল ফেলিয়া দিয়া পুনরায় নূতন শীতল জল মুখে দিতে হয়। প্রতিবারে এক হইতে দেড় মিনিট কুলকুচা করাই যথেষ্ট। কিন্তু যতক্ষণ বেদনার সম্পূর্ণ উপশম না হয় ততক্ষণ কুলকুচা করা উচিত। যদি মুখে ঘা প্রভৃতি থাকে তবে কুলকুচা না করিয়া শীতল জল মুখে কতক্ষণ রাখিয়া ফেলিয়া দিলেও চলে।

পূর্বে প্রায়ই আমার মুখে ঘা হইত। আমি তাহাতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতাম। শেষে একবার মুখে ঘা হইলে আমি কতটুকু জল মুখে লইয়া কতক্ষণ রাখিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিলাম। দেখিলাম শীতল জল মুখে দেওয়ামাত্র মুখের বেদনা থাকে না। মুখে ঘা ছিল বলিয়া কুলকুচা করিতে পারি নাই। কিন্তু দিনে সাত আটবার তিন চার মিনিট করিয়া জল রাখিতেই দুই দিনে মুখের ঘা সারিয়া গেল। তাহার পর আরও দুই একবার এইরূপ ঘা হইয়াছে। তাহাও ঐ-ভাবে সারাইয়াছি। অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় ইহাই, ঐ-ভাবে সারাইবার পর, এখন আর মুখে ঘা হয়

না। ইহার অর্থ এই, রোগের যে মূল কারণ মুখের মধ্যে অবস্থিত ছিল, জলের সহিত তাহা বাহির হইয়া গিয়াছে।

আর একবার মাত্র অল্প কিছুদিন পূর্বে খাইতে খাইতে আমার মুখে বড় একটা শক্ত পাথরে জোরে কামড় পড়ে। এত জোরে কামড় পড়ে যে, তাহাতে আমার সামনের একটা দাঁত আলগা হইয়া যায়। দাঁতেও ভয়ানক বেদনা হইতে থাকে। আমি তখন উপরের দাঁত দিয়া নীচের দাঁত চাপিয়া ধরিয়া উঠিয়া আসি। কিন্তু বেদনা কিছুতেই যায় না। তখন মুখে কতক্ষণ পর্যন্ত জল রাখিয়া ফেলিয়া দিতে আরম্ভ করি। এইরূপে উপরের দাঁত দ্বারা নীচের দাঁত চাপিয়া রাখিয়া মাত্র দুই দিন মুখে কয়েকবার করিয়া শীতল জল রাখিয়া ফেলিয়া দেওয়াতেই দাঁত পূর্বের মত শক্ত হয় ও সমস্ত বেদনা তিন দিনের ভিতর কমিয়া যায়।

দশম অধ্যায়

রোগ চিকিৎসায় মাটি

[১]

রোগ-চিকিৎসায় জলের দ্বারা যে-উপকার হইয়া থাকে, অনেক সময় কাদা মাটির দ্বারাও সেই উপকার হয়। কোন কোন সময় জলপটি দ্বারা যখন খুব ভাল ফল হয় না, তখন কাদা মাটি প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল হয়। রোগের সময় দেহে যে অতিরিক্ত তাপের আবির্ভাব হয়, তাহা টানিয়া নিতে এবং দেহের বিষ শোষণ করিয়া নিতে মাটির মত আর কিছুই নাই। এই জন্য বিভিন্ন ভাবে দেহকে মাটির সংস্পর্শে আনিয়া বহু রোগ হইতে মুক্তি লাভ করা যাইতে পারে।

মাটিতে শয়ন

মাটিতে শয়ন করিলে দেহের সর্বাপেক্ষা অধিক স্থান মাটির সহিত সংস্পর্শে আসে, এই জন্য কোন কোন রোগে মাটিতে শয়ন বিশেষ ভাবে ফলপ্রদ হয়।

পিতৃমাতৃ-বিয়োগে আমাদের মাটিতে শুইবার ব্যবস্থা আছে। ক্রোধ ও শোকের সময় আমাদের দেহে একটা বিষের সঞ্চার হয়। মাটিতে শয়ন করিলে সেই বিষ মাটিতে অনেকটা টানিয়া যায়। এই জন্যই হয়তো আর্য ঋষিগণ এই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

যাঁহাদের শরীরে অত্যন্ত জ্বালা-পোড়া থাকে তাঁহারা প্রতিদিন কতক্ষণ পর্যন্ত মাটিতে শয়ন করিলে যথেষ্ট উপকার পাইতে পারেন।

অনেকের রাত্রে সুনিদ্রা হয় না। অনেক কষ্টে যদি তাহাদের ঘুম আসে, তাহাও কতকটা স্বপ্নবহুল তন্দ্রার মত হয়। এই সব রোগী মাটির উপর হালকা বিছানা করিয়া শুইলে অতি অল্প সময়েই অনিদ্রা রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

কাহারও কাহারও এইরূপ ধারণা আছে, মাটিতে শুইলে বুঝি ঠাণ্ডা লাগে। ইহা অত্যন্ত ভুল ধারণা। কিছুদিন মাটিতে শুইলে ফুসফুস অত্যন্ত সবল হয় এবং ফুসফুস সবল হইলে সর্দি, কাশি প্রভৃতি কিছুই হইতে পারে না। যাহাদের গলা দিয়া রক্ত পড়ে, তাহারা নিয়মিত মাটিতে শয়ন অভ্যাস করিলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়। যাহাদের সর্দি, প্লুরেসি ও যক্ষ্মা প্রভৃতি আছে তাঁহারা মাটিতে শুইয়া আশ্চর্য উপকার পাইতে পারেন।

অজীর্ণ, উদরাময় ও বহুমূত্র রোগেও মাটিতে শয়ন অত্যন্ত উপকারী।

যাহাদের হৃদ্রোগ আছে, মাটিতে শুইলে তাহাদের নাড়ির চঞ্চলতা কমিয়া যায় এবং নিশ্বাস ধীর ও দীর্ঘ হয়। এই জন্য সম্ভব হইলে সকলের পক্ষেই মাটিতে শোয়া উচিত। মাটিতে শুইলে যে দীর্ঘ জীবন লাভ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনেক শিশু আছে, অত্যন্ত কাঁদে। যদি কয়েকটা দিন তাহাদিগকে মাটিতে শোয়ান যায়, তবে দেখিতে দেখিতে তাহারা অত্যন্ত শান্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু যে-সকল শিশুর বয়স অন্তত ছয় মাস না হইয়াছে, তাহাদিগকে কখনই মাটিতে শোয়ান উচিত নয়।

রাত্রিতে ভূমিশয্যায় শয়ন করিলে যেরূপ হজমশক্তি বৃদ্ধি হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। ইহাতে জীবনীশক্তিও বৃদ্ধি পায় এবং সর্বপ্রকার রোগ আপনা হইতে দূরীভূত হয় (Adolph Just—Return to Nature, P. 88—102)।

কিন্তু মাটিতে শয়ন করিবার পূর্বে বিশেষভাবে ইহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, মাটি সেঁৎসেঁতে অথবা ভিজা না হয়। শুকনো ঠনঠনে

যে-মেজে তাহাতেই কেবল শয়ন করা চলিতে পারে। ঐরূপ মাটির উপর আর কিছু না দিয়াও শোয়া যায়। কেহ কেহ ইচ্ছা করিলে একখানা কম্বল তাহার উপর বিছাইয়া লইতে পারেন।

যাহারা মাটিতে শোয়া অভ্যাস করিবেন, তাঁহারা প্রথমেই অতি দীর্ঘ সময় মাটিতে শয়ন করিবেন না। প্রথম দিন পাঁচ সাত মিনিট হইতে আরম্ভ করিয়া শেষে যতক্ষণ সহ্য হয় এবং যতক্ষণ ভাল লাগে ততক্ষণই থাকিতে পারেন। কয়েক দিন মাটিতে শোওয়া অভ্যাস করিলেই, শেষে সমস্ত রাত্রি মাটিতে শোওয়া যাইবে। যাহারা মাটির উপর সামান্য শয্যা বিছাইয়া শয়ন করিবেন, প্রথম হইতেই তাঁহারা সমস্ত রাত্রি ভূমিশয্যায় যাপন করিতে পারেন। ভূমিশয্যা কথাটা অতি দীন, কিন্তু সুউচ্চ বহুমূল্য শয্যা হইতেও ইহা সহস্রগুণ অধিক মূল্যবান।

[২]

নগ্নপদে ভ্রমণের উপকার

যাহাদের মাটিতে শুইবার সুবিধা নাই, তাহারা নগ্নপদে মাটির উপর হাঁটিলে মাটিতে শুইবার ফল অনেকটা পাইতে পারেন। গরম মোজা পায় দিয়া থাকিবার পর যখন পা গরম থাকে তখনই মোজা খুলিয়া হাঁটিতে হয়। হাঁটা শেষ হইলেও তাড়াতাড়ি গরম মোজা পরিয়া আবার পা গরম করিয়া লওয়া আবশ্যক। সাধারণত ৪৫ মিনিট হইতে এক ঘণ্টা পর্যন্ত এইরূপ হাঁটিলেই চলে। প্রথম প্রথম আরও কম সময় হাঁটা উচিত। হাঁটা অভ্যাস হইয়া আসিলে সময় দীর্ঘ করা যাইতে পারে। ঘাস যখন শিশিরে ভিজিয়া থাকে তখন তাহার উপর হাঁটিতে পারিলেই সর্বাপেক্ষা অধিক ফল হয়। শীত ব্যতীত অন্যান্য ঋতুতে যখন ঘাসের উপর শিশির থাকে না, তখন বর্ষার জলে ঐরূপ হাঁটা যাইতে পারে।

ইহা দ্বারা মাথাধরা, গলাব্যথা, দীর্ঘদিনের সর্দি, পা ও মাথা ঠাণ্ডা

প্রভৃতি রোগ সহজে আরোগ্য হয় (Sebastian kueipp—My Water Cure, P. 20-21)। একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক আমাকে বলিয়াছেন, ছেলেবেলা হইতে তাঁহার সর্দি ছিল। ইহা তাঁহার বংশগত রোগ। খালি পায় মাঠে ভ্রমণ করিয়া এই দুরারোগ্য রোগের আক্রমণ হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

নগ্নপদে ভ্রমণ সর্বদাই অত্যন্ত উপকারী। কিন্তু পরিষ্কার স্থানের উপর হাঁটিলেই কেবল উপকার হইতে পারে। যে-স্থানে মলমূত্র প্রভৃতি থাকে সেখানে নগ্নপদে কখনও ভ্রমণ করা উচিত নয়।

আমাদের সংসারে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সর্বদাই কোলে করিয়া অথবা বিছনায় বসাইয়া রাখা হয়। ইহাতে উপকার অপেক্ষা তাহাদের অপকারই হয় বেশী। যদি তাহাদিগকে পরিষ্কার শুকনা মাটির উপর খেলিতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে তাহারা বহু সংখ্যক শিশুরোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। ধুলাবালি গায় মাখিয়া ছেলেদের খেলিতে দিলে দিন কয় পরই ছেলেদের স্বাস্থ্য দেখিয়া পিতামাতা আশ্চর্য হইবেন। কিন্তু তখন লক্ষ রাখা আবশ্যক যাহাতে তাহারা যাহা তাহা মাটি হইতে তুলিয়া মুখে দিতে না পারে।

[২]

মাটির পুলটিস

প্রাকৃতিক চিকিৎসায় মাটির সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহার হয়, পুলটিস অথবা কম্প্রেসে। প্যাক প্রভৃতিতে জলের যে-ব্যবহার, মাটির ব্যবহারও ঠিক তাহাই। কিন্তু ঐ-সকল অবস্থায় জল হইতে মাটি বহুগুণ অধিক কার্যকরী হয়।

এডলফ্ জুষ্ট বলিয়াছেন, Many a local trouble will flee from an earth compress as if by magic—মাটির কম্প্রেস

প্রয়োগে অনেক অসুখ যাদুমন্ত্রের মত আরোগ্য হইয়া যাইবে (Return to nature, P. 123)।

বিভিন্ন অঙ্গের অসুখে বিভিন্ন স্থানে মাটির পুলটিস প্রয়োগ করা যাইতে পারে। চিকিৎসার জন্য যে-মাটি ব্যবহার করিতে হয় তাহা একটু বিশেষ যত্ন পূর্বক সংগ্রহ করা উচিত। মল মূত্র কি অন্য কোনরূপ অপরিষ্কার না থাকে এমন স্থান হইতে মাটি সংগ্রহ করা কর্তব্য। মাটি অত্যন্ত বেলে বা আটাল হইবে না। ত্রি-চতুর্থ বেলে ও এক চতুর্থ আটাল হয়, এরূপ মাটি আবশ্যক। মাটি সর্বদাই নূতন হইবে। একবার সংগ্রহ করিয়া ঘরে মাটি ভাল ভাবে রাখিতে হইলে রৌদ্রে খুব ভাল করিয়া শুকাইয়া ঘরে রাখা কর্তব্য, অন্যথা সেই মাটিতে সাত দিনের বেশী ভাল কাজ হয় না। পুলটিস দেওয়ার সময় মাটিগুলি ভালরূপ ছানিয়া অবিকল মাখমের মত করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। মাটিগুলি ছানিয়া প্রথমে একখানা ভিজা নেকড়ার উপর অর্ধ ইঞ্চির কিছু বেশী উচু করিয়া সাজাইয়া রাখা যাইতে পারে। তাহার পর আস্তে আস্তে ঐ-নেকড়া খানা একহাতে তুলিয়া ঐ-মাটিগুলি এমন ভাবে রোগীর দেহের নির্দিষ্ট স্থানে রাখিতে হয় যে, চর্মের ঠিক উপরে মাটি পড়ে এবং নেকড়া মাটির উপরে থাকে। পূর্বেই মাটি এ-ভাবে সাজান আবশ্যক যেন মাটি নেকড়ার বাহিরে না যায় এবং দেহের উপর মাটি রাখিলে সর্বত্র মাটি যেন অর্ধ ইঞ্চি পরিমাণ উচু থাকে।

জল-পটির ন্যায় মাটির পুলটিসও ইচ্ছামত শীতল অথবা গরম পুলটিস রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

মাটির শীতল পুলটিস

যখন মাটির পুলটিস প্রয়োগ করিয়া পুনঃ পুনঃ পরিবর্তিত করিয়া দেওয়া হয়, তখন ইহা শীতল জলপটির কাজ করে। শীতল পটির মত ইহা অনাবৃত রাখিতে হয়, অথবা আবশ্যক হইলে একখানা ভিজা নেকড়া দ্বারা

বাঁধিয়া রাখা চলে। যেখানে শীতল পটিতে কাজ হয় না, সেখানেই মাটির পুলটিস ব্যবহার করা উচিত। কোন কোন সময় প্রথমেই মাটির পুলটিস ব্যবহার করা যাইতে পারে। যদি এই পটি সুদীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যবহার করার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে মাঝে মাঝে ঐ-স্থানে কয়েক মিনিটের জন্য গরম সেক প্রয়োগ করা আবশ্যক।

আগুনে পোড়া মাত্র কাদা মাটির পুলটিস দিলে কখনও ফোসকা পড়িতে পারে না। যদি কখনও ফোসকা পড়ে তাহাও মাটির পুলটিসে এক রাত্রির ভিতর মিলাইয়া যায়।

একবার কলীঘাটে শান্তি ঘোষাল নামক একটি যুবক ঠাকুরের আরতি করিতে যাইয়া ধুনচির আগুনে পা পোড়াইয়া ফেলে। আরতির নেশায় প্রথম সে বেদনা ততটা টের পায় নাই, তাহার পর আরতি শেষ হইলে দেখে, তাহার পায়ের নীচে কতকটা স্থান ফোস্কা পড়িয়া উচু হইয়া উঠিয়াছে। আমি তাহার পায় অনেকটা কাদামাটি বাঁধিয়া দেই। ঐ-কাদা মাটি পায় বাঁধিয়া সে শয়ন করিতে যায়। পরের দিন দেখা গেল, তাহার পায় ফোস্কার কোন চিহ্নই নাই!

আগুনে পোড়া ঘায়ে অনেক সময় জল পটিতে উপকার হইতে চায় না, সেই অবস্থায় শীতল কাদামাটিতে দ্রুত উপকার হয়।

ডাইরিয়া ও কলেরা রোগে পেট যদি গরম থাকে তবে মাটির পুলটিসে আশ্চর্য কাজ হয়। হাওড়া জেলার বাসন্তীকুমার চক্রবর্তী নামে একটি ভদ্রলোকের একবার কলেরা হয়। তাহার পাঁচ ছয় বার বমি ও দশ বারো বার দাস্ত হয়। শেষের দিকে দাস্তের সঙ্গে তাহার শুধু জল পড়িতে থাকে এবং হাতে পায় খিল ধরা আরম্ভ হইয়া যায়। রাত্রি একটা হইতে ভোর রাত্রি পর্যন্ত তাহার এই অবস্থা চলিতে থাকে। যখন অবস্থা অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক হইয়াছে, আমি তখন সংবাদ পাই। আমি যাইয়াই আর কিছু না করিয়া প্রথমেই কাদা মাটি আনাইয়া তাহার তলপেটে একটা

পুলটিস দেই। পেট তখন এত গরম যে, ২০ মিনিটের মধ্যে বরফের মত ঠাণ্ডা মাটি আগুনের মত গরম হইয়া উঠে। আমি পুনঃ পুনঃ মাটি বদলাইয়া দিতে থাকি। প্রথম বার মাটি দেওয়ার পর আর একবার মাত্র দাস্ত হয় এবং বমি যাদুমন্ত্রের মত তখনি বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু ইতিপূর্বেই তাহার খিচুনি আরম্ভ হইয়াছিল। তাহা তাহাকে ভয়ানক কষ্ট দিতে থাকে। তাহার হাত বার বার বাঁকিয়া আসিতেছিল। ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিলে অনেক সময় ইহা দুই তিন দিন পর্যন্ত থাকে; কিন্তু রৌদ্র উঠা মাত্র তাহার শয্যা বাহিরে টানিয়া লইয়া তাহাকে এমন ভাবে শোয়াইলাম, যেন কেবল তাহার হাত ও পা শুধু রৌদ্রে থাকে। তাহার পর কাপড় দিয়া তাহার হাত পা ঢাকিয়া দিলাম। তখন শীতকাল। ঘণ্টা খানেক হাত পা সে রৌদ্রে রাখিল। তাহাতেই তাহার অঙ্গক্ষেপ সারিয়া গেল। সেই দিন আমি তাহাকে শুধু নেবুর রস ও জলের উপর রাখিলাম। দুইদিন পরেই সে সুস্থ হইয়া উঠিল।

যাবতীয় শূল বেদনাতেও ইহা বিশব ভাবে উপকার দেয়। তলপেটে মাটির পুলটিস রাখিলে অধিকাংশ সময়েই আধ ঘণ্টার ভিতর কঠিন শূল বেদনা পড়িয়া যায়।

তলপেটে মাটির পুলটিস নাভির চার পাঁচ আঙুল উপর হইতে সমস্ত তলপেটের উপর দিতে হয়। কিন্তু পুলটিস খুব বড় করিয়া দেওয়া উচিত নয়।

মাটির গরম পুলটিস

মাটির শীতল পুলটিসের উপর ফ্লানেল দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিলেই তাহা গরম কম্প্রেচে রূপান্তরীত হয়। একখানা ফ্লানেল কয়েক ভাঁজ করিয়া পুলটিসটিকে এমন ভাবে ঢাকিয়া দিতে হয়, যেন মাটির সকল দিকে অন্তত এক ইঞ্চি পরিমাণ ফ্লানেল বাহিরে থাকে। তাহার পর একখানা নেকড়া

দ্বারা বায়ু চলাচল বন্ধ করিয়া তাহা বাঁধিতে হয়। কিন্তু এইরূপে তাহা বাঁধিতে নাই যাহাতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়। যতক্ষণ মাটি ভেজা থাকে, ততক্ষণই কম্প্রেচে কাজ হয়, মাটি শুকাইয়া গেলে আর হয় না। মাটির কম্প্রেচ সরাইয়া ফেলিয়া সর্বদাই কম্প্রেচের স্থান নাতিশীতোষ্ণ জলে ভিজান একখানা তোয়ালে দ্বারা রগড়াইয়া ধুইয়া ফেলিতে হয়। জলে ধুইয়া ফেলিয়া আবার কতক্ষণের জন্য গরম কাপড় প্রভৃতি ঢাকা দিয়া কম্প্রেচের স্থান একটু গরম করিয়া লওয়া আবশ্যক।

মাটির কম্প্রেচ অনেকক্ষণ পর্যন্ত রাখা যাইতে পারে এবং আবশ্যক মত দিনের মধ্যে কয়েকবার পরিবর্তন করিয়া লওয়া যায়। গুরুতর তরুণ ব্যাধিতে প্রথম প্রথম ইহা ঘন ঘন প্রয়োগ করিতে হয়। রাত্রিতে ইহা সমস্ত রাত্রির জন্যই রাখা যাইতে পারে।

ইহা হাত, পা, ঘাড়, কর্ণ, গলা, বুক, জননেন্দ্রিয়, মূত্রাশয়, লিভার, প্লিহা ও তলপেট প্রভৃতির উপর নির্ভয়ে প্রয়োগ করা যায়।

তলপেটের দূষিত অবস্থা দূর করিতে এবং নির্দোষ উপায়ে কোষ্ঠ পরিষ্কার করিতে তলপেটের মাটির গরম পুলটিস আশ্চর্য ভাবে কার্য করে। যেহেতু তলপেটের দূষিত অবস্থাই অধিকাংশ রোগের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ এই জন্য বহু রোগেই এই পুলটিস ব্যবহারে অত্যন্ত উপকার হয়। দেহের সাধারণ স্বাস্থ্যও ইহাদ্বারা অনেকটা উন্নতি লাভ করে। কিন্তু তলপেট গরম থাকিলেই কেবল এই পুলটিস ব্যবহার করা চলে।

জ্বরের সময় একাধারে রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার করিতে এবং জ্বর কমাইতে ইহার তুলা আর কিছুই নাই। ডেঙ্গু, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি যে কোন জ্বরে মাটির গরম পুলটিসে রোগীর যথেষ্ট উপকার হয়। ইহা রোগীর দেহের যথেষ্ট রোগ তাপ ও দূষিত পদার্থ টানিয়া নেয় এবং তলপেট ঠাণ্ডা হওয়ায় রীতিমত কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। তখন জ্বর আপনিই থামে।

টাইফয়েড প্রভৃতি জ্বরেও ইহা দ্বারা অল্প দিনে পেটের দোষ নষ্ট হয়

এবং তাহার জন্য জ্বর অতি সত্বর আরোগ্য লাভ করে। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়ের একবার টাইফয়েড হইয়াছিল। তাহার প্রথম জ্বরের সময় আমি কলিকাতা ছিলাম। শ্রীমান দেশে আমার মায়ের নিকট ছিল। মহকুমা সহরে যে-কয়জন ভাল ডাক্তার ছিল, মা তাহাদের সকলকেই ডাকিয়া শ্রীমানকে দেখাইলেন। কিন্তু ডাক্তারদিগের একান্ত যত্ন সত্ত্বেও চিকিৎসায় কোনই ফল হইল না। ইতিমধ্যে আমি বাড়ি গেলাম। তখন শ্রীমানের পেটের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। বার বার পায়খানা হইতেছে এবং মলের অস্বাভাবিক দুর্গন্ধ। জ্বরও তখন ১০৫°। আমার দুইটি জলচিকিৎসক বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া প্রথমেই আমি তলপেটে কাদামাটি দিলাম। তলপেট এত গরম ছিল যে, কাদামাটি পনের কুড়ি মিনিটের মধ্যে উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। ইহাতে জ্বর অনেক কমিয়া গেল। তাহার পর সমস্ত রাত্রির জন্য তাহার পেটে মাটি বাঁধিয়া রাখিতে লাগিলাম। ইহাতে অতি অল্প সময়ে তলপেটের সমস্ত দূষিত মল বাহির হইয়া গেল এবং মল স্বাভাবিক হইল। এই পটি প্রয়োগ করিবার ফলে দুইবেলা তাহার এমন স্বাস্থ্যকর মল নির্গত হইত যে, মল দেখিয়া কাহারো বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না যে, শ্রীমানের টাইফয়েড হইয়াছে। ইতিপূর্বে তাহার পেটফাঁপা ছিল। মাটির পুলটিসে পেটফাঁপাও মন্ত্রের মত মিলাইয়া গেল। তখন অবশিষ্ট রহিল জ্বর। জ্বর যখন খুব বৃদ্ধি পাইত তখন তলপেটে ভিজা নেকড়ার পটি দিয়া তিন চার মিনিট অন্তর অন্তর বদলাইয়া দিতাম। তলপেটে অর্ধ ঘণ্টা জলপটি দিতেই জ্বর দুই ডিগ্রির মত নামিয়া যাইত। ইহা ব্যতীত মাথা ধোয়াইয়া দেওয়া হইত এবং প্রতিদিন বার বার শীতল জলে গা রগড়াইয়া মোছাইয়া দেওয়া হইত। রোগী কিছুই খাইতে চাহিত না। জলের ভিতর নেবুর রস দিয়া প্রতি ঘণ্টায় অর্ধ গ্লাস করিয়া প্রচুর জল তাহাকে পান করান হইত এবং পথ্যের মধ্যে প্রধানত কমলা নেবুর রস দেওয়া হইত। প্রথম অবস্থায় রোগীর

অচেতন নিদ্রার মত (coma) ভাব ছিল। তাহার দুই চোখ সর্বদাই অর্ধ নিমিলিত থাকিত। অনেক ডাকাডাকি করিলে মাথা নাড়িয়া একটু সাড়া দিত শুধু। এইরূপ চিকিৎসা পাঁচ ছয় দিন চালাইবার পরই সে চোখ মেলিয়া চাহিল এবং তাহার পর তিন চার দিনের মধ্যেই উঠিয়া বিছানায় বসিতে পারিল। তখন তাহাকে কটিস্নানে বসাইতে লাগিলাম। জলে বসাইয়া রোগীর তলপেটে মৃদুভাবে হাত বুলাইয়া দেওয়া হইত মাত্র এবং কখনও জোরে ঘর্ষণ করা হইত না। তিন দিন কটিস্নান দিবার পর তাহাকে ক্রমনিম্নতাপে স্নান করান হইতে লাগিল। এইরূপ কয়দিন চিকিৎসা করার পরই তাহার জ্বর আরোগ্য হইয়া গেল এবং অল্পদিনেই সে সুস্থ হইয়া উঠিল।

বিভিন্ন জাতীয় ক্ষতরোগ একমাত্র মাটির গরম পুলটিসেই আরোগ্য হইতে পারে। নূতন ঘায়ে যেমন জলপটিই ভাল, পুরাতন ঘায়ে তেমনি মাটির পুলটিসই সর্বোত্তম। সাধারণ ঘা ইহাতে দুই তিন দিনেই সারিয়া যায়। কিন্তু ঘায়ের উপর ও ঘায়ের চারিদিকে কতকটা পর্যন্ত অর্ধ ইঞ্চি পুরু করিয়া মাটি দেওয়া আবশ্যক। মাটি সর্বদাই ক্ষতের অব্যবহিত উপরে প্রয়োগ করা কর্তব্য। মাটি ও ক্ষতের ভিতর নেকড়া প্রভৃতি কিছুর ব্যবধান রাখা উচিত নয়। ক্ষতের উপর মাটি প্রয়োগ করিবার সময় একটা মাটির নূতন হাঁড়িতে পুলটিসের মাটিটা এক ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া লওয়াই নিরাপদ। ক্ষতের উপর মাটি এক সঙ্গে দুই তিন ঘণ্টার বেশী প্রয়োগ করা উচিত নয়। এই ভাবে মাটি প্রয়োগ করিলে অতি কঠিন ক্ষতও অতি সহজে আরোগ্য লাভ করে। আমার ছোট বোনের ননদের পায় একবার ভিমরুলে দংশন করে। তাহা হইতে পায় একটা ক্ষত হয় এবং ক্ষতটা ক্রমশই বড় হইয়া অবশেষে একটা টাকার মত হয়। প্রথম হইতেই এ্যালোপ্যাথি মতে চিকিৎসা চলিতেছিল। পরে অন্যান্য ব্যবস্থা অনুযায়ী চিকিৎসা করা হয়, কিন্তু দীর্ঘ তিন মাসে কোনই উপকার হয়

না। অবশেষে আমার ভগ্নী কতকটা টাটকা কাদামাটি সিদ্ধ করিয়া তাঁহার পায় বাঁধিয়া রাখে। একান্ত আশ্চর্যের বিষয় ইহাই যে, পরের দিনই মাটি শুকাইয়া যায়।

ব্রণ, ফোড়া, দুষ্টব্রণ (carbuncle)প্রভৃতি অস্ত্র চিকিৎসা ব্যতীত কেবল মাত্র মাটির কম্প্রেচেই আরোগ্য হয়। মাটির পুলটিসের ফাঁকে ফাঁকে ফোড়ার উপর দিনে দুইবার ১০ মিনিটের জন্য গরম সেক প্রয়োগ করা উচিত।

কর্ণপ্রদাহ বা কর্ণমূলও ইহা দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে। একখানা নেকড়া দ্বারা কানের ছিদ্র বন্ধ করিয়া কর্ণের চতুর্দিকে অনেকটা কাদামাটি রাখিতে হয় এবং তাহায় উপর ফ্লানেল দিয়া ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। প্রত্যেক বার দুই তিন ঘণ্টা অন্তর পুলটিস পরিবর্তন করিয়া ঐ স্থানে ১০ মিনিটের জন্য গরম সেক প্রয়োগ করা আবশ্যক।

জল-চিকিৎসায় অন্যান্য প্রণালীর সহিত মাটির গরম পটি ব্যবহার করিলে বাঘি, উপদংশের ঘা, পচা ঘা (gangrene) বাতবিসর্প (erysipelas) এবং ক্যানসার প্রভৃতিও আরোগ্য হইতে পারে।

বিভিন্ন চর্মরোগে, বৃশ্চিক প্রভৃতির দংশনে, স্ফীতিতে, অথবা হাড় ভাঙিলে মাটির পুলটিসে বিশেষ ভাবে উপকার হয়।

যে কোন রূপ প্রদাহে ইহা মন্ত্রশক্তির মত কার্য করে। একবার আমাদের উঠানে একটা পুরানো তক্তাপোষ ভাঙিয়া রাখা হয়; তাহার একটা পুরানো পেরেক উচু হইয়া ছিল। একজন নূতন চাকর আসিয়া ঐ-তক্তাপোষটার উপর পা দিতেই ঐ-পুরানো পেরেকটা তাহার পায়ের ভিতর এক ইঞ্চির মত ঢুকিয়া যায়। সকলে আসিয়া টানিয়া পেরেক খুলে। কিন্তু তাহার যন্ত্রণার অবধি থাকে না। আমি সেইদিন এই ঘটনা জানিতে পারি নাই। পরের দিন আমি বাহির হইয়া যাইতেছি, দেখি ঐ-লোকটি বারান্দায় পা বাঁধিয়া বসিয়া আছে। আমি তাহার

কাছে যাইয়া ঘা দেখিলাম। ঘায়ের দুই দিকে সামান্য একটু চাপ দেওয়া মাত্র ক্ষত মুখ হইতে গল গল করিয়া পুঁজ বাহির হইয়া আসিল। তাহার পাও অনেকটা ফুলিয়া উঠিয়াছিল। একজন ভদ্রলোক কাছে ছিলেন। তিনি বলিলেন, 'এক্ষনি একে হসপিটালে পাঠিয়ে দিন।' আমি তাহাকে হসপিটালে যাইতে দিলাম না। তাড়াতাড়ি অনেকগুলি কাদা আনিয়া তাহার পায়ের উপরে ও নীচে সমস্ত দিকে নেকড়া দিয়া বাঁধিয়া দিলাম। ঘায়ের ব্যথায় সমস্ত রাত্রি লোকটি ঘুমাইতে পারে নাই। আধঘণ্টা পর পুনরায় ঐ-পথে আমি যখন ফিরিতেছি, তখন দেখিলাম, মাটির ঠাণ্ডা পাইয়া লোকটি ইহার মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বেলা বারটার সময় লোকটি ঘুম হইতে উঠিল। আমি তখন আর একবার তাহার মাটি বদলাইয়া দিলাম। রাত্রিতে শোয়ার পূর্বে আর একবার সে নিজেই মাটি বদলাইয়া লইল।

পরের দিন শয্যা ত্যাগ করিতে আমার অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। আমি ঘুম হইতে উঠিয়া আশ্চর্য হইয়া দেখি, সেই নূতন লোকটি উঠানে ঝাঁট দিতেছে। আমি বিস্মিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার ঘা কি হইল? সে তাহার আহত পা খানি তুলিয়া ক্ষতস্থানে জোরে জোরে চাপ দিয়া কহিল, 'কিছুই নেই আর—সেরে গেছে।'

ক্ষত স্থানে যে দূষিত পদার্থ থাকে, মাটির পুলটিস তাহা শুষিয়া লয়। এই জন্য যখন মাটির পুলটিস তুলিয়া লওয়া হয়, তখন তাহা হইতে একটা দুর্গন্ধ বাহির হয়। মাটির পুলটিস যে বিজাতীয় পদার্থ টানিয়া লয়, উহা তাহারই গন্ধ। উহা ক্ষত স্থান হইতে বিষ ও বিজাতীয় পদার্থ টানিয়া লয় বলিয়াই ক্ষত আরোগ্য হয়।

যথা সময়ে মাটির পুলটিস প্রয়োগ করিলে অস্ত্র করিবার কোনই আবশ্যক হয় না। অনেক সময় কেবল মাটির পুলটিস প্রয়োগ করিলেই অস্ত্র করার কাজ হয়। মৈমনসিংহ জেলার বিধুভূষণ নাহা নামে ১৭

বৎসরের একটি বালক একবার কলিকাতা আসে। দেশে থাকিতে ফালা দেওয়া একটা বাঁশের শলা তাহার পায়ের পাতার ভিতর গিয়া বসিয়াছিল। সে তখন তখনই তাহা টানিয়া ফেলে, কিন্তু উহাতে ঘা শুকায় না। সে বার বার ঔষধ দিয়া ঘা শুকায়, আবার ঘা হয়। পায়ে বেদনাও তার খুব থাকে এবং চলিতে বিশেষ কষ্ট হয়। একটি লোক পায়ের অবস্থা দেখিয়া পূর্বেই বলিয়াছিল যে, পায়ের ভিতর বাঁশের টুক্‌রা রহিয়াছে,—অস্ত্র করিয়া তাহা বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। কলিকাতা আসিয়া সে অস্ত্র করাইবার জন্যই প্রস্তুত হইল। কিন্তু কোথায় পায়ের ভিতর বাঁশের টুকরা আছে, তাহা বাহির করিতে ডাক্তারেরা কতটা কাটিবে, আবার ঐ-জন্য বিদেশে বিভূঁয়ে কতদিন তাহাকে বিছানায় পড়িয়া থাকিতে হইবে, তাহা ভাবিয়া সে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। আমি তাহাকে আশ্বাস দিয়া কতকটা মাটি আনিয়া তাহার পায়ের উপর দিয়া খুব ভাল ফ্লানেল দিয়া বাঁধিয়া দিলাম। দুই তিন রাত্রি এই ভাবে সে মাটি রাখিল। প্রতিদিন রাত্রি প্রভাত হইলে সে ঘা দেখাইতে আমার কাছে আসিত। একদিন আমি দেখি একটা বাঁশের টুকরার মাথা ঘায়ের ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছে। টুকরাটা যেন ঠিক মুখ বাহির করিয়া বলিতেছে, 'আমাকে টেনে বের কর।' ছেলেটাই নখ দিয়া ঐ-টুকরাটি টানিয়া আনিল। আমি দেখিলাম ঐ-টুকরাটি ত্রিচতুর্থ ইঞ্চি হইতেও দীর্ঘ। পরের দিন রাত্রেও তাহার পায় আবার মাটির কম্প্রেস দিয়া বাঁধিয়া দিলাম। আবার পরের দিন আশ্চর্য হইয়া দেখিলাম, আর একটি বাঁশের টুকরা ঘায়ের ভিতর দিয়া তেমনি মুখ বাহির করিয়া রহিয়াছে। ঐ-টুকরাটিও টানিয়া বাহির করা হইল। তাহাও পূর্বের টুকরার মতই দীর্ঘ। ইহার পর তিন চার দিন মাটির পুলটিস চালাইতে তাহার ঘা সম্পূর্ণ শুকাইয়া গেল। তাহার পর আর তাহার ঘা হয় নাই।

অন্যান্য রোগেও মাটির কম্প্রেসে বিশেষ উপকার হয়। মাথা ধরিলে

ঘাড়ের উপর মাটির কম্প্রেস দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। সাধারণ অবস্থায় ঘাড়ের উপর গামছা রাখিলেও চলে।

বিদ্যুৎ স্পর্শে অথবা সর্প দংশনে যাহাদের সংজ্ঞা লোপ পাইয়াছে, মাথা ও মুখ ব্যতীত গলা পর্যন্ত তাহাদের সমস্ত স্থান মাটির ভিতর পুতিয়া রাখিলে তাহারা অনেক সময় আরোগ্য লাভ করে। এইরূপ চিকিৎসায় অনেকে সত্যি সত্যি আরোগ্য লাভ করিয়াছে (**Adolph Just—Return to Nature, P. 120—126**)।

[৩]

অন্যান্য স্থানে মাটির ব্যবহার

আমাদের চর্ম সর্বদা পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। কিন্তু চর্ম পরিষ্কার করিবার জন্য আমরা যে-সমস্ত সাবান ব্যবহার করি তাহার মধ্যে চর্বি ও এলক্যালিন প্রভৃতি দূষিত পদার্থ থাকে। এই জন্য যাহারা অত্যধিক সাবান ব্যবহার করে, তাহাদের চামড়া ঢিলা হইয়া যায়। কিন্তু সাবান ব্যবহার করিয়া যে-উপকার লাভ করা যায়, গায় কাদামাটি মাখিলেও সেই উপকার হইতে পারে। মাঝে মাঝে কাদা মাখিয়া স্নান করিলে লোমকূপের বহির্দ্বার অত্যন্ত পরিষ্কার থাকে। কিন্তু কাদা যাঁহারা ব্যবহার করিবেন না, তাঁহাদের সাবান মাখাই উচিত। কারণ সকল অবস্থায় লোমকূপ পরিষ্কার রাখিতেই হইবে।

আমরা শৌচ করিয়া আসিয়া অর্ধ মিনিট মাত্র জল ও মাটি দ্বারা হাত পরিষ্কার করি। এই অল্প সময়েই জল ও মাটি হাতের সব মল ও দুর্গন্ধ নিঃশেষে ধোয়াইয়া লইয়া যায়। কাদা মাটির দ্বারা সমস্ত দেহ ঐরূপে ধুইয়া ফেলিলে দেহও সর্বপ্রকার আবর্জনা হইতে মুক্ত হইতে পারে।

যাহাদের মাথায় রুশি আছে, তাহারা মাঝে মাঝে কাদামাটি দ্বারা মাথা ধুইলে মাথা যথেষ্ট পরিষ্কার হইয়া যাইবে। পরিষ্কার মাথায় দীর্ঘদিন

রুখি কিছুতেই টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। কিন্তু মাটি যেন লোনা না হয়। লোনা মাটি ব্যবহার করিলে চুল উঠিয়া যাইতে পারে।

দন্ত-রোগ চিকিৎসায় বেলে মাটির মত দ্বিতীয় আর একটি উপকারী জিনিস নাই। দাঁতের এমন কোন ব্যাধি নাই প্রতিদিন বেলে মাটি দিয়া দাঁত মাজিলে যাহা আরোগ্য না হইতে পারে। দাঁত নড়া, মাঢ়ী ফোলা, দাঁতের বেদনা সমস্তই কেবল মাটির দ্বারা দাঁত মাজিলে আরোগ্য হইতে পারে। প্রথম প্রথম দুই বেলাই মাজা আবশ্যক। তাহার মধ্যে একবার অন্তত রাত্রিতে শয়নের পূর্বে হওয়া উচিত। কিছুদিন পর শেষে একবার মাজিলেই চলে।

আমার ছেলেবেলা দাঁত অত্যন্ত খারাপ ছিল। দাঁতের বেদনায় দীর্ঘ দিন আমি কষ্ট পাইয়াছি। আমার এই কষ্ট অত্যন্ত আশ্চর্যভাবে সারিয়া যায়।

আমি একদিন নদীর ঘাটে বসিয়া মুখ ধুইতেছি। তখন দেখিলাম, একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক সত্ত মুখ ধুইয়া উঠিলেন। বয়স তাহার পঞ্চান্নর কম হইবে না। কিন্তু আশ্চর্য হইয়া দেখিলাম, দাঁতগুলি তাহার পাথরের মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে। আমি কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার বয়স এত, তবু দাঁতগুলি এমন ঝক্ ঝক্ করছে, এর মানে কি?' ভদ্রলোক বলিলেন, তাঁহার দাঁত পূর্বে খুব খারাপ ছিল। তাঁহার দাঁতে বেদনা হইত, দাঁতের গোড়া ফুলিত, স্ফীত স্থানে চাপ দিলে পুঁজের মত কি বাহির হইত, ঠাণ্ডা জল তিনি মুখে রাখিতে পারিতেন না, ঘর্ষণ করিলে রক্ত বাহির হইত,—এই রকম কত কি হইত। অবশেষে একটি লোকের কথায় তিনি বেলে মাটি দ্বারা দাঁত মাজিতে আরম্ভ করেন। সাত আট দিন মাজিবার পরই তাঁহার দাঁতের সমস্ত অসুখ কোথায় মিলাইয়া যায়।

ভদ্রলোক তাঁহার নিজের রোগ সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, আমি

দেখিলাম, আমারও অবিকল তাহাই আছে। আমি সেই দিন হইতেই মাটি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলাম এবং অতি অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আমার দাঁতের সমস্ত অসুখ সারিয়া গেল। বর্তমানে এক মুহূর্তের জন্যও আমি বুঝিতে পারিনা যে, আমার দাঁত আছে।

কিন্তু কেবল দাঁত পরিষ্কার রাখিলেই দাঁতের অসুখ আরোগ্য হয় না। পেট পরিষ্কার রাখিলেই কেবল দাঁত নির্দোষ হইতে পারে। সমস্ত রোগ যে একই কারণ হইতে উৎপন্ন এবং রোগ যে কেবল একটাই আছে, ইহা হইতেই তাহা (unity of disease) প্রমাণিত হয়।

একাদশ অধ্যায়

চিকিৎসায় সতর্কতা

[১]

যেমন ঘরে আগুন লাগিলে, আগুন কিরূপ গতি নেয়, তাহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয়, তেমনি দেহে রোগের আবির্ভাব হইলেও রোগ কিরূপ অবস্থা নেয়, তাহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করা চলে না। বিশেষত জ্বর ও পেটের অসুখ প্রভৃতি রোগে কখন অপেক্ষা করা উচিত নয়। জ্বরের সময় জ্বর কিরূপ পরিণতি নেয়, তাহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিলে, দেহের রোগবিষ মস্তক, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি যে-কোন অঙ্গ আক্রমণ করিতে পারে।

প্রাকৃতিক চিকিৎসায় রোগ নির্ণয়ের জন্য খুব বেশী অপেক্ষা করিবার আবশ্যক হয় না। দেহ-সঞ্চিত বিষই হউক অথবা জীবাণু হইতে উৎপন্ন বিষই হউক অথবা উভয়ই হউক, কতগুলি বিষ সঞ্চিত হওয়ার জন্যই দেহে বিভিন্ন জাতীয় রোগ উৎপন্ন হয়। সুতরাং দেহের যে-কোন রোগেই কাল বিলম্ব না করিয়া দেহের সেই দূষিত অবস্থা দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত। দেহে দূষিত পদার্থের অবস্থিতির নামই রোগ। সুতরাং দেহের দূষিত অবস্থা দূর করিবার যে চেষ্টা, তাহাই রোগের একমাত্র চিকিৎসা। উহা দূর করিয়া দিলেই অধিকাংশ রোগ আপনা হইতে আরোগ্য হয়। সেই জন্য বহু রোগ কেবল ষ্টিমবাথ, হিপবাথ প্রভৃতি দেহের সাধারণ চিকিৎসা দ্বারাই আরোগ্য লাভ করে।

সর্বপ্রকার পুরাতন ব্যাধিতে ষ্টিমবাথ, হিপবাথ, প্রভৃতির দ্বারা দেহের সাধারণ চিকিৎসা করিয়া তবে বিশেষ অঙ্গের চিকিৎসা করা উচিত। তরুণ ব্যাধিতেও দেহের সাধারণ চিকিৎসা করিয়া তাহার পর রোগের বিশেষ প্রকাশের দিকে দৃষ্টি দিলে, রোগ অতি অল্প সময়ে আরোগ্য হয়।

প্রাকৃতিক চিকিৎসায় সর্বদাই রোগীর দেহের চিকিৎসা করা হয়, রোগের চিকিৎসা করা হয় না। কোন রোগীর বেদনা হইয়াছে, আমরা একটা ঔষধ ইনজেক্ট করিয়া বেদনা বন্ধ করিতে পারি। তাহাতে বেদনা আরোগ্য হয়, কিন্তু রোগী আরোগ্য হয় না। রোগী সত্বরই তীব্রতর বেদনায় অথবা অন্য রোগে আক্রান্ত হয়। কিন্তু ষ্টিমবাথ প্রভৃতির দ্বারা যদি রোগীর দেহ দোষমুক্ত করা যায়, তবে রোগ আপনি আরোগ্য লাভ করে।

সম্ভব হইলে সকল রোগেই রোগীর সর্বদৈহিক (general treatment) করা উচিত। কারণ দেহে যে বিজাতীয় পদার্থের সঞ্চয় হইয়াছে, রোগই তাহার নিশানা। বিভিন্ন রোগই দেহে অবস্থিত বিজাতীয় পদার্থের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। সুতরাং যে-কোন রোগেই ঘর্ম-স্নান, হিপবাথ ও স্নান বা স্পঞ্জিং প্রভৃতির দ্বারা দেহ দোষ-মুক্ত করা উচিত। তাহাতে রোগ কখনও বৃদ্ধি পাইতে পারে না, রোগ সহজে আরোগ্য হয় এবং আরোগ্যের পর খুব সকালে নূতন কোন রোগ হওয়াও কঠিন হয়। জল-চিকিৎসায় যখন একটি পয়সাও খরচ নাই, তখন অসুখ হইলেই এইরূপ সর্বদৈহিক চিকিৎসা করা চলিতে পারে।

সময় সময় কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি ব্যাপক ব্যাধির আবির্ভাব হয়। বিশেষ এক প্রকার আবহাওয়ায় বিশেষ এক প্রকার রোগ-জীবাণুর দেহে বিস্তার লাভ করিবার সুবিধা ঘটে। কিন্তু দেশে রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়া মাত্র যদি ঐ-সমস্ত ব্যবস্থা দ্বারা দেহকে দোষ-মুক্ত করা যায় এবং কিছুদিন হিপবাথ ও দুই বেলা পূর্ণ-স্নান গ্রহণ করা যায়, তবে কোন রোগ-

জীবাণুই দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। মহামারী নিবারণের এবং মহামারীর ভিতর নিজেকে সুস্থ রাখিবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়।

তথাপি সকল রোগে সর্বদৈহিক চিকিৎসার আবশ্যক হয় না। বহু রোগেই কেবল আক্রান্ত অঙ্গের চিকিৎসায় রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে।

প্রকৃতি দেহের বিভিন্ন স্থানে সঞ্চিত বিজাতীয় পদার্থ বিভিন্ন উপায়ে দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। সেই জন্য সমস্ত চিকিৎসার উদ্দেশ্য যদিও কেবল বিজাতীয় পদার্থ হইতে দেহকে মুক্ত করা, তথাপি প্রকৃতির রোগ প্রকাশের বিভিন্ন পদ্ধতিব প্রতি দৃষ্টি বাখিয়াই বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিজাতীয় পদার্থ দুর করিবার চেষ্টা করা উচিত।

রোগীর দেহের অবস্থাও বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিতে হয়। কোন প্রক্রিয়া করিবার পূর্বেই বিশেষ করিয়া বুঝিয়া লওয়া কর্তব্য, রোগীর বর্তমান দেহের অবস্থায় সেই প্রক্রিয়া চলিবে কিনা অথবা রোগীর তাহা সহ্য হইবে কিনা। যেমন জ্বব যদি তিন, চাব, পাঁচ থাকে, তবে কখনও ষ্টিমবাথ দিতে নাই, আবার দেহের উত্তাপ যদি ৯৫°তে নামিয়া যায়, তখনো হিপবাথ দেওয়া উচিত নয়।

এই জন্য রোগের বিভিন্ন প্রকাশ এবং বোগেব বিভিন্ন অবস্থায় প্যাক, ব্যাণ্ডেজ, জলপটি প্রভৃতি রোগবিষ টানিয়া লইবার বিভিন্ন পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

[২]

কিন্তু বাথ প্রভৃতি সর্বদাই ঠিক ঠিক মত নিয়মানুযায়ী লওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে উপকার তো হয়ই না, অপকারও হইতে পারে।

হিপবাথ অথবা পূর্ণস্নান প্রভৃতি সকল প্রকার শীতল স্নান (cold

bath) গ্রহণ করিবার সময়ই বিশেষ ভাবে লক্ষ রাখা আবশ্যক, শরীরটা গরম আছে কিনা। শীতল জলের স্পর্শে রক্ত ভিতরে চলিয়া যায়, এই রক্ত যখন চর্মে না থাকে অর্থাৎ শরীর যখন গরম না থাকে, তখন কোন অবস্থাতেই শীতল বাথ গ্রহণ করিতে নাই। ঐরূপ অবস্থায় স্নান করিয়া অনেকে সমস্ত জীবনের জন্য শরীরটি নষ্ট করিয়াছেন। এই জন্য শরীর যখন গরম থাকে এবং দেহের প্রত্যেক রক্তকণা পর্যন্ত শীতল জলের স্পর্শ চায়, তখন শীতল জলে বাথ নিলেই সর্বাপেক্ষা বেশী উপকার হয়। যদি শরীর গরম থাকে, তবে শীতল জলে স্নান করিলে কোন অনিষ্টই হইতে পারে না। এমন কি, যখন শরীর হইতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ঘাম পড়িতে থাকে, তখন স্নান করিলেও না। ফিনল্যাণ্ডারেরা তাহাদের ঘর্মগৃহ (sweat house) হইতে ঘর্মাক্ত দেহে বাহির হইয়াই বরফের উপর গড়াইয়া পড়ে। তাহাতে তাহাদের কোন অসুখই হয় না (J. H. Kellogg, M. D.—The home book of modern medicine, p. 634)।

যদি স্নানের সময় শরীর গরম না থাকে, তবে পূর্বে শরীরটাকে ভাল করিয়া গরম করিয়া লইয়া তাহার পর বাথ গ্রহণ করা আবশ্যক। এই জন্য সুস্থ দেহে অল্প কতক্ষণ ব্যায়ামের পর শরীরটা গরম হইলে তাহার পর স্নান করা চলিতে পারে। দুর্বল রোগীরা ৩ হইতে ৭ মিনিট কাল মৃদু ষ্টিমবাথ গ্রহণ করিয়া তাহার পর হিপবাথ গ্রহণ করিলে তাহা অত্যন্ত ফলদায়ক হয়। অথবা রোগী মাথাটিকে ছায়াতে রাখিয়া অথবা মাথার উপর ভিজা তোয়ালে জড়াইয়া ৫ হইতে ১৫ মিনিট সূর্যতাপ গ্রহণ করিয়া দেহ উত্তপ্ত হইলে তাহার পর স্নান করিতে পারেন। যখন সূর্যতাপ না থাকিবে, তখন সমস্ত দেহ একটু মর্দন করিয়া দেহ উষ্ণ হইলেও বাথ নেওয়া যাইতে পারে। রোগী যদি শয্যাশায়ী হয়, তবে মেরুদণ্ডে অথবা তলপেটে ১৫ মিনিটের জন্য সেক দিয়া তাহার পর

তাহাকে বাথ দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু দেহ এক বার গরম করিয়া শরীর পুনরায় ঠাণ্ডা হইবার পূর্বেই দেহ গরম থাকিতে থাকিতে রোগীকে বাথ দেওয়া কর্তব্য। গ্রীষ্মকালে দেহ যখন স্বভাবতই উত্তপ্ত থাকে তখন সাধারণত কোনরূপ গরম করিবার আবশ্যক হয় না এবং সুস্থকায় ব্যক্তিগণ শরীর ঠাণ্ডা না থাকিলেই সর্বপ্রকার স্নান গ্রহণ করিতে পারেন। যে-সমস্ত রোগীর জ্বর আছে, তাহাদেরও দেহকে উত্তপ্ত করিবার আবশ্যক হয় না। কারণ তাহাদের দেহে যথেষ্ট তাপ বর্তমান থাকে। কিন্তু জ্বরের 'শীতল অবস্থায়' অর্থাৎ যখন রোগীর শীত ও কম্প থাকে, তখন কোন অবস্থাতেই তাহাকে হিপবাথ বা পূর্ণ-স্নান প্রভৃতি শীতল বাথ প্রয়োগ করিতে নাই।

স্নানের পূর্বে শরীরটাকে যেমন গরম করিয়া লওয়া আবশ্যক, তেমনি স্নানের পরই আবার শীতল চর্মে তাপ ফিরাইয়া আনা প্রয়োজন। স্নানের পর দেহটাকে কখনও শীতল অবস্থায় ফেলিয়া রাখিতে নাই। অনেক সময় স্নানের পর রোগীদের যে-খারাপ ফল দেখা দেয়, তাহার কারণ ইহাই। এই জন্য রোগীদিগকে স্নান করাইয়াই একখানা শুষ্ক তোয়ালে কি পরিষ্কার বিছানার চাদর দেহের উপর ফেলিয়া দ্রুতহস্তে সর্বদেহ ভাল করিয়া মোছাইয়া দিতে হয়। তাহার পরই তাহার সমস্ত দেহ ঘর্ষণ করিয়া গরম করিয়া দেওয়া বিশেষ ভাবে আবশ্যক। ইহার পরও রোগীকে শয্যায় নিয়া গলা পর্যন্ত কম্বল প্রভৃতি দিয়া ঢাকা দিয়া দেহের তাপ ফিরাইয়া আনা কর্তব্য। যদি কখনও স্নানের পর রোগীর শীত ও কম্প উপস্থিত হয়, তবে রোগীকে এক গ্লাস গরম জল পান করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু রোগীর দেহ যেন অত্যন্ত বেশী অথবা অত্যধিক দীর্ঘ সময়ের জন্য গরম করা না হয়। তাহা হইলে স্নানের উপকারিতা নষ্ট হইতে পারে। মোটকথা হিপবাথ, পূর্ণস্নান প্রভৃতি সর্বপ্রকার

শীতল স্নানের (cold bath) পরই চর্মের তাপটা ফিরাইয়া আনা আবশ্যক। এই জন্য যতটুকু করা প্রয়োজন তাহা করাই যথেষ্ট।

স্নানের পূর্বে ও পরে এই ভাবে শরীরটাকে গরম করিয়া লইলে দেহের রক্ত বার বার চর্মে আসে এবং বার বার ভিতরে চলিয়া যায়। দেহের রক্ত এই ভাবে সমস্ত দেহ পরিভ্রমণ করিয়া দেহের প্রত্যেক অংশে দেহ গঠনের মসলা ও পুষ্টি বহন করিয়া নেয় এবং আবার যখন ফিরিয়া আসে তখন দেহের সর্বস্থান হইতে দূষিত ও অব্যবহার্য পদার্থ কুড়াইয়া আনিয়া দেহের বিভিন্ন নরদমা দিয়া বাহির করিয়া দেয়। রক্তের যাতায়তে আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির ভিতরও একটা পাম্পের মত কাজ হয়। এই জন্য পদ্ধতি অনুযায়ী স্নানের পর সমস্তগুলি যন্ত্রই চরম উদ্দীপনা লাভ করে।

আবার উষ্ণ স্নানের পর কখনও ঘর্মাক্ত অবস্থায় রোগীকে পরিত্যাগ করিতে নাই। তাহাতে উত্তাপের প্রতিক্রিয়ায় রোগীর ঠাণ্ডা লাগিবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য ষ্টিমবাথ প্রভৃতির পরই সর্বদা রোগীকে হিপবাথ প্রভৃতি দিয়া তাহার দেহ শীতল করিয়া লইতে হয়।

সর্বপ্রকার উষ্ণ স্নানের শেষে বাথের উত্তাপ ক্রমশ কমাইয়া আনা কর্তব্য। তাহা হইলে ঠাণ্ডা লাগিবার কখনও ভয় থাকে না।

যখনই কোন বাথ দেওয়া হইবে, তখনই তাহার উত্তাপ এরূপ হওয়া আবশ্যক, যেন ঐ উত্তাপ রোগীর প্রীতিপ্রদ হয়। প্রত্যেকটি চিকিৎসাই রোগীর পক্ষে এইরূপ হইবে, যেন তাহা তাহার পক্ষে কষ্টকর না হয়। প্রত্যেক প্রক্রিয়ায় রোগী আরাম পাইবে এবং কখন যে আরোগ্য হইয়া উঠিবে, তাহা নিজেই বুঝিতে পারিবে না, যদি এইরূপ হয়, তবেই ঠিক চিকিৎসা হইল বুঝিতে হইবে।

সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, আহারের তিন ঘণ্টা পূর্বে কি পরেই কেবল অতি উষ্ণ বাথ নেওয়া যাইতে পারে। এই নিয়ম কখনও লঙ্ঘন করিতে নাই ; কিন্তু আংশিক বাথ, যেমন সেক, গরম পটি (heating com-

press) প্রভৃতি আহারের এক ঘণ্টা পূর্বে বা পরে নেওয়া যাইতে পারে। মৃদু সেক অথবা তলপেট ব্যতীত অন্য স্থানের প্যাক স্বল্লাহারের অব্যবহিত পর নিলেও কোন ক্ষতি হয় না। শীতল স্নানও আহারেব পর তিন ঘণ্টার মধ্যে গ্রহণ করিতে নাই এবং শীতল স্নানের পর চর্মে পুনরায় উত্তাপ ফিরিয়া না আসিতে আহার করিতে নাই।

এমন স্থানে বসিয়া এই সব বাথ গ্রহণ করা উচিত, যেখানে দমকা হাওয়া গায় না লাগে। রোগীর গায় কখনও দমকা হওয়া লাগা উচিত নয়। কিন্তু কখনও দরজা জানালা বন্ধ করিয়া বাথ গ্রহণ করিতে নাই। ঘরের কয়েকটা জানালা অবশ্যই খোলা কর্তব্য।

যে-সমস্ত রোগী অত্যন্ত শিশু, বৃদ্ধ অথবা দুর্বল, কখনও তাহাদিগকে অতি উষ্ণ অথবা অতি শীতল চিকিৎসা করিতে নাই। ঐ-সমস্ত রোগীকে ষ্টিম বাথের পরিবর্তে ভিজা চাদরের প্যাক অথবা তাহারও পরিবর্তে মধ্যকায়ের প্যাক এবং হিপবাথের পরিবর্তে প্রয়োজনানুসারে সিজবাথ বা ভিজা কোমর পটি দেওয়া উচিত। দেহ শীতল করিবার জন্য সিজ বাথ এবং কোষ্ঠ পরিষ্কারের জন্য ভিজা কোমর পটি প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

যে-কোন বাথই গ্রহণ করা হউক না, জল যতদূর সম্ভব নির্মল হইবে। একবার যে-জল ব্যবহার করা হইয়াছে কখনই তাহা পুনরায় ব্যবহার করা উচিত নয়।

নেকড়া প্রভৃতি ভাল করিয়া সাবান দিয়া ধুইয়া অথবা সিদ্ধ করিয়া তাহা পুনরায় ব্যবহার করা উচিত। এই নিমিত্ত রোগীর জন্য দুই তিন সেট নেকড়া প্রভৃতি রাখা কর্তব্য। ফ্লানেল প্রভৃতি কখনও সিদ্ধ করিতে নাই। এক জনের ব্যবহৃত ফ্লানেল অপরকে দিবার পূর্বে ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রিঠা প্রভৃতি দিয়া কাচিয়া দেওয়া উচিত।

ঠিক ঠিক পদ্ধতি মত রোগীর চিকিৎসা করিলে জল চিকিৎসায় রোগীর

কখনও খারাপ হইতে পারে না। কিন্তু যদি কখনও খারাপ হয়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে, চিকিৎসা ঠিক ঠিক হয় নাই। তখন অবিলম্বে চিকিৎসা বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য।

যদি প্যাক অথবা বাথ প্রভৃতি কখনও রোগীর পক্ষে অসুবিধাজনক হয়, তাহা হইলেও তৎক্ষণাৎ তাহা সেই সময়ের জন্য বন্ধ করা আবশ্যক (F. E. Bilz—The Natural Method of Healing p. 67)।

এক সঙ্গে অনেকগুলি প্রক্রিয়া করিয়া রোগীকে কখনও অস্থির করিয়া তুলিতে নাই। একটি প্রক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া দেহের উপর শেষ হইলেই রোগীকে কিছু অবসর দিয়া তাহার পর অন্য কিছু করা যাইতে পারে। সাধারণত দিনে দুই তিনটি প্রক্রিয়াই যথেষ্ট। মনে রাখিতে হইবে, প্রকৃতির যাহা ক্ষমতা আছে, তাহার বেশী তাহাকে দিয়া করান যায় না।

প্রথম প্রথম ছোট ছোট উপায়ে রোগের কারণ দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত। যদি সহজ উপায়ে রোগ আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে বড় বড় উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

অনেক সময় জল-চিকিৎসায় পুরাতন ব্যাধি বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহার জন্য ভয় পাইতে নাই। অথবা চিকিৎসা বন্ধ করিতে নাই। ঔষধের দ্বারা চাপা দেওয়ায় অথবা অন্য কারণে দেহের রোগ আরোগ্যের শক্তি যখন একান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তখন রোগ পুরাতন ব্যাধিতে (chronic disease) পরিণত হয়। পুরাতন ব্যাধি অর্থই দুর্বল তরুণ ব্যাধি। জল-চিকিৎসা চালাইতে চালাইতে যখন রোগীর জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি পায়, তখন প্রকৃতি অনেক সময় প্রবল ব্যাধি (acute disease) সৃষ্টি করিয়া রোগের কারণ দেহ হইতে বিতাড়িত করে। রোগ বাড়িয়া তখন আপনি কমে। চিকিৎসা-শাস্ত্রে ইহাকে বলে,—curative crisis। কিন্তু ভুল চিকিৎসাকে যেন curative crisis বলিয়া মনে না করা হয়।

অনেক সময় রোগীর অনেক যাপ্য ব্যাধি জল-চিকিৎসার সময় আত্ম-প্রকাশ করে, কিন্তু ভয় না পাইয়া জল-চিকিৎসা নিয়মানুযায়ী চালাইয়া গেলে, সেই সকল যাপ্য রোগ ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করিয়া বাহির হইয়া যায়। এই জন্য জল-চিকিৎসার পর রোগী সর্বতোভাবে সুস্থ হয়। বালীগঞ্জে একটি শিশুর গায় হাম উঠিয়াছিল। ঐ-হাম বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তাহার আমাশয় হয়। আমি আমাশয়ের চিকিৎসা করিবার সময় তাহার হাম আবার ভাসিয়া উঠে। হাম দিন দুই থাকে, তাহার পর আমাশয় যায়, হামও যায়।

রোগীর দেহের উত্তাপ সর্বদাই দুই তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর পরীক্ষা করা উচিত। কিন্তু রোগী ঘুমাইলে কখনও তাহাকে জাগাইয়া থারমোমিটার দিতে নাই। বাড়ীতে থারমোমিটার না থাকিলে রোগীর নাড়ীর স্পন্দন গণিয়াই উত্তাপ পরীক্ষা করিতে হয়। সুস্থ শিশুর নাড়ি মিনিটে ১৪০ বার স্পন্দিত হয়, বালকের ১২০ বার, যুবকের ৭৫, বৃদ্ধের ৭০।৮০ বার। স্বাভাবিক ৯৮° ডিগ্রির অধিক প্রতি এক ডিগ্রি অধিক উত্তাপে প্রায় ১০ বার অধিক স্পন্দন হয়। যুবকের জ্বর ৯৯° হইলে তাহার নাড়ি মিনিটে ৮৫ বার স্পন্দিত হইবে।

রোগীকে সর্বদা বিশ্রাম দিতে হইবে এবং রোগী যাহাতে কোনরূপে উত্তেজিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেহ যখন শান্ত থাকে তখনই প্রকৃতি তাহার ভিতর তাহার সংস্কার কার্য করিতে পারে। বহুরোগ কেবল বিশ্রামের দ্বারাই আরোগ্য হয়। পেটের অসুখ কেবল না খাইয়া নিদ্রা গেলেই আরোগ্য হইতে পারে। রোগীকে কোন অবস্থাতেই নিদ্রার সময় জাগান উচিত নয়।

জনসাধারণ চিকিৎসা বলিতে ঔষধ খাওয়াই বোঝে। কিন্তু শুশ্রূষাই রোগের প্রধান চিকিৎসা। রোগীর ভাল শুশ্রূষা চলিলে রোগ সহজে আরোগ্য হয়।

রোগীও যেন ফাঁকি দিয়া রোগ আরোগ্য করিতে না চায়। প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করার জন্যই রোগ হয়। উপবাস প্রভৃতির দ্বারা সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেই তবে রোগ সারে। ঔষধ খাইয়া, ওঝা ডাকিয়া অথবা মাদুলি লইয়া প্রকৃতির শাসনকে কখনও ফাঁকি দেওয়া যায় না।

[৩]

যে মূলনীতি অনুসারে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়, স্ত্রীরোগেও সেই নীতি সমভাবে প্রযোজ্য। ভগবান নারীদিগকে সন্তানধারণের উপযোগী করিয়া পৃথকভাবে গড়িয়াছেন। এই জন্য নারীদিগের কতগুলি বিশেষ অসুখ আছে। কিন্তু দেহের অন্যান্য স্থানে যে-কারণে অসুখের সৃষ্টি হয়, নারীদিগের গর্ভাশয় প্রভৃতিতেও অসুখ সেই কারণেই উৎপন্ন হয়। কোন স্ত্রীলোকের জরায়ু প্রভৃতির রোগ হইলেই বুঝিতে হইবে, তাহার দেহে বিশেষত তলপেট অথবা তাহার সন্নিকটবর্তী কোন অংশে বিজাতীয় পদার্থ সঞ্চিত হইয়াছে। সুতরাং ষ্টিম-বাথ, হিপ-বাথ এবং তলপেটে মাটির পুলটিস প্রভৃতির দ্বারা সেই বিজাতীয় পদার্থ দূর করিয়া দেওয়াই স্ত্রী-রোগের প্রধান চিকিৎসা।

স্ত্রীলোকদিগের স্বল্পরজঃ রোগ, বাধক বেদনা, অত্যধিক রক্তস্রাব, গর্ভাবস্থায় উদরাময়, কষ্টপ্রসব এবং গর্ভাবস্থায় গা বমি বমির মত ভাব প্রভৃতি রোগ দিনে দুইবার হিপ-বাথ এবং দুইবার সিজ-বাথেই মন্ত্রের মত আরোগ্য হইতে পারে। ইহার সঙ্গে প্রতিদিন অন্তত দুই ঘণ্টার জন্য একবার করিয়া তলপেটে মাটির ব্যাণ্ডেজ দিলে অত্যন্ত উপকার হয়।

স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা রোগে, ডিম্বাশয়ের প্রদাহে, ঋতু প্রকাশের বিলম্বে অথবা ঋতু রোধে মধ্যে মধ্যে ভিজা কোমর পটি (wet-girdle) ও মাটির ব্যাণ্ডেজের সহিত সিজ-বাথ, হিপ-বাথ ও পূর্ণস্নান সমস্ত রোগ আরোগ্য করিতে পারে।

যে-সকল স্ত্রীলোকের স্বভাবত গর্ভস্রাব হয়, তাহারা নিয়মিত হিপ-বাথ লইলে, ভিজা কোমর পটি গ্রহণ করিলে এবং প্রতিদিন রীতিমত স্নান করিলে এই শোচনীয় ব্যাধি হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

গর্ভাবস্থায় রক্তস্রাব হইলে, কেবল তলপেটের মাটির পুলটিসেই রক্ত বন্ধ হইতে পারে। অনেক সময় এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাইলেও ইহা থামে।

জরায়ু প্রদাহে স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থাকেন। এই রোগে নিয়মিত হিপ-বাথ, সিজ-বাথ ও তলপেটে মাটির ব্যাণ্ডেজের সহিত বেদনা স্থানে পর্যায়ক্রমে গরম ও ঠাণ্ডা জলের কম্প্রেস দিলে অত্যন্ত উপকার হইয়া থাকে।

গর্ভাবস্থায় অনেক স্ত্রীলোকের শূলবেদনা হয়। কোষ্ঠবদ্ধতাই অনেক সময় ঐ-রোগের কারণ। সুতরাং নিয়মিত হিপ-বাথ ও ভিজা কোমর পটি লইলেই এই রোগ হওয়া অসম্ভব হয় এবং হইলেও আরোগ্য হয়। যে-সুস্থ স্ত্রীলোকের প্রায়ই এই বেদনা হয়, তাহারা তলপেটে ষ্টিম-বাথ লইয়া অথবা গরম জলের সেক দিয়া উত্তপ্ত করিয়া তাহার পর শীতল জলের পটি বা কাদার ব্যাণ্ডেজ দিলে বিশেষ উপকার পাইতে পারে।

যে-কোন স্ত্রী-রোগে, ভিজা কোমর পটি (wet girdle) আশ্চর্য ভাবে কার্য করে। কারণ তাহা তলপেটের সমস্ত দূষিত বিজাতীয় পদার্থ টানিয়া নেয়। কেবল এই প্যাক দ্বারাই সমস্ত স্ত্রী-রোগ আরোগ্য হইতে পারে। যেখানে ইহা ব্যবহার সত্ত্বেও দ্রুত আরোগ্য হয় না, পেট গরম থাকিলে সেখানে ভিজা নেকড়ার পরিবর্তে কাদামাটির ব্যাণ্ডেজ দিতে হয়।

[৪]

শিশুদের চিকিৎসাও বয়স্ক লোকদেরই মত। অন্ত্র ও বৃহদন্ত্র পরিষ্কার ও দোষশূন্য করিয়া, ঘর্ম উৎপাদন করিয়া এবং স্নানের দ্বারা দেহের অতি-

রিক্ত উত্তাপ কমাইয়া এবং জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি করিয়া বয়স্ক লোকদের যেমন চিকিৎসা করিতে হয়, শিশুদেরও সেইভাবে চিকিৎসা করা কর্তব্য।

শিশুর যে-কোন অসুখে প্রথমেই তাহার বৃহদন্ত্রটি পরিষ্কার করা উচিত। অনেক সময় একটি পানের বোঁটায় নারিকেল তৈল মাখাইয়া শিশুর মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিলেই শিশুর দাস্ত পরিষ্কার হয়। যদি ইহাতে দাস্ত না হয়, তবে কতকটা মধু সামান্য জল সহ পিচকারির সাহায্যে ঢুকাইয়া দিলেই কুপিত মল বাহির হইয়া যায়।

দাস্ত পরিষ্কার করিবার ব্যাপারে মধু গ্লিসিরিন অপেক্ষা সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তলপেটের ব্যাণ্ডেজই কোষ্ঠ পরিষ্কারের পক্ষে সর্বোত্তম। প্রতিবার এক ঘণ্টার জন্য দিনে দুইবার তলপেটের ব্যাণ্ডেজ দিলে শিশুর পেটের সমস্ত আবর্জনা বাহির হইয়া আসে এবং অন্ত্র ও বৃহদন্ত্র সম্পূর্ণ দোষশূন্য হয়।

শিশুর বৃহদন্ত্র পরিষ্কার হইয়া গেলে কতক্ষণ তাহাকে বিশ্রাম দিয়া তাহার পর তাহার দেহ ঘামাইয়া দেওয়া কর্তব্য। মধ্যকায়ের প্যাক (Trunk pack, ৯৪ পৃঃ) দ্বারা ঘামাইয়া দেওয়াই শিশুর পক্ষে সর্বোত্তম ব্যবস্থা। শিশুর দাস্ত পরিষ্কার করিয়া লইয়া এই প্যাক দিলে শিশুর সর্দি, জ্বর, কাসি, ঘুংড়ি কাশি, ব্রঙ্কাইটিস এবং এমন কি নিউমোনিয়া পর্যন্ত অতি অল্প সময়ে আরোগ্য হয়।

কিন্তু শিশুদিগকে স্নান করান সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত।

সাত বৎসরের কম বয়সের যে-শিশু, তাহাদের উত্তাপ উৎপন্ন করার ক্ষমতা অত্যন্ত কম। এজন্য খুব অল্প জ্বরে কি সাধারণ অসুখে খুব শীতল জল দ্বারা তাহাদের স্নান করান উচিত নয়। শীতল জলের ভিতর সামন্য গরম জল ঢালিয়া জলের শীতলতা ভাঙিয়া দিয়া সেই জল দিয়াই তাহাদের স্নান করান উচিত। কিন্তু জল যেন গরম না হয়।

অথবা শীতল জলে বার বার হাত ডুবাইয়া সেই হাত শিশুর শরীরের

উপর রগড়াইয়া রগড়াইয়া সর্বাঙ্গ গরম করিয়া দিলে, শিশুর শরীরের দূষিত তাপ অনেক বাহির হইয়া যায় এবং শরীরও শীতল হয়।

স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যেক দিন শিশুদিগকে শীতল জলে স্নান করান উচিত। তাহা হইলে সহজে তাহাদের ঠাণ্ডা লাগিতে পারে না। মাথা সর্বদাই শীতল জল দ্বারা ধোয়াইয়া দেওয়া কর্তব্য।

রোগের সময় দুর্বল ও বৃদ্ধ রোগীদের যেরূপ সতর্কতার সহিত চিকিৎসা করা উচিত, শিশুদেরও সেইরূপ করা কর্তব্য। কতটুকু ঠাণ্ডা জল প্রয়োগ করিলে, শিশুর শরীর পুনরায় দ্রুত গরম হইবে, তাহা বুঝিয়া তাহাকে চিকিৎসা করা আবশ্যক।

দ্বাদশ অধ্যায়

খাদ্য-চিকিৎসা

[১]

ইংরেজীতে প্রবাদ আছে, We are made or unmade at the table—আহারের আসনেই আমাদের দেহ গড়িয়া উঠে এবং আহারের আসনেই আমাদের দেহ ভাঙে।

আহারের দোষ ব্যতীত সহজে আমাদের কোন অসুখ হইতে পারে না। আহারের দোষেই আমাদের দেহে বিজাতীয় পদার্থ জমিয়া উঠে এবং তাহা অবলম্বন করিয়াই দেহে রোগ উৎপন্ন হয়।

রোগ হইলে লোকে আমাদের জন্য দুঃখ করে। কিন্তু রোগ হইলে দুঃখ না করিয়া কৃপা করা উচিত। কারণ প্রায় সমস্ত রোগই আমাদের নিজেদের সৃষ্টি—আমরা আহারের আসনে বসিয়াই রোগ সৃষ্টি করি।

যখন আহারের দোষেই প্রায় সমস্ত রোগ জন্মে, তখন প্রধানত আহার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াই প্রায় সমস্ত রোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

সুনির্বাচিত খাদ্যের দ্বারা দেহ গঠিত হইলে, দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এরূপ অক্ষুণ্ণ থাকে যে, কোন রোগই দেহের উপর সহজে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

আহারের প্রধান উদ্দেশ্যই, দেহ গঠন ও ক্ষয় নিবারণ। যে-সকল মৌলিক পদার্থ দ্বারা আমাদের দেহ নির্মিত, খাদ্যের সহিত সেই সকল

জিনিস গ্রহণ করিয়াই আমরা এই দুই উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারি। আমরা যাহা খাই, তাহার ভিতর আমিষ (protin), শর্করা (carbo-hydrate), তৈল (fat), লবণ, জল ও খাদ্যপ্রাণ (vitamines) থাকে। এই সকল খাদ্য ঘুরাইয়া ফিরাইয়া খাইলেই দেহগঠনোপযোগী এবং সর্বগুণযুক্ত খাদ্য (balanced food) গ্রহণ করা হয়।

খাদ্যের ভিতর প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় খাদ্যই প্রধান। কারণ আমিষ জাতীয় উপাদান দ্বারা আমাদের দেহের প্রায় অর্ধেক অংশ গঠিত। আমাদের দেহের কোষগুলি (cell) আমিষ জাতীয় খাদ্যের দ্বারাই গঠিত হয়। দুগ্ধ, ছানা, মসুর প্রভৃতি বিভিন্ন ডাল, কলাই শুঁটি, শিম এবং মাছ, মাংস ও ডিম প্রভৃতি আমিষ জাতীয় উপাদানের প্রধান উৎস। কিন্তু আমিষ জাতীয় উপাদান গ্রহণ করিবার জন্য যে-প্রচুর আমিষ খাওয়ার আবশ্যক আছে তাহার অর্থ নাই। মাংস ভক্ষণে যেমন উপকার হয় তেমন অপকারও হয় যথেষ্ট। মাংসের সহিত আমরা পুষ্টি গ্রহণ করি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিষও গ্রহণ করিয়া থাকি। তাহা ব্যতীত মাংস অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা আনয়ন করে। মাছ-মাংসে যে প্রোটিন আছে তাহার অনেক বেশী প্রোটিন আছে বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিজ্জ ও দুগ্ধজাত পদার্থে। চিনাবাদামে প্রোটিনের পরিমাণ ৪২%, সয়াবিনে ৪০%, নারিকেলে ২৫%, মসুর ডালে ২৫%, কলাই শুঁটিতে ২৫%, শিমে ২৫%, ছাগমাংসে ২৫%, মুগ ডালে ২৩%, ছানায় ২১%, মৎসে ১৮%, এবং ডিম্বে ১৩%। সুতরাং মংাস যথা সম্ভব কম খাইয়া অন্যান্য পদার্থ একটু বেশী করিয়া খাইলে আমরা যথেষ্ট দেহ-গঠনোপযোগী মসলা প্রাপ্ত হইতে পারি। আমাদের পক্ষে প্রতিদিন অন্তত দুই ছটাক আমিষ জাতীয় পদার্থ গ্রহণ করা আবশ্যক।

শর্করা জাতীয় খাদ্যের প্রধান উদ্দেশ্যই হইল, তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করা। শর্করা জাতীয় উপাদান হইতে মেদও (fat) নির্মিত হয়। এই

অন্ত অধিক পরিমাণ শর্করা জাতীয় পদার্থ খাইলে মানুষ মোটা হয়। যাহারা স্বভাবতই স্থূলকায় তাহাদের শর্করা জাতীয় পদার্থ যথা সম্ভব কম খাইয়া ফল বেশী খাওয়া উচিত। চাউল, আটা, ময়দা, চিনি, গুড়, যব, বার্লি প্রভৃতি শর্করা জাতীয় খাদ্যের অন্তর্গত। দৈনিক প্রত্যেকের অন্তত সাত ছটাক শর্করা পদার্থ গ্রহণ করা কর্তব্য।

তৈলজাতীয় খাদ্যের দ্বারাও দেহে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয় এবং ইহা দেহে মেদ গঠিত করে। ঘৃত, মাখন, সরিষা, নারিকেল, অলিভ প্রভৃতি বিভিন্ন তৈল ইহার অন্তর্গত। যাহাদের কোষ্ঠকাঠিন্য আছে অথবা যাহাদের লিভার খারাপ তাহাদের যথাসম্ভব ঘৃত বর্জন করিয়া মাখন ব্যবহার করা কর্তব্য। নারিকেল অতি উৎকৃষ্ট তৈলজাতীয় খাদ্য। ইহার শতকরা ৫০ ভাগই স্নেহজাতীয় পদার্থ। বিভিন্নভাবে নারিকেল খাদ্যের সঙ্গে গ্রহণ করা আবশ্যক। এক তৃতীয়াংশ পক্ক যে নারিকেল তাহাই সর্বদা আহার করা কর্তব্য। ইহা যেমন পুষ্টিকর তেমনি সহজে পরিপাক হয়। আমাদের খাদ্যের ভিতর যে কোনভাবে দৈনিক দেড় ছটাক তৈলজাতীয় পদার্থ থাকা প্রয়োজন।

খাদ্য দ্রব্যের সহিত ক্যালসিয়াম, ফরফরাস, লৌহ, সোডিয়ম ও আয়োডিন প্রভৃতি বিভিন্ন লবণজাতীয় পদার্থ থাকাও আবশ্যক। লবণ জাতীয় পদার্থ দাঁত, হাড় ও মস্তিষ্ক গঠন করে এবং দেহে রক্তকণিকা উৎপাদন করে। যথোচিত লবণজাতীয় পদার্থ গ্রহণে হার্ট ও রক্ত ভাল থাকে এবং রক্তাল্পতা, রিকেট ও গলগণ্ড প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়। প্রধানত দুধ, মাখন, পালংশাক, লেটুস, বাঁধাকপি, ঢেঁরস, গাজর, শালগম, গোলআলু, কমলা নেবু, আখরোট, আটা, আছাঁটা চাউল, পাঁঠা প্রভৃতির যকৃত ও ডিম হইতে আবশ্যকীয় রাসায়নিক লবণ পাওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু কেবল আমিষ, শর্করা, তৈল ও লবণজাতীয় পদার্থে জীবন ধারণ করা চলে না। ইহাদের সঙ্গে যদি ভাইটামিন যুক্ত থাকে তবেই

ইহারা দেহের কাজে আসে, অন্যথা আসে না। খাদ্য দ্রব্যের ভিতর ভাইটামিন কতকটা ইঞ্জিনের ভিতর তৈলের মত। আমরা লক্ষ টাকা দিয়া একটা ইঞ্জিন কিনিতে পারি, কিন্তু যদি তাহার ভিতর তৈল না দেওয়া যায়, তবে তাহা চলে না। খাদ্য দ্রব্যের ভিতরও ভাইটামিন তাহাই। ভাইটামিন হয়তো মাত্রায় খুব অল্প থাকে, কিন্তু তাহাই খাদ্যের প্রাণ। এইজন্য বাংলায় ভাইটামিনকে খাদ্যপ্রাণ বলা হইয়া থাকে। ভাইটামিন-শূন্য সমস্ত খাদ্যই মৃত। পর পর বহুসংখ্যক ইঁদুরকে ভাইটামিন শূন্য আমিষ প্রভৃতি সর্বপ্রকার খাদ্য খাওয়াইয়া দেখা গিয়াছে, তাহারা খুব ভাল খাইয়াও ক্রমশ শুকাইতে থাকে এবং কিছুদিন পর মরিয়া যায়। সহরের লোকের শরীর যে ভাল হইতে চায় না, তাহার অন্যতম কারণ ইহাই।

ভাইটামিনের এ, বি, সি, ডি, ই, এফ প্রভৃতি নানা ভাগ আছে। ইহারা বিভিন্নভাবে দেহের পক্ষে উপযোগী। দেহের পুষ্টিসাধনে, অস্থিনির্মাণে, শিশুদের দন্তগঠনে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করিতে, পরিপাকশক্তি সতেজ রাখিতে এবং রোগশূন্য দীর্ঘজীবন লাভের জন্য ইহারা একান্ত অপরিহার্য। দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া ইহারা বিভিন্ন রোগের আক্রমণ হইতেও দেহকে রক্ষা করে।

যেমন আহারের দোষে দেহে বিভিন্ন রোগ উৎপন্ন হয়, তেমনি প্রয়োজনীয় ভাইটামিনের অভাবেও দেহের বিভিন্ন যন্ত্র দুর্বল হইয়া যায় এবং তাহার ফলে দেহে বিভিন্ন রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দেহে যথাযথ ভাইটামিনের অভাব হইলে দেহের পুষ্টি বন্ধ হয় এবং তাহা হইতে চক্ষু রোগ (Xerophthalmia), শ্বাসনালী ও ফুসফুসের পীড়া, বেরিবেরি, দুষিত ক্ষত (Scurvy), রিকেট (Ricket), স্ত্রীলোকদিগের বন্ধ্যাত্ব, অক্ষুধা, অজীর্ণ, মূত্রযন্ত্র প্রভৃতির পীড়া, রাতকানা রোগ, রক্তাল্পতা, চোখের ছানি প্রভৃতি রোগ জন্মে।

অনেক সময় দেখা গিয়াছে, যে-ভাইটামিনের অভাবে এই সব রোগ হয়, সেই ভাইটামিন খাইতে দিলেই এই রোগ হইতে মুক্ত থাকা যায় এবং যাহাদের ঐ-সব রোগ হয়, তাহারাও ঐ-রোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে।

বেরিবেরিটাকে পূর্বদেশের রোগ বলে। যে-দেশের লোকেরা কলে-ছাঁটা চাল খায়, তাহাদেরই প্রায় এই অসুখ হয়। পূর্বে জাপানে খুব বেরিবেরি হইত; কিন্তু তাহারা কলের ছাঁটা চাল বর্জন করিয়া এই রোগ হইতে মুক্তি পাইয়াছে।

একবার জাপানের একখানা সরকারী জাহাজ ভূ-প্রদক্ষিণে বাহির হয়। ঐ-জাহাজখানিতে ৩৭৬ জন নাবিক ছিল। পৃথিবী ঘুরিয়া আসিবার মধ্যে ইহাদের ভিতর ১৬৯ জনের বেরিবেরি হয় এবং তাহাদের পঁচিশ জন প্রাণ ত্যাগ করে। যদি নাবিকদিগের এইরূপ মৃত্যু হইতে থাকে, তবে জাপানের সামরিক শক্তি কিরূপ বিপন্ন হইবে ভাবিয়া জাপান অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়ে এবং অনেক ডাক্তার গবেষণাকার্যে নিযুক্ত হয়। ইহাদের একজন ডাক্তার লক্ষ করিলেন, তাহাদের নৌ-সৈন্যের সকল ব্যবস্থা অবিকল য়ুরোপের মত, কেবল পার্থক্য এই যে, জাপানী নৌ-সৈন্যেরা কলের ছাঁটা চাল খায়। তখন যে-পথে পূর্বের সরকারী জাহাজ গিয়াছিল, তিনি ততগুলি লোক জাহাজে রাখিয়া চালের খোসার লাল অংশযুক্ত চাল দিয়া তাহাদিগকে পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে পাঠাইয়া দিলেন। যখন তাহারা ফিরিয়া আসিল, তখন দেখা গেল, একজন নাবিকেরও মৃত্যু হয় নাই এবং বেরিবেরি রোগও হয় নাই।

তাহার পর জাপান, জেলখানায় কমছাঁটা চাল প্রবর্তন করিয়া দেখিলেন, পূর্বের বৎসর বেরিবেরিতে যেখানে মৃত্যু সংখ্যা ছিল ৭৩, সেখানে এই ব্যবস্থা করার পর দেখা গেল, মৃত্যু সংখ্যা শূন্যে দাঁড়াইয়াছে।

আমেরিকা গবর্ণমেণ্টও ফিলিপাইনে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া

তাহাদের সৈন্যদল হইতে বেরিবেরি তাড়াইয়াছেন (Leslie J. Harris, D. Sc.—Vitamines, P. 49—51)।

যাহাতে ভাইটামিনের অভাবে দেহে কোন রোগ উৎপন্ন হইতে না পারে, এইজন্য প্রত্যেকেরই যথেষ্ট পরিমাণ আম, আনারস, পেঁপে, আঙুর, পাতিলেবু, কমলালেবু, আপেল, দুগ্ধ, মাখন, ডিম্ব, ঢেঁকিছাঁটা চাল, ভূষিসমেত আটা, খোসাসমেত ডাল, গাজর, শিম, কলাইশুঁটি, কফি, টমেটো, টাটকা সবুজ লতাপাতা, এবং পালং প্রভৃতি শাক খাওয়া উচিত।

কিন্তু আমরা যে-ভাবে খাদ্য প্রস্তুত করি, তাহাতে অনেক সময় ভাইটামিন প্রায় নষ্ট হইয়া যায়। ফুটন্ত তাপে সিদ্ধ করিলে ভাইটামিন প্রায় থাকে না। এই জন্য তরকারি যথাসম্ভব কম সিদ্ধ করা উচিত।

যদি প্রত্যেক দিন কিছু কিছু মূলা, মটরশুঁটি, টমেটো, শসা, পালং শাক ও কফি প্রভৃতি কতকটা করিয়া কাঁচা চিবাইয়া খাওয়া যায় তবে দেহ বিশেষ পুষ্ট হয়। লবণ প্রভৃতি মিশাইয়া প্রত্যেক দিন আমাদের ঘরে কাঁচা তরকারির একটা ব্যঞ্জন করা উচিত। য়ুরোপে সকলেই আহারের সময় এইরূপ কাঁচা তরকারি (salad) প্রচুর পরিমাণে খাইয়া থাকে। কাঁচা তরকারি খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর।

দুগ্ধও সদ্য দোয়াইয়া গরম থাকিতে থাকিতে যদি কাঁচা খাওয়া যায় তবে দুগ্ধে সম্পূর্ণ ভাইটামিন থাকিয়া যায়। পাঞ্জাবে গোয়ালারা গাভীর দুধের বোঁটার নীচে মুখ দিয়া দুগ্ধ পান করে। তাই দেখিতে তাহারা অসুরের মত। দুগ্ধ জ্বাল দিয়া ক্ষীরের মত করিয়া যদি খাওয়া যায়, তবে তাহাতে কিছুমাত্র ভাইটামিন থাকে না।

ভুষিযুক্ত আটা ও খোসার লাল অংশযুক্ত চাউলের ভিতর যথেষ্ট ভাইটামিন থাকে। আটার ভুষিটা ফেলিয়া দিয়া আমরা খাদ্যই নষ্ট করি। ভুষিসমেত আটা খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিন্ত থাকা যায়। ভুষিসমেত আটার কথা শুনিয়া কেহ কেহ ভয় পাইতে

পারেন। কিন্তু তাঁহারা শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন, ভুষিযুক্ত আটা খাওয়াই সমগ্র য়ুরোপের এখন প্রচলিত রীতি। তাহারা ইহাকে বলে, all-wheat bread—সমস্ত ভুষিযুক্ত রুটি। হাতে-ভাঙা যাঁতার আটাই সর্বদা প্রশস্ত। কলের যে সাদা ময়দা, তাহাতে খুব কম জিনিসই থাকে ; তাহা যদি আবার ঘৃতে ভাজিয়া লওয়া যায়, তবে তাহাতে আর কিছুমাত্র ভাইটামিন অবশিষ্ট থাকে না।

আমরা যে-পদ্ধতিতে ভাত খাই, তাহাতেও ফেনের সঙ্গে সমস্ত ভাইটামিন চলিয়া যায়। বাংলা দেশে প্রতি বৎসর যে হাজার হাজার লোক ম্যালেরিয়ায় মরে, এই পুষ্টি-শূন্য খাদ্য আহারই তাহার অন্যতম কারণ। উপযুক্ত পুষ্টির অভাবে যখন দেহ দুর্বল হয়, তখনই মাত্র ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জীবাণু আক্রমণ করিয়া দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

আস্তা খোসা সহ ভিজান অঙ্কুরিত বুট, মটর ও মুগ প্রভৃতি ডালেও যথেষ্ট ভাইটামিন থাকে। প্রত্যেক দিন তাহার কতকটা করিয়া খাইলে যথেষ্ট উপকার হয়। বুট প্রভৃতি একদিন জলে ভিজাইয়া, পরের দিন জল ফেলিয়া রাখিয়া দিলেই একদিনের ভিতর তাহা অঙ্কুরিত হইয়া উঠে।

ডাল যখন রান্না করিতে হয়, তখনও খোসা না ফেলিয়া আস্ত ডাল সিদ্ধ করা উচিত। খোসা ফেলিয়া দিলে ডালের অধিকাংশ সারই তাহার সঙ্গে চলিয়া যায়। খোসা চিবাইয়া পিশিয়া নির্মল করিয়া খাইলে ইহা যথেষ্ট মল বৃদ্ধি করিবে এবং প্রতিদিন পায়খানায় বসিয়া আর দীর্ঘক্ষণ সাধনা করিবার আবশ্যক হইবে না।

আমরা খাইবার সময় তরকারির ছিবড়াযুক্ত অসার বস্তুগুলি চিবাইয়া ফেলিয়া দেই। তাহা না ফেলিয়া চিবাইয়া চিবাইয়া নিষ্পেষিত করিয়া জিহ্বা যখন ছাড়পত্র দিবে, তখন তাহা গিলিয়া ফেলা উচিত। তরকারির

এই ছিবড়া যথেষ্ট পরিমাণ খাইলে মলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং সহজে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

যাহারা যথেষ্ট পরিমাণ লতাপাতা খায় না অথবা যাহারা কলে-ছাঁটা চাউল খায়, প্রায়ই তাহাদের দুরারোগ্য কোষ্ঠবদ্ধতা রোগের সৃষ্টি হয়। এই জন্যই গ্রাম্য লোকদের কোষ্ঠবদ্ধতা খুব কম এবং সহরের লোকের খুব বেশী। বাংলা দেশে শাক সাধারণত ভাজিয়া খাওয়া হইয়া থাকে। ইহাতে প্রায় কিছুই উপকার হয় না। যদি পালং প্রভৃতি শাক সিদ্ধ করিয়া ঝোলসমেত খাওয়া যায়, তবেই কেবল তাহার পরিপূর্ণ ফল লাভ করা যাইতে পারে। আমরা অনেক সময় ভাজা দিয়া ভাত খাই। কিন্তু কোন ভাজা জিনিসই দেহের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়।

কমলালেবু, বাতাবীলেবু, কাগজি এবং বিভিন্ন ফল যথেষ্ট উপকারী। ফল খাইতে হইলে এমন সব ফলই খাওয়া আবশ্যক, যাহা গাছ-পাকা, টাটকা অথচ অতিরিক্ত পাকা নয়। পচা ফল দেহের পক্ষে বিষতুল্য। আপেল, আঙুর প্রভৃতির খোসাও কখন ফেলিতে নাই, চিবাইয়া চিবাইয়া ভিতরের মিষ্ট জিনিষের সঙ্গে মিলাইয়া খাইয়া ফেলিতে হয়। যে-সময়ের যে-ফল আহারে তাহাই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত।

কডলিভার অয়েলেও যথেষ্ট ভাইটামিন থাকে। এমন কডলিভার খাওয়া উচিত, যাহা অন্য কোন ঔষধের সহিত মিশ্রিত নয়। ইহা এত পুষ্টিকর যে, প্রথম অবস্থায় যক্ষ্মারোগের ধ্বংসকারিতার সহিত সমানে জুঝিয়া জীবনকে রক্ষা করিতে পারে। যক্ষ্মারোগে দেহ ক্ষয় হয়, ক্ষয় পূরণ করিতে কডলিভার অয়েল অদ্বিতীয় খাদ্য। এই জন্যই কডলিভার অয়েল একটা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। যাহারা অত্যন্ত রোগা ও দুর্বল এবং যাহারা ভয় ভয় করে, তাহাদের যক্ষ্মা হইতে পারে, তাহারা কালবিলম্ব না করিয়া আহারের অব্যবহিত পর কডলিভার অয়েল ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিবেন। কিন্তু কডলিভার অয়েল খুব অল্প মাত্রায় মাত্র তিন ফোঁটা হইতে আরম্ভ

করিতে হয় এবং দৈনিক এক ফোঁটা করিয়া বৃদ্ধি করিতে হয়। তাহাও পরে চা-চামচের এক চামচের বেশী খাইতে নাই। যতটুকু হজম হয় ততটুকু কডলিভার অয়েল মাত্র খাওয়া চলে। হজম না হইলে পেটের অসুখ প্রভৃতি তো হইতে পারেই, পরেও ইহা যেমন যক্ষ্মার আক্রমণ রোধ করে, তেমন আবার অনেক সময় বহুমূত্র ডাকিয়া আনে।

মাংস প্রভৃতি খুব বেশী করিয়া না খাওয়াই ভাল। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রাকৃতিক চিকিৎসকই মাংস আহারের বিরুদ্ধে। মাংসের ভিতর ছিবড়াযুক্ত পদার্থ না থাকায় ইহা সর্বদাই কোষ্ঠকাঠিন্য আনয়ন করে। মাংস খাইলে সর্বদাই তাহার সহিত প্রচুর কাঁচা ও সিদ্ধ তরকারি খাওয়া উচিত। তাহা হইলে ততটা কোষ্ঠকাঠিন্য হয় না।

খাদ্য নির্বাচন স্বাস্থ্য রক্ষার একটি প্রধান জিনিস। যেমন লোকে বুঝিয়া দাবার গুটি আগাইয়া পিছাইয়া দেয়, তেমনি দেহের প্রয়োজন অনুসারে কোন খাদ্য খাইতে হয়, কোন খাদ্য বন্ধ রাখিতে হয়।

প্রধানত একমাত্র আহার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিলেই মানুষ সুস্থ থাকিতে ও বহু রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারে।

আহারের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে যেমন স্বাস্থ্য অটুট রাখা যায়, খাদ্য সম্বন্ধে ধারকাট করিয়াও তেমনি বহু রোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

আমাদের অধিকাংশ অসুখই কোষ্ঠবদ্ধতা হইতে উৎপন্ন হয়। আহার নিয়ন্ত্রণ করিয়া যদি কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা যায়, তবে অধিকাংশ রোগ হইতেই আমরা অব্যাহতি পাইতে পারি। হিপবাথ ও তলপেটের ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি যদিও কোষ্ঠ পরিষ্কারের সহায়তা করে, তথাপি খাদ্যের দ্বারাই সর্বদা পেট ঠিক করিয়া লওয়া উচিত। দেহ সুস্থ রাখিবার ও রোগ আরোগ্য করিবার তাহাই সর্বাপেক্ষা প্রাকৃতিক উপায়।

কতকগুলি ফলে বিশেষ ভাবে দাস্ত পরিষ্কার হয়। বেলের সময় পাকা

বেল, আমের সময় পাকা আম, পাকা পেঁপে, পাকা কলা, কমলা লেবু, ডুমুর, পেয়ারা, আঙুর, কিসমিস্, মনাক্কা, খেজুর, আখরোট, আঞ্জির, খুবানি, আনারস, আপেল, কাঁঠাল ও জাম প্রভৃতির ভিতর যে-কালে যাহা পাওয়া যায়, প্রত্যেক দিন কতকটা পরিমাণ সেই সব ফল খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার সম্বন্ধে একরূপ না ভাবিলেও চলে।

আয়ুর্বেদ বলিয়াছেন,—

বিনাপি ভেষজৈর্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।
ন তু পথ্যবিহীনানাং ভেষজানাং শতৈরপি ॥

—ঔষধ ব্যতীত কেবল পথ্যের দ্বারাই রোগ আরোগ্য হইতে পারে, কিন্তু পথ্য ব্যতীত শত ঔষধেও রোগ আরোগ্য হয় না।

এই দেহটা একটা খাদ্য-যন্ত্র (food-engine)। বেদান্ত ইহাকে অন্নময় কোষ বলিয়াছেন। কেবল অন্ন নিয়ন্ত্রণ করিলেই বহু রোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। এই জন্য প্রবাদ আছে—diet cures more than doctors—ডাক্তারদের অপেক্ষা পথ্যই রোগ বেশী আরোগ্য করে।

[২]

কিন্তু খাদ্য ও পথ্যে তখনই মাত্র উপকার হয়, যখন প্রকৃতির দাবি রক্ষা করিয়া তাহা গ্রহণ করা হয়। যে-ভাবে খাদ্য গ্রহণ করিলে তাহা প্রকৃতির পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইবে, ঠিক সেই ভাবে খাদ্য গ্রহণ করিলেই তবে খাদ্য আমাদের দেহের কাজে আসিতে পারে।

ভগবান আমাদের মুখে দাঁতগুলি বসাইয়া রাখিয়াছেন এই জন্য যে, আমরা চিবাইয়া আহার করিব। চিবাইয়া না খাইলে কোন খাদ্যই আমাদের কাজে আসে না। আমাদের সমস্ত পরিপাক ক্রিয়াই এই চর্ব্বণের উপর নির্ভর করে।

আমাদের দাঁতগুলিকে বাহিরের যন্ত্র বলিলেই হয়; তথাপি দেহের অভ্যন্তরস্থ পাকস্থলী ও যকৃৎ প্রভৃতির সহিত যন্ত্রের মত তাহাদের যোগ রহিয়াছে।

যেমন বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র পরস্পর পৃথক হইলেও তালমানে লয় হইয়া এক সুরে বাজে, আমাদের দেহের বিভিন্ন যন্ত্রও তেমনি পরস্পর পৃথক হইলেও নিজেদের ভিতর একটা সঙ্গতি রাখিয়া জীবনের গান গায়।

কোন খাদ্য দ্রব্য চর্বণ করিলেই মুখের লালাগ্রন্থি হইতে প্রচুর লালা খাদ্য দ্রব্যের ভিতর নামিয়া আসে। মুখে লালা নিঃসৃত হইলেই পাকস্থলী হইতে একটা পাচক রস নির্গত হইয়া ভুক্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয়। তাহাই আবার পর পর যকৃৎ, ক্লোম ও ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে রস টানিয়া আনে। এই জন্য আমাদের মুখ হইতেই পরিপাক ক্রিয়া আরম্ভ হয়।

এই পঞ্চবিধ পাচক রস মিশিয়া খাদ্য দ্রব্য লেইয়ের মত হয়। তাহাতেই অন্ত্রের অঙ্কুরিকাগুলি (villi) তাহার ভিতর হইতে অক্লেশে রস তুলিয়া নিতে পারে। এই সকল রস খাদ্য দ্রব্যের উপর একটা রাসায়নিক ক্রিয়া উৎপন্ন করে। তাহাতেই তাহা দেহের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়। এই রাসায়নিক ক্রিয়া না হইলে কোন মূল্যবান খাদ্য দ্রব্যই দেহের কোন কাজে আসে না।

একখানা শুকনা রুটি অথবা এক মুঠা ভাত চিবাইলে কতক্ষণ পর তাহা মিষ্ট লাগে। তাহার অর্থ এই, লালা খাদ্য দ্রব্যের শ্বেত-সারের (starch) সহিত মিশিলে তাহা রাসায়নিক ক্রিয়ায় শর্করায় রূপান্তরিত হয়। শ্বেতসার এইরূপ রূপান্তরিত হইলেই তবে তাহা দেহে গৃহীত হয়। কিন্তু পাকস্থলীতে আসা মাত্রই খাদ্য দ্রব্যের এই রূপান্তর বন্ধ হইয়া যায়, সেই জন্য যথেষ্ট চিবাইয়া তবে খাদ্য ছাড়িয়া দিতে হয়। আহার্যের সঙ্গে লালা না মিশিলে খাদ্য দ্রব্য হজমই হয় না, সুতরাং দেহের কোন কাজেই আসে না। এই জন্য যাহাদের দাঁত নাই, অনেক সময় তাহাদের প্রবল

অজীর্ণ রোগ হয় এবং যখন তাহারা কৃত্রিম দন্ত গ্রহণ করে, তখনি তাহাদের অজীর্ণ সারিয়া যায় (W. D. Halliburton, M. D.—Handbook of Physiology, P. 548)।

শুনা যায়, ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন প্রতি গ্রাস ৩২ বার চর্বণ করিয়া খাইয়া আশী বৎসর পর্যন্ত যুবকের মত সুস্থ ছিলেন।

যাহা কিছু খাইতে হইবে, তাহাই চর্বণ করিয়া, গলাধঃকরণ করা উচিত। চর্বণের দ্বারা লালা নিঃসৃত হইলেই পর পর বিভিন্ন পাচক রস নির্গত হয় এবং সেই বিভিন্ন রসই শ্বেতসার, স্নেহপদার্থ, প্রোটিন, প্রভৃতি খাদ্যের বিভিন্ন পদার্থকে হজম করে। এই জন্য দেহকে সবল, সুস্থ ও নীরোগ রাখিবার জন্য অথবা রোগ আরোগ্যের পক্ষে চর্বণ করিয়া খাওয়াই প্রথম পদবিক্ষেপ।

[৩]

আহার সম্বন্ধে প্রথমেই এই ব্যবস্থা করা উচিত যে, প্রতিবেলা আহারের একটা নির্দিষ্ট সময় থাকিবে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে খাইলে পাচক রস প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়। কারণ পাকস্থলীরও এই বিষয়ে একটা অভ্যাস হইয়া যায়। সময় অতিক্রম করিয়া আহার করিলে আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলি হইতে পাচক রস যথেষ্ট পরিমাণে নির্গত হয় না এবং ভুক্ত দ্রব্য বেশী সময় পেট ভার করিয়া থাকে। আবার নিয়মিত সময়ে আহার না করিলে নিয়মিত সময়ে মলত্যাগের বেগও হয় না। এই জন্য আহারের সময় সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া উচিত। হাতে যদি যথেষ্ট কাজ থাকে, তাহা ফেলিয়াও রীতিমত সময়ে আহার শেষ করিয়া লইতে হয়। কারণ শরীর যদি ভাল না থাকে, টাকা পয়সার কিছুমাত্র মূল্য থাকে না।

ঠাণ্ডা কি বাসী জিনিস কখনও খাওয়া উচিত নয়। ইহা প্রায়ই হজম হয় না এবং দেহের উপকার করিবার পরিবর্তে অপকারই করে। আবার

তেমনি খুব গরম জিনিস কখনও খাওয়া উচিত নয়। যাহা খাইতে কষ্ট হয় এরূপ গরম খাদ্য খাইলে অত্যন্ত কঠিন রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। এই জন্য সর্বদা উষ্ণ খাওয়া উচিত। কিন্তু উষ্ণ খাইতে হইলে অনেকগুলি পদ খাইবার লোভ সংবরণ করিতে হয়। বেশী পদ খাইতে হইলেই ঠাণ্ডা খাইতে হইবে। এই জন্য দুই একটি ভাল পদ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে খাওয়া ভাল।

সর্বদাই মুক্ত স্থানে বসিয়া আহার করা উচিত। বদ্ধস্থানে বসিয়া আহার করিলে ভুক্তদ্রব্য যেরূপ হজম হয়, তাহা অপেক্ষা ঢের সহজে হজম হয় মুক্ত হাওয়ায় বসিয়া আহার করিলে। চিবাইবার সময় খাদ্যের সহিত যদি অক্সিজেন্ মিশ্রিত হয়, তবে তাহা পরিপাক কার্যের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

আমিষ, তৈল ও শর্করা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া উচিত হইলেও অনেকগুলি পদ একত্র খাওয়া কখনও উচিত নয়। ইহাতে বিরুদ্ধ ভোজনের জন্য স্বাস্থ্যহানি হয়। প্রতিদিন নূতন্ নূতন খুব অল্প দুই একটি পদ খাইতে হয়, কিন্তু তাহাও খুব তৃপ্তিকর হওয়া উচিত।

এক প্রকার খাদ্যও দীর্ঘদিন কখনও খাইতে নাই। ইহাতে খাদ্যে অরুচি আসে। ডাল ও তরকারি প্রতিদিন পরিবর্তন করিয়া দেওয়া উচিত। নিত্য নূতন পদ খাইলে আহারে নব নব ইচ্ছা জন্মে। তাহাতে যথেষ্ট পাচক রস নির্গত হয় বলিয়া খাদ্যদ্রব্য অতি সহজে পরিপাক হয়।

খাদ্যদ্রব্যের সহিত যতটা কম মশলা ব্যবহার করিলে চলে, তাহাই করিতে হয়। মশলার ভিতর শরীরের পুষ্টিকারক কিছুই নাই। অনেক সময় অতিরিক্ত মশলা দিয়াই ভুক্তদ্রব্যকে আমরা অত্যন্ত দুষ্পাচ্য করিয়া তুলি। এলাচি, লবঙ্গ প্রভৃতি গরম মশলা শরীরের পক্ষে অত্যন্ত অপকারী। বিধবাদের পক্ষে মাছ খাওয়া যে অপরাধ, তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী অপরাধ এলাচি প্রভৃতি গরম মশলা খাওয়া। লঙ্কা প্রভৃতি মশলা

পাকস্থলীর প্রদাহ উৎপন্ন করে এবং দীর্ঘ দিন বেশী মশলা খাইলে যকৃতের প্রদাহ উপস্থিত হইতে পারে।

উদর পূর্ণ করিয়া কখনও আহার করিতে নাই। অতিরিক্ত আহার করিলে, খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে আলোড়িত হইতে পারে না এবং দীর্ঘ সময় পাকস্থলীতে থাকিয়া তাহা উত্তপ্ত হইয়া উঠে। দীর্ঘদিন অতিরিক্ত আহার করিলে, পাকস্থলীর সঙ্কোচন ও প্রসারণের ক্ষমতা কমে, পাকস্থলী হইতে যথেষ্ট রস নিঃসরণ হয় না, অগ্নিমান্দ্য রোগ উৎপন্ন হয় এবং পাকস্থলী স্থায়ী ভাবে বড় হইয়া যায়। যে যাহা হজম করিতে পারে, তাহা অপেক্ষা তাহার কিছু কম খাওয়া উচিত, কখনও বেশী খাইতে নাই। যাহা হজম করা যাইবে, তাহার অতিরিক্ত এক মুঠি ভাত বেশী খাইলেও তাহা দেহের পক্ষে বিষ স্বরূপ হয় এবং তাহা দেহে বিজাতীয় পদার্থ উৎপন্ন করে। এই জন্য আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, 'উনভাতে দুনো বল, অতি ভাতে রসাতল।'

কিন্তু অতিরিক্ত আহার করা যেমন ক্ষতিকর, প্রয়োজনের বেশী কম খাওয়াও তেমনি অনিষ্টকর। ইহাতে শরীর ক্রমশ দুর্বল হয় এবং তখন যে-কোন ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে।

দিবস অপেক্ষা রাত্রিতে অপেক্ষাকৃত অনেক লঘু আহার করা উচিত। সন্ধ্যার পরই আহার করিতে পারিলে খুব ভাল হয়। তাহা হইলে শয়নের পূর্বেই আহার্য সম্পূর্ণরূপে হজম হইয়া যাইতে পারে। নিদ্রার সময় পাকস্থলী যথাসম্ভব শূন্য রাখা উচিত।

ভোজনের অব্যবহিত পূর্বে কি পরে নিদ্রা বা কঠিন শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করা উচিত নয়; তাহাতে পরিপাক শক্তি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়।

আহার সম্বন্ধে সুশ্রুত কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছেন। বহুশত বৎসর পর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আজো তাহা সমানি সত্য রহিয়াছে।

সুশ্রুত বলিয়াছেন, সুখকর আসনে বসিয়া এবং দেহকে সমান ভাবে রাখিয়া আহার করিবে। ক্ষুধা না লাগিলে কখনো খাইবে না। যখন ক্ষুধা পাইবে তখন নিয়মিত সময়ে লঘু, স্নিগ্ধ ও উষ্ণ ভক্ষ্য মাত্রানুসারে আহার করিবে। কখনও অতি দ্রুত আহার করিবে না, অথবা অনেক সময় বসিয়া আহার করিবে না। অপ্রাপ্ত কালে বা অতীত কালে এবং হীন বা অতিরিক্ত মাত্রায় ভোজন করিবে না। অপ্রাপ্ত কালে অলঘু শরীরে ভোজন করিলে নানা প্রকার ব্যাধি আক্রমণ করিয়া থাকে, অথবা মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে। উচ্ছিষ্ট, বাসী, অস্বাদু, শীতল অথবা পুনরায় উষ্ণীকৃত অন্ন অথবা অশান্ত (না জুড়ান) অন্ন পরিত্যাগ করিবে। ভুক্ত্বা রাজবদাসীত যাবদন্ন ক্লমোগতঃ—আহারের পর যতক্ষণ না আহারজনীত ক্লান্তি দূর হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত রাজার ন্যায় আসীন থাকিবে (সূত্রস্থানম্, ৪৬।৫১১-৫২৭)।

চরকও আহার সম্বন্ধে অনেকগুলি কাজের কথা বলিয়াছেন। চরকে আছে, মাত্রাশী স্যাৎ—পরিমিত-ভোজী হইবে (সূত্রস্থানম্, ৫।১)। অস্নাত হইয়া, বস্ত্রত্যাগ না করিয়া, পাণি, পাদ ও মুখ প্রক্ষালন না করিয়া ভক্ষণ করিবে না; শুষ্ক বা বাসী অন্ন ভোজন করিবে না (ঐ, ৮।১৬)। দন্ত দ্বারা চর্বণ না করিয়া ভোজন করিবে না (ঐ, ৮।১৮)।

সুশ্রুত ও চরকের এই নিয়মগুলিকে আহার বিষয়ে পথের প্রদীপ স্বরূপ মনে করা যাইতে পারে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রোগ-চিকিৎসায় বায়ু

[১]

আমরা রক্ত পরিষ্কারের জন্য বাজার হইতে বিভিন্ন ঔষধ কিনিয়া খাই। উহারা আমাদের যত উপকার করে অনেক সময় তাহা অপেক্ষা অপকার করে ঢের বেশী।

কিন্তু রক্ত পরিষ্কার করিবার জন্য ঔষধের আশ্রয় গ্রহণ করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক করে না। যাহাতে আমাদের দেহের রক্ত অনুক্ষণ পরিষ্কৃত হইতে পারে, ভগবান দেহের ভিতরই তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। ফুসফুস ও হার্টই দেহের রক্ত পরিষ্কার করিবার প্রধান যন্ত্র।

আমাদের ফুসফুস দুইটি বুকের ভিতর দ্বারহীন দুইটি থলিয়ার মত অবস্থিত। ইহারা শ্বাসনলী ও গলার দ্বারা মুখ ও নাকের ভিতর দিয়া বাহিরের পৃথিবীর সহিত সংযোগ রক্ষা করে। আমাদের শ্বাসনলী বুকের ঠিক মাঝামাঝি যাইয়া দুই ভাগ হইয়া গিয়াছে। ইহার একটি শাখা গিয়াছে দক্ষিণ ফুসফুসে আর একটি গিয়াছে বাম ফুসফুসে। ইহার প্রত্যেকটি শাখা আবার এক একটি ফুসফুসে যাইয়া অতি সূক্ষ্ম বায়ুকোষ গঠন করিয়াছে। ইহারা ক্রমশ ক্ষুদ্র হইতে এত ক্ষুদ্র বায়ুকোষে পরিণত হইয়াছে যে, প্রত্যেক পূর্ণদেহ লোকের ফুসফুসে প্রায় ছয়কোটি বায়ুকোষ আছে।

ফুসফুস যখন ভিতরে বায়ু টানিয়া নেয়, তখন ফুসফুসের কোটি কোটি বায়ুকোষের এক পার্শ্বে থাকে বায়ু এবং অপর পার্শ্বে থাকে রক্ত। ফুসফুস বাতাসের সঙ্গে যে অক্সিজেন নেয়, ঐ-সূক্ষ্ম পর্দার ভিতর দিয়া রক্ত তাহা গ্রহণ করে এবং রক্ত দেহের তন্তুগুলির ভিতর হইতে যে বিষাক্ত কার্বনিক এ্যাসিড লইয়া আসিয়াছে, তাহা নিশ্বাসের সহিত বাহির করিয়া দেয়। ফুসফুসের ঐ-কোষগুলিকে দেহের পক্ষে কার্বনিক এ্যাসিড ও অক্সিজেনের বিনিময় কেন্দ্র বলা যাইতে পারে।

বায়ু হইতে সংগৃহীত অক্সিজেন ফুসফুস হইতে হার্টে যায়। হার্ট আবার তাহা পাম্প করিয়া দেহের ধমনীগুলির ভিতর দিয়া দেহের সর্বাংশে প্রেরণ করে। যেমন বড় বড় সহরে পাম্পের সাহায্যে নলের ভিতর দিয়া জল চতুর্দিকে চালিত করা হয়, আমাদের হার্টও দেহের ভিতর ঠিক পাম্পের কাজ করে। হৃৎপিণ্ড একটি পেশীময় থলির ন্যায় যন্ত্র। দুইটি ফুসফুসের মধ্যভাগে বক্ষাস্থির বামদিক ঘেঁসিয়া ইহা অবস্থিত। হার্ট হইতে যে-নলের ভিতর দিয়া রক্ত দেহের সর্বত্র অক্সিজেন যোগায় তাহাকে ধমনী (artery) বলে এবং যে-নলের ভিতর দিয়া দেহের দূষিত রক্ত বিশুদ্ধ হইবার জন্য হার্ট হইয়া ফুসফুসে যায়, তাহাকে বলে শিরা (veins)। আমাদের ধমনীগুলি ক্রমশ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম কৈশিক নলীতে (capillary) বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। আবার সূক্ষ্ম নলীগুলি ক্রমশ বড় হইয়া শিরায় পরিণত হইয়াছে। তাহাই দূষিত রক্ত বহন করিয়া আনে। হার্ট পাম্প করিয়া দিলে রক্ত ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর ধমনীগুলির ভিতর দিয়া চালিত হইয়া এই কৈশিক নলীগুলির ভিতর দিয়া আবার শিরার পথে হার্টে ফিরিয়া যায়। যখন এই কৈশিক নলীর ভিতর দিয়া ধমনীর রক্ত শিরায় যাইতে থাকে তখন দেহের তন্তুগুলি অক্সিজেন রক্ত হইতে গ্রহণ করে এবং রিক্ত-অক্সিজেন রক্তের ভিতর শিরার পথে দেহে উৎপন্ন কার্বনিক এ্যাসিড ছাড়িয়া দেয়। এই জন্য আমাদের শিরাগুলি

নীলবর্ণ থাকে এবং ধমনীগুলি বিশুদ্ধ রক্ত বহন করিয়া আনে বলিয়া তাহারা থাকে লাল। শিরার দূষিত রক্ত হার্ট হইতে ফুসফুসে যায়। সেখানে আবার বাতাসের ভিতর কার্বনিক এ্যাসিড ছাড়িয়া দিয়া বিষমুক্ত হইয়া পুনরায় অক্সিজেন লইয়া ফিরিয়া আসে। দিন রাত্রি আমাদের দেহের এই অশ্রান্ত সেবকগুলি অক্সিজেন ও কার্বনিক এ্যাসিডের গ্রহণ ও বর্জনের কাজ করিতেছে। অনুক্ষণ এই গ্রহণ ও বর্জনের উপরই আমাদের জীবন নির্ভর করে। এই গ্রহণ ও বর্জনের দ্বারাই আমাদের দূষিত রক্ত অনুক্ষণ পরিষ্কৃত হইতেছে।

বিশুদ্ধ বায়ু হইতে গৃহীত অক্সিজেনের দ্বারাই আমাদের দেহে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়। যেমন উনুনের আগুন অক্সিজেন বায়ু ব্যতীত জ্বলিতে পরে না, তেমনি দেহের অগ্নিকেও জ্বালাইয়া রাখিবার জন্য সর্বদা অক্সিজেন বায়ুর আবশ্যক হয়। খাদ্যের সহিত আনীত কার্বনের সহিত মিশিয়া অক্সিজেন আমাদের দেহে জীবতাপ উৎপন্ন করে। কাঠ বা কয়লা যদি বায়ু সাহায্যে দগ্ধ করা যায়, তবে এইরূপ তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপ ব্যতীত আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। যখন মানুষ মরিয়া যায়, তখন তাহার দেহে আর এই তাপ থাকে না। এই তাপই দেহে সর্ব প্রকার শক্তি উৎপন্ন করে। খাদ্য-সার যখন তন্তুর আকারে দেহের ভিতর অক্সিজেনের আগুনে পুড়িতে থাকে তখনই দেহে শক্তি উৎপন্ন হয়।

এই জন্য আমাদের দেহে অক্সিজেনের উপযোগিতা সমস্ত মূল্যের অতীত।

[২]

কিন্তু ফুসফুস বাহির হইতে বায়ু গ্রহণ করিয়া তখনই মাত্র দেহের কাজে লাগাইতে পারে যদি বায়ু নির্মল হয়। যদি বায়ু দূষিত থাকে, তবে

ফুসফুসের রক্তকোষগুলি কেবল অক্সিজেনই গ্রহণ করে না, যে-পথে রক্ত অক্সিজেন গ্রহণ করে, বায়ু দূষিত থাকিলে বায়ুর দূষিত অংশও সেই পথে রক্তের ভিতর সংক্রামিত হয়। আমাদের মনে রাখা উচিত, যতবারই আমরা প্রশ্বাস বায়ু গ্রহণ করি, ততবারই দেহের রক্ত বাহিরের বায়ুর সহিত সংস্পর্শে আসে। যদি বায়ু দূষিত হয়, রক্ত তাহাতে দূষিত হইবেই। কিছুদিন পর্যন্ত দূষিত বায়ু গ্রহণ করিলে পাণ্ডুরতা, ক্লান্তি, অগ্নিমান্দ্য এবং যে-কোনরূপ ফুসফুসের রোগ হইতে পারে (C. W. Kimmins—The chemistry of life and death—P. 81)।

আমাদের দেহ-দুর্গে প্রবেশ করিবার দুইটি মাত্র রাজপথ আছে। ইহার একটি মুখগহ্বর, অন্যটি নাসিকা। কু-ভোজন হইতে যেমন দেহে রোগ উৎপন্ন হয়, দূষিত বায়ু গ্রহণ করিলেও তেমনি রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। এই জন্যই স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে নির্মল বায়ু গ্রহণ ও দূষিত বায়ু বর্জন একান্তভাবে আবশ্যক।

রক্তই দেহের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া দেহকে পুষ্ট করে। কিন্তু দূষিত বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া রক্তই যদি দূষিত হয়, তবে সে আর দেহকে তেমন ভাবে পুষ্ট করিতে পারে না। দেহ তখন দুর্বল হইয়া পড়ে এবং সমস্ত দেহে রোগ প্রবণতার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই জন্যই যথাসম্ভব দীর্ঘ সময় বাহিরে মুক্ত হাওয়ায় থাকা প্রয়োজন।

বাহিরে মুক্ত হাওয়ায় থাকাই শরীর ভাল রাখিবার একটা প্রধান উপায়। যদি সম্ভব হয় রাত্রিতেও মুক্ত বারান্দায় ঘুমান উচিত। গ্রীষ্ম কালে মুক্ত আকাশের তলেও শুইয়া থাকা যাইতে পারে। পশ্চিমাঞ্চলে লোকে তাহাই করে। প্রথম প্রথম মুক্ত হাওয়ায় শুইলে একটু সর্দির মত হইতে পারে, কিন্তু ক্রমশ বাহিরে শোয়া অভ্যাস করিয়া লইলে, বাঁচিয়া থাকিতে সর্দি হওয়া কঠিন হয়। অতি পুরাতন ও দুরারোগ্য যে-সর্দি তাহাও কেবলমাত্র বাহিরে শুইলেই আরোগ্য হইতে পারে।

আমি একটি লোককে জানি, সর্দিই ছিল তাহার প্রধান রোগ। প্রথম তার নাক দিয়া টপ টপ করিয়া জল পড়িত। তাহার পর সর্দি একটু ঘন হইত। তাহার পর পাকা কাঁঠালের কোয়ার মত তাহার শ্লেষ্মা পড়িত। শেষে তাহা শুকাইয়া গেলেই আবার নাক দিয়া জল পড়িতে আরম্ভ হইত। সে কখনও সহজভাবে নিশ্বাস টানিতে পারিত না এবং দিনে কুড়ি পঁচিশটি পর্যন্ত হাঁচি দিত। এইভাবে বৎসরের পর বৎসর তাহার গিয়াছে। অবশেষে ঐ-ভদ্রলোক একটি লোকের পরামর্শে বাহিরে মুক্ত বারান্দায় শোয়া অভ্যাস করিবার পর দেখা গেল, তাহার সর্দি আর নাই এবং তাহার ফুসফুস শুকাইয়া ঝরঝরে হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু সকল লোকেরই বাহিরে বারান্দায় শুইবার সুবিধা নাই। যাহাদের সে-সুবিধা না থাকে, তাহারা ঘরের জানালা খুলিয়া ঘুমাইতে পারেন।

অনেকে শীতের রাত্রে লেপ মুড়ি দিয়া ঘুমায়। ইহা দেহের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। প্রত্যেক ঘণ্টায় প্রত্যেকটি লোক প্রায় আট গ্যালন বিষাক্ত কার্বনিক এ্যাসিড নিশ্বাসের সহিত বাহির করিয়া দেয়। লেপের নীচে ঐ বিষাক্ত এ্যাসিডগুলি আটকাইয়া তাহারা পুনঃ পুনঃ তাহা নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করে। অনেক সময় একাধিক লোক লেপের নীচে থাকে। তখন তাহারা পরস্পর পরস্পরের শরীরের বিষ গ্রহণ করে। ইহাতে রক্ত দূষিত না হইয়া পারে না।

নিশ্বাসের সহিত যে-যান্ত্রিক বিষ (organic matter) নির্গত হয়, তাহা এত বিষাক্ত যে, তাহা একবারেই অনেকখানি স্থান পর্যন্ত বিষাক্ত করিয়া দেয়। অনেক সময় এই বিষাক্ত বায়ু গ্রহণে মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে। ফ্রান্সের প্রতিষ্ঠাপন্ন চিকিৎসক ডাঃ ব্রাউন সিকোয়ার্ড (Dr. Brown Sequard) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ঐ বিষ অতি স্বল্প মাত্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তুগুলির দেহে ঢুকাইয়া দিলে তাহাদের প্রায় তখন

তখন মৃত্যু ঘটে (J. H. Kellogg—Second Book of Physiology & Hygiene, P. 136)।

কোন প্রাণীকে বায়ুশূন্য স্থানে রাখিলে যে তাহার সত্বর মৃত্যু হয়, দেহ হইতে এই ভীষণ বিষ না বাহির হইতে পারাই তাহার প্রধান কারণ। যে-বিষ দেহ হইতে না বাহির হইতে পারিলে লোকের মৃত্যু হয়, সেই বিষ পুনরায় দেহে টানিয়া নিলেও লোক মরিয়া যাইতে পারে।

নিদ্রার সময়েও এমন ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য যেন প্রত্যেক প্রশ্বাসের সহিত বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ করা যায়। এই জন্য ঘরের ভিতর এমন স্থানটিতেই শয্যা রচনা করা উচিত, যেখানে সর্বদা বাতাস খেলে। যে-স্থানে জীবনের অর্দ্ধেক সময় কাটিয়া যায়, সে-স্থান যথাসম্ভব মুক্ত ও পরিষ্কার রাখাই আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শয়ন ঘরটাই অধিকাংশ লোক মালগুদাম হিসাবে ব্যবহার করেন। অনেকে ঘরে এত জিনিস আনিয়া বোঝাই করেন যে, তাহা হইতে উদ্গত গ্যাসে ঘরের হাওয়া ভারি হইয়া যায়।

আমাদের আর্যঋষিগণ গৃহের ভিতর অগ্নিরক্ষা করিতেন। অনেক সময় গৃহের ভিতর আগুন জ্বালিয়া যজ্ঞও করা হইত। ইহাতে যে তাঁহাদের কেবল ধর্ম লাভ হইত তাহাই নয়—ইহার দ্বারা স্বাস্থ্যও রক্ষা হইত। গৃহে আগুন জ্বালিলেই সেই স্থানের বায়ু ঐ-শূন্য স্থানকে পূর্ণ করিতে আসিয়া আগুনের ভিতর দিয়া যাইতে বাধ্য হয়। তাহাতে অগ্নিদ্বারা শোধিত হইয়া গৃহের বায়ু সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত হয় এবং বাহিরের নূতন বায়ুও গৃহে প্রবেশ করে।

খাটের নীচে অথবা ঘরের কোণে, যেখানে বদ্ধ বায়ু আটকাইয়া আছে, একটা আলগা চুলা অথবা হাঁড়িতে আগুন জ্বালিয়া সেই সব স্থানে মাসের মধ্যে একবার করিয়া অগ্নিভাণ্ড ধীরে ধীরে ঘুরাইয়া আনিলে গৃহের হাওয়া সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হয়।

যাহাদের এমন গৃহ যে, কষ্টে বায়ু চলাচল করিতে পারে, তাহারা সপ্তাহে অর্ধ ঘণ্টার জন্য গৃহের ভিতর যথাসম্ভব বড় করিয়া নির্ধূম অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবেনই। বাহির হইতে আলগা চুলায় আগুন জ্বালাইয়া ঘরের ভিতর চুলা লইয়া আসিলে ঘরে তেমন আর ধূমা হইতে পারে না। ঘরে আগুন জ্বালিয়া তাহার ভিতর একটু ঘি দিলে ঘরের হাওয়া খুব বিশুদ্ধ হইবে। যদি ঐ-সঙ্গে দুই একটা স্তোত্র পাঠ করা যায়, তবে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এক সঙ্গে লাভ হইতে পারে।

কেহ কেহ সন্ধ্যাবেলা ঘরের ভিতর সুগন্ধি ধূপ ধুনা দিয়া মনে করেন, তাহারা ঘরের হাওয়া পবিত্র করিতেছেন। কিন্তু উহাও কতকটা ঔষধ ব্যবহার করার মতই বুদ্ধি। ঘরের বায়ু দূষিত থাকিলে কোন ধূপধুনাতেই তাহা বিশুদ্ধ হয় না। ঘরে মাঝে মাঝে আগুন জ্বালাইয়া ঘরের হাওয়া পরিষ্কার করিয়া ধূপ-ধুনা দিলেই তবে উপকার হয়।

[৩]

গৃহের হাওয়া বিশুদ্ধ রাখা যেমন আবশ্যক, প্রত্যেক দিন বাহিরের নির্মল হাওয়া গ্রহণ করাও তেমনি দরকার। শীতল হাওয়ায় ফুসফুস অত্যন্ত সবল হয় একং ফুসফুসের যত কিছু ব্যাধি আছে আরোগ্য হয়। এই জন্য প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালে ঘণ্টা খানেক করিয়া ভ্রমণ করিতে পারিলে যথেষ্ট উপকার হয়। ভোর বেলা যখন সূর্য উঠে তখন তরুণ আলো গায় মাখাইয়া লইতে পারিলেই উপকার হয় সর্বাপেক্ষা বেশী।

সুস্থ শরীরে বিমল হাওয়ার যদি আবশ্যকতা থাকে, অসুস্থ দেহে ইহার আবশ্যকতা আরও বেশী। যেমন লোহা পোড়াইবার সময় হাপড়ে বেশী করিয়া বাতাস দেওয়া আবশ্যক, তেমন প্রকৃতি যখন দেহের আবর্জনা পোড়াইতে ব্যস্ত থাকে, তখন আভ্যন্তরীন অগ্নিকে প্রজ্বলিত রাখিবার জন্য প্রকৃতিকে যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন যোগান প্রয়োজন। রোগীর ঘরের দরজা জানালা যদি বন্ধ থাকে, তবে প্রকৃতি দহনকার্যের

জন্য যথেষ্ট অক্সিজেন পায় না। এই জন্য রোগ আরোগ্য হইতেই বেশী সময় লাগে। রোগীর ঘরে দরজা জানালা সর্বদা এরূপভাবে খুলিয়া রাখা আবশ্যক যেন রোগীর ঘরে সর্বদা বায়ু চলাচল করিতে পারে। কিন্তু লক্ষ রাখিতে হইবে, রোগীর গায় যেন দমকা হাওয়া কখনো না লাগে। রোগীর ঘরের ভিতর দিয়া সর্বদা বায়ু চলাচল করিবে, কিন্তু রোগীর গায় বাতাস লাগিবে না, এইরূপ ভাবে ঘরের ভিতর রোগীর শয্যা রচনা করিতে হয়।

শীতকালে যদি বাহিরের আবহাওয়া খুব ভাল না থাকে, তবে রোগীর গলা পর্যন্ত ঢাকিয়া প্রতিদিন অন্ততঃ কতক্ষণের জন্য ঘরের সমস্ত দরজা জানালা খুলিয়া দিতে হয়। এইরূপ করিলে রোগীর ঠাণ্ডা লাগিবার কোন ভয় থাকে না।

যাহারা কাসরোগে কষ্ট পায়, মুক্ত শীতল হাওয়া তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। নিয়মিত প্রাতঃভ্রমণ করিলে সর্দি, কাশি, হাঁপানি ও যক্ষা প্রভৃতি রোগও নির্দোষরূপে আরোগ্য হইতে পারে।

ইংলণ্ডে যুবকদের যখন যক্ষ্মা হয়, রোগের প্রথম লক্ষণ দেখা দিলেই তাহারা কৃষিক্ষেত্রের কার্যে নামিয়া যায়। ইহা তাহাদের জীবনে শ্রমের সহিত মুক্ত হাওয়াকে যুক্ত করে। কয়েক বৎসর কৃষিক্ষেত্রে কার্য করিয়াই অনেক সময় তাহারা রোগমুক্ত হয়।

পৃথিবীতে সর্বত্রই দেখা যায়, মালী, কৃষক, কৃষিক্ষেত্রের মজুর ও জেলে প্রভৃতি যাহারা মুক্ত হাওয়ায় কাজ করে, তাহারা অত্যন্ত সবল ও সুস্থকায় হয় এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীদের তুলনায় তাহারাই ফুসফুসের রোগে সর্বাপেক্ষা কম ভোগে।

সর্বপ্রকার ফুসফুসের রোগেই শীতল ও নির্মল হাওয়া বিশেষ উপকারী। কাসি উঠা মাত্র যদি অনাবৃত দেহে মুক্ত হাওয়ায় ভ্রমণ করা যায়, তবে তখন তখনি বুক ঠাণ্ডা হইয়া কাস থামিয়া যায়। হাঁপানিতে

যখন দম বন্ধ হইয়া আসে, তখন মুক্ত হাওয়াতে দাঁড়াইলে রোগী অনেকটা সুস্থ হয়। কিন্তু সর্বদা শীতল ও শুকনা হাওয়া নেওয়া আবশুক। গরম বাতাস ফুসফুসকে অত্যন্ত দুর্বল করে এবং যক্ষ্মারোগের আক্রমণের পক্ষে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে।

অনেকে ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে জ্বর রোগীকে সর্বদা ঢাকিয়া রাখে। রোগী যখন গরমে ছটফট করে তখন তাহাকে ঢাকিয়া রাখিলে তাহার বিশেষ অনিষ্ট হয়। ইহাতে আভ্যন্তরীণ তাপ বাহির হইতে পারে না এবং অনেক সময় ঐ-তাপ রোগীর দেহে বদ্ধ হইয়া রোগীর মৃত্যু ডাকিয়া আনে।

রোগী প্রত্যেক দিন ঘরের কয়টা জানালা খুলিয়া রাখিয়া ঘরের ভিতর অথবা বাহিরের মুক্ত শীতল হাওয়ায় যদি পনের মিনিট হইতে কুড়ি মিনিট পর্যন্ত যথা সম্ভব নগ্ন গাত্রে বেড়াইতে পারে, তবে রোগীর বিশেষ উপকার হয়। কিন্তু প্রথম প্রথম দুই চার মিনিট করিয়া হাঁটা অভ্যাস করা উচিত। বায়ু যত শীতল হয় রোগীর তত উপকার হয়। কিন্তু শরীরকে এই ভাবে শীতল করার পরই আবার গরম করা বিশেষ আবশুক। গরম না করিলে উপকারের পরিবর্তে অপকার হওয়ারই বিশেষ সম্ভাবনা। যেমন হিপ-বাথ প্রভৃতি লইয়া স্নান করিয়া আবার শরীরকে গরম করিয়া লইতে হয়, এই চিকিৎসাও তেমনি তাহার প্রকার ভেদ মাত্র।

সমস্ত রোগের পক্ষেই বিমল হাওয়া একন্ত আবশ্যক। সর্দি, বাতব্যাধি, টাইফয়েড, কলেরা, ক্যান্সার প্রভৃতি যাবতীয় রোগ আরোগ্যের পক্ষে বিমল হাওয়া যথেষ্ট সাহায্য করে (Adolph Just—Return to Nature, P. 67)।

স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষেও মুক্ত হাওয়া একান্ত অপরিহার্য। কেবল যদি যথাসম্ভব মুক্ত হাওয়ায় থাকা যায় এবং আহারের দিকে দৃষ্টি থাকে, তবে দীর্ঘ জীবন লাভের পক্ষে আর বিশেষ কিছুরই আবশ্যক হয় না।

চতুর্দশ অধ্যায়

আতপ চিকিৎসা

[১]

একজন বিখ্যাত ডাক্তার (Dr. Aufrecht) একবার নানাজাতীয় জীবজন্তুর ভিতর ডিপথিরিয়া ও যক্ষ্মার জীবাণু ইনজেক্ট করিয়া দেন। তাহাদের কতগুলিকে আলোতে এবং কতগুলিকে অন্ধকারে রাখা হয়। যে-জন্তুগুলিকে অন্ধকারে রাখা হইয়াছিল, দুই তিন দিনের ভিতর তাহারা মরিয়া যায়। আর যাহাদের আলোতে রাখা হইয়াছিল, দেখা গেল, তাহাদের প্রায়ই সারিয়া উঠিয়াছে (Otto Juettner, M.D., Ph.D. —Physical Therapeutic Methods, P. 190)।

সূর্যকর এইরূপ সকল জীবাণু ধ্বংস করে। জীবাণু ধ্বংস করিতে সূর্যকরের মত স্বাভাবিক উপায় আর কিছুই নাই। বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্রই যক্ষ্মা, কাউর (Eczema) প্রভৃতি চর্মরোগ, সর্বপ্রকার ফুসফুসের ব্যাধি এবং ছেলেদের রিকেট প্রভৃতি রোগ সূর্যকর সাহায্যে আরোগ্য করা হইতেছে। অন্যান্য রোগেও সূর্যকরের আশ্চর্য গুণ দেখিয়া ডাক্তারেরা বিস্মিত হইয়া গিয়াছেন।

সূর্যকরের মত বলকারক ও রোগ আরোগ্যকারক জগতে খুব কমই আছে।

ঋগ্বেদ বলিয়াছেন, সূর্যই স্থাবর জঙ্গম সকলের ভিতর প্রকৃত জীবন (১।১১৫।১)।

চতুর্বেদের অনেক মন্ত্রেই সূর্যের রোগ আরোগ্য করিবার ক্ষমতার কথা আছে। সূর্যনমস্কার (Sun worship) পৌত্তলিকতা নয়। রৌদ্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া সূর্যের স্তব পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া আমাদের পূর্বপুরুষগণ ধর্মের সহিত স্বাস্থ্যবিধিকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন।

'সূর্য ব্যতীত জীবনের কথা কল্পনাও করা যায় না। চেতন ও অচেতন যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে, তাহাদের সকলের শক্তিই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সূর্য হইতে আসিয়াছে। জলস্রোত ও বায়ুর বেগ, জীবজন্তুর বৃদ্ধি, কয়লা ও কাঠের দাহিকা শক্তি, সমস্তই পৃথিবীতে সূর্যের শক্তির বিভিন্ন ক্রিয়া মাত্র।'

সূর্যরশ্মি যাহার উপর পতিত হয়, তাহার উপরই একটা হিতকর প্রভাব বিস্তার করে। যে-সকল শাকসবজি আলোতে জন্মে, দেখা গিয়াছে অন্ধকারের সবুজি অপেক্ষা তাহা অনেক বেশী উপকারী।

যে-সমস্ত গরুকে বাহিরে যাইতে দেওয়া হয় না এবং সারাদিন ঘরে রাখিয়া খাওয়ান হয়, সেই সকল গরুর দুগ্ধে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভাইটামিন থাকে না। এই ভাইটামিন অভাবেই ছেলেদের দৈহিক বৃদ্ধির অভাব ঘটে এবং রিকেট (মস্তক বৃদ্ধি ও মেরুদণ্ডের বক্রতা) প্রভৃতি রোগ জন্মে। গরুর দুগ্ধে যথেষ্ট ভাইটামিন উৎপন্ন করিতে হইলে তাহাকে রৌদ্রে মাঠের ভিতর ছাড়িয়া ঘাস খাওয়ান উচিত।

সূর্যকরের ভিতর যাহা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় জিনিস—তাহা Ultra violet rays। সূর্যকরের ভিতরে যে-সাতটা রং আছে, তাহা যদি ভাগ করিয়া পরদার উপর ফেলা যায়, তবে তাহার প্রথম রঙ পড়ে লাল এবং শেষ রং পড়ে বেগুনী। এই সাতটা আলো চোখে দেখা যায়। কিন্তু যা চোখে দেখা যায় না, এইরূপ দুইটা আলোও ইহা ব্যতীত পড়ে। ইহার একটা পড়ে লালেরও প্রথমে এবং অপরটা পড়ে বেগুনীরও শেষে। Ultra violet অর্থ beyond violet অর্থাৎ ভাওলেট যে আলো, তারো

পরের আলো। এই আলোর জীবাণু ধ্বংসের বিশেষ ক্ষমতা আছে ইহাই ভাইটামিনের অকৃত্রিম উৎস। অনাবৃত চর্মের উপর সূর্য কিরণ গ্রহণ করিলে রক্তের ভিতর ভাইটামিন 'ডি' শোষিত হয়। শস্যের ভিতরও সূর্যকর পড়িলে শস্যে তাহা শোষিত হয় এবং শস্য তাহা ধরিয়া রাখে।

সূর্যকরের ভিতর Ultra violet rays সর্বাপেক্ষা বেশী থাকে প্রাতঃকালে। এই জন্য প্রাতঃকালের সূর্যকিরণ জীবনী শক্তি দান করে। প্রথম যখন সূর্য উঠে, তাহার ভিতর প্রতিদিন ভ্রমণ করিতে পারিলে চর্ম পরিষ্কৃত হয়, দেহে যথেষ্ট পরিমাণ লাল রক্ত জন্মে, সমস্ত দেহ সবল হয়, দেহে রোগ তাড়াইবার শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সমস্ত দেহে নবজীবনের আবির্ভাব হয় (Bhavanrao Srinivasrao, Raja of Oudh—Surya Namaskars, P. 75-79)।

এই জন্য স্বাস্থ্যলাভের নিমিত্ত যথাসম্ভব সূর্যকর গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু দ্বিপ্রহরের যে সূর্যকর তাহা সর্বদা বর্জনীয়। কারণ সূর্যকরের ভিতর যাহা সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর তাহা এই সময় বেশী থাকে।

গৃহের ভিতর যাহাতে সূর্যের কর সর্বদা প্রবেশ করিতে পারে, গৃহও সেইভাবে নির্মাণ করা উচিত। বাড়িতেও বৃক্ষ এই পদ্ধতিতে সাজান উচিত, যাহাতে সূর্যকর বাধা প্রাপ্ত না হয়। খুব মূল্যবান গাছ হইলেও বাড়ির পূর্বদিকে তাহা জন্মিতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু বাড়ির পশ্চিম দিকে বড় গাছ উৎপন্ন করিয়া অপরাহ্নের সূর্যকরকে বাধা দেওয়াই উচিত। এই জন্য বাড়ি নির্মাণে প্রচলিত উপদেশ আছে—পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ। অর্থাৎ বাড়ির পূর্বদিকে পুকুর করিয়া মুক্ত রাখিবে এবং পশ্চিমদিকে বাঁশ লাগাইয়া আলো ও ছায়ার সমতা রক্ষা করিবে।

সূর্য কিরণের মত পূতিগন্ধ নিবারকও খুব কম আছে। 'সূর্য ব্যতীত নদীর জল এইরূপ পরিষ্কার থাকার কথা আমরা কল্পনাও করিতে পারিতাম না।' সূর্যকর যেখানে পতিত হয়, সেই স্থানেরই দুর্গন্ধ নষ্ট করে। এই

জন্য বাড়ির ভিতর যেখানে অপরিষ্কার জমা হইবার সম্ভাবনা বেশী, সেখানে যাহাতে সূর্যকর পতিত হয়, সর্বদা তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

[২]

আতপ-স্নান গ্রহণ করিবার পদ্ধতি

স্বাস্থ্য লাভের জন্য সূর্যকর যেমন অপরিহার্য, রোগ আরোগ্যেও ইহার প্রয়োজনীয়তা তেমনি অত্যন্ত বেশী। পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিদিন সূর্যতাপ গ্রহণ করিতে পারিলে, ইহা দ্বারা বহু রোগ আরোগ্য হইতে পারে। কিন্তু এলোমেলো ভাবে রৌদ্রের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইলেই উপকার হয় না। সূর্য-স্নান গ্রহণ করিবার বিশেষ একটা পদ্ধতি আছে। ঐ-পদ্ধতি অনুযায়ী সূর্যকর গ্রহণ করিলেই তবে উপকার হয়।

রোগীদিগকে সূর্যকরে রাখিবার সময় প্রথমেই কখনও তাহাদের সর্বদেহ রৌদ্রের ভিতর রাখিতে নাই অথবা প্রথম দিনই এক সঙ্গে সুদীর্ঘ সময়ের জন্য রোগীকে রৌদ্রে রাখিতে নাই। তাহাকে ধীরে ধীরে সূর্যতাপে অভ্যস্ত করিয়া লইতে হয়।

প্রথম দিন রোগীর পায়ের পাতা দুইটি (feet) মাত্র রৌদ্রে রাখা কর্তব্য। দ্বিতীয় দিন সমস্ত পা (feet and legs) রৌদ্রে রাখিতে হয়। এই ভাবে তৃতীয় দিনে উরু (thigh) পর্যন্ত সমস্ত পা, চতুর্থ দিনে নাভি পর্যন্ত নিম্ন দিকের সমস্ত অংশ (abdomen) এবং পঞ্চম দিন হইতে দশম দিন পর্যন্ত গলা পর্যন্ত সমস্ত দেহ (thorax) রৌদ্রের ভিতর রাখা কর্তব্য। দশম দিনের পর রোগীর সম্পূর্ণ দেহ রৌদ্রের ভিতর আনা যাইতে পারে (E. J. O' Meara, I. M. S.—The Medical Guide for India and Index of Treatment, P. 340)।

রোগীকে রৌদ্রে রাখিবার সময়ও এই ভাবে ক্রমশ ধীরে ধীরে বাড়াইতে হয়। প্রথম দিন রোগীকে পাচ মিনিট অন্তর অন্তর ৩ বার ৩ মিনিট করিয়া ৯ মিনিটের জন্য রৌদ্রে রাখা আবশ্যক। দ্বিতীয় দিন ঐ-ভাবে পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর প্রতিবার ৬ মিনিট, তৃতীয় দিন প্রতিবার ৯ মিনিট, এই ভাবে দিন প্রতিবারে তিন মিনিট এবং মোট নয় মিনিট করিয়া বাড়াইয়া দশম দিন হইতে তিন বার অর্ধ ঘণ্টা করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। এই ভাবে ১৫ দিন পর্যন্ত দিনে তিন বার সূর্যকর গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহার পর রোগীর সহ্য হইলে এবং আরাম বোধ হইলে ঐ-ভাবে রোগী দিনে ৪ বার ও আতপ স্নান গ্রহণ করিতে পারেন।

প্রত্যেক বার রৌদ্রতাপ প্রয়োগ করিয়াই রোগীকে ৫ মিনিটের জন্য ছায়ায় নিতে হইবে। তাহার পর এক খানা ভিজা পরিষ্কার তোয়ালে দ্বারা তাহার দেহের আতপ স্নাত অংশ অথবা রোগী ঘামাইয়া গেলে রোগীর সমস্ত দেহ, শীতল অথবা নাতিশীতোষ্ণ জলে ভিজান তোয়ালে দ্বারা ভাল করিয়া মুছিয়া পরিষ্কার ও স্নিগ্ধ করিয়া পুনরায় তাহাকে রৌদ্রে নিতে হয়। সূর্যতাপ গ্রহণ করিবার সময়, সকল অবস্থাতেই রোগীকে যে ঘামাইতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। রোগীর দেহ গরম হইলেই তাহাতে উপকার হয়।

সাধারণত রোগীরা মাটির উপর মাদুর বিছাইয়া অথবা এক খানা খাটিয়ার উপর সূর্য স্নান গ্রহন করিতে পারেন। খুব দুর্বল রোগীদিগকে ঘরের ভিতর শয্যায় শোয়াইয়াই আতপ স্নান প্রয়োগ করা কর্তব্য। যদি ঘরে কাচের বড় জানালা থাকে, তবে কাচের ভিতর দিয়া রৌদ্র আসিলে কোন ক্ষতি হয় না।

সূর্যকর গ্রহণ করিবার সময় রোগীর দেহ যথাসম্ভব উলঙ্গ রাখা আবশ্যক। যদি সূর্যকর চর্মের উপর পতিত হয়, তবেই তাহাতে

সর্বাপেক্ষা উপকার হইয়া থাকে। যদি রোগীর গায় কাপড় দিতেও হয়, তাহা অত্যন্ত হালকা ও জাল জাল হওয়া উচিত।

আতপ স্নান গ্রহণ করিবার সময় সর্বদাই মাথাটি রৌদ্র হইতে রক্ষা করা কর্তব্য। *যখন সমস্ত দেহ রৌদ্রের ভিতর রাখিতে হইবে, তখন রৌদ্রের ভিতর যাইবার পূর্বে মাথা, মুখ ও ঘাড় ভাল করিয়া ধুইয়া লইয়া এক খানা ভিজা তোয়ালে দ্বারা ঐ-সকল স্থান আবৃত করা উচিত। ঐ তোয়ালে আবার এক খানা কালো রঙের কাপড়ের নেকড়া দ্বারা ঢাকিয়া লইতে পারিলে খুব ভাল হয়। ভিজা তোয়ালে শুষ্ক অথবা উত্তপ্ত হইয়া উঠা মাত্র বার বার পরিবর্তন করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ইহার উপর মাথার দিকে একটা ছাতা রাখিয়া মাথা ও মুখ ছায়াতে রাখিতে পারিলে খুব ভাল হয়। মাথাটি যাহাতে ঠাণ্ডা থাকে, সে-বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। কারণ মাথায় যদি রৌদ্র লাগে তবেই আতপ-স্নানের পর বিভিন্ন অপ্রীতিকর উপসর্গ আসিয়া জুটে Dr. Wilhelm Winternitz—A System of Physiologic Therapeutics, Vol. IX, (P. 213—215)।

প্রত্যেক বার আতপ-স্নান গ্রহণ করার সময়েই এবং তাহার পরই রোগী যথেষ্ট আরাম বোধ করিবে। যদি আতপ-স্নান গ্রহণ করার পর রোগীর অবসাদ ও অনিদ্রা আসে, মাথাধরে, মাথাঘুরায় অথবা রোগীর দেহে অত্যন্ত উত্তেজনা আসে, তবে বুঝিতে হইবে রোগীকে অত্যন্ত বেশী সময় রৌদ্রে রাখা হইয়াছে অথবা যথা নিয়মে রৌদ্রে রাখা হয় নাই (A. Rollier, M. D.—Heliotherapy, P. 6-21)। এই রূপ হইলে কোনই উপকার হয় না। কারণ সূর্যকর যখন ঠিক ঠিক ভাবে প্রয়োগ করা হয়, তখনই কেবল তাহা আরোগ্যের পক্ষে সহায়ক হইতে পারে। এই জন্য সর্বদাই প্রথম প্রথম অল্প সময়ের জন্য তাপ গ্রহণ করিয়া ক্রমশ সময় বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

নির্দিষ্ট সময় আতপ-স্নান গ্রহণ করিবার পর রোগীর সমস্ত দেহ ভিজা তোয়ালে দ্বারা মুছিয়া শীতল করিয়া তাহাকে একটা হিপবাথ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রোগী খুব দুর্বল হইলে তাহাকে হিপবাথের পরিবর্ত্তে সিজবাথ দেওয়া যাইতে পারে। ইহার পর রোগীকে স্নান করান কর্ত্তব্য। খুব দুর্ব্বল রোগীকে স্নানের পরিবর্ত্তে শীতল ঘর্ষণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আতপ-স্নান গ্রহণ করিবার পর এইরূপে দেহ শীতল না করিলে গুরুতর অনিষ্ট হইতে পারে। স্নানের পর পুনরায় রোগীকে জামা কাপড় পরাইয়া তাহার চর্ম্মের তাপ ফিরাইয়া আনা কর্ত্তব্য (Louis Kuhne—The New Science of Healing, P. 106)।

অন্য ভাবেও আতপ-স্নান গ্রহণ করা যাইতে পারে। দশ দিন পর রোগী পূর্ণ আতপ-স্নানে অভ্যস্ত হইলে, এক খানা শুকনা কাপড় বা আলোয়ান দ্বারা গলা পর্যন্ত রোগীর সর্ব্ব দেহ আবৃত করিয়া দিতে হয়। তাহার পর শরীর ভাল করিয়া গরম হইয়া উঠিলে শুষ্ক বস্ত্র সরাইয়া নিয়া এক খানা কাপড় শীতল জলে ডুবাইয়া এবং অর্দ্ধেক নিংড়াইয়া কাঁধ হইতে জানু পর্যন্ত ঢাকিয়া দিতে হইবে। মাথা সর্ব্বদাই ভিজা তোয়ালে দ্বারা ঢাকা থাকিবে এবং মাথা ও মুখ সর্ব্বদাই ছায়াতে রাখিতে হইবে। যদি মুখ বাহিরে থাকে, তবে নাকটি বাহিরে রাখিয়া পুরু ভিজা নেকড়া দ্বারা সমস্ত মুখ ঢাকিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি সূর্যতাপ খুব বেশী থাকে এবং রোগী খুব বেশী গরম বোধ করে, তবে পূর্ব্বের ভিজা নেকড়ার উপর নূতন আর একখানা ভিজা নেকড়া দেওয়া যাইতে পারে। যখন ঐ-কাপড় আংশিকভাবে শুকাইয়া যাইবে তখনি শীতল জল ছিটাইয়া তাহা বার বার ভিজাইয়া দিতে হইবে। রোগী ইচ্ছা করিলে ভিজা কাপড়ের পরিবর্তে ভিজা মাটিও সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া দিতে পারেন। সূর্যতাপ গ্রহণ করিবার পর ঐ-মাটি

ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা (tepid water) ধুইয়া ফেলিতে হয় (K. L. Sarma—Practical Nature cure, Part II, Page 40—41)।

দেহের বিভিন্ন আংশিক রোগেও সূর্যকর মাত্র নির্দিষ্ট অঙ্গে প্রয়োগ না করিয়া সর্বাঙ্গে প্রয়োগ করিলে অধিকতর ফল হয়। সূর্যকর সমস্ত দেহের উপর পড়িলে দেহের সমস্ত যন্ত্রেরই ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ইহাতে দেহের অংশ বিশেষের রোগও সহজে আরোগ্য হয়। তবে দুরারোগ্য ক্ষত প্রভৃতি রোগে যখন দেহের কোন অঙ্গ আক্রান্ত হয় তখন পূর্ণ দেহে আতপ-স্নান গ্রহণ করিলেও মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট অঙ্গেই কেবল সূর্যতাপ গ্রহণ করা উচিত।

দুর্বল রোগীরা সর্বদাই শুইয়া থাকিয়া সূর্যকর গ্রহণ করিবেন। সবল রোগীরা মাথাটি শীতল ও ভেজা তোয়ালে দ্বারা ঢাকিয়া রৌদ্রের ভিতর হাঁটিয়া বেড়াইতে পারেন অথবা খেলাও করিতে পারেন। মেদবৃদ্ধি (Obesity) অথবা বহুমূত্র রোগীদের পক্ষে এইরূপ ক্রীড়া বিশেষ উপকারী (Physiologic Therapeutics, Vol. IX,—p. 215-216)

যাহারা হাঁটিয়া চলিয়া বেড়াইতে পারে, তাহারা একখানা ভিজা কাপড় দ্বারা সর্বদেহ আবৃত করিয়া এবং মাথা ও মুখ ঢাকিয়া রৌদ্রে বেড়াইলে অতি সহজে আতপ-স্নান গ্রহণ করা হয়।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরও মাথায় ভিজা তোয়ালে ও গায় ভিজা কাপড় দিয়া রৌদ্রে বসাইয়া রাখা যাইতে পারে। যতবার কাপড় শুকাইয়া আসে ততবার জল ছিটাইয়া ছিটাইয়া কাপড় শীতল করিয়া দিতে হয়। তাহার পর তাহাদিগকে ছায়ায় আনিয়া ভিজা তোয়ালে দ্বারা গা ভাল করিয়া মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া কর্তব্য (Practical Nature Cure, Part II. P. 42)।

[৩]

বিভিন্ন রোগে আতপ-স্নানের ব্যবস্থা

যে কারণে বাষ্প-স্নানে উপকার হয়, সেই কারণেই আতপ-স্নানেও উপকার হইয়া থাকে। আতপ-স্নান গ্রহণ করিলে, লোমকূপগুলি খুলিয়া যায় এবং দেহ হইতে প্রচুর ঘর্ম নির্গত হয়। সূর্যতাপে দেহের বিজাতীয় দূষিত পদার্থ গলিয়া ঘর্মের সহিত বাহির হইয়া গেলে স্বাস্থ্য আপনা হইতে ভাল হয় এবং রোগ আপনি সারিয়া যায়।

যত প্রকার আলো চিকিৎসা আছে, তন্মধ্যে সূর্যকরই সর্বাপেক্ষা বেশী উপকারী। সূর্যের কর চর্মের উপরই যে কেবল প্রভাব বিস্তার করে তাহা নয়, ইহা চর্মের ভিতর দিয়া দেহের সুদূর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং সমস্ত জীবকোষ, তন্তু ও হার্ট প্রভৃতি দেহের প্রত্যেক যন্ত্রকে উদ্দীপিত করিয়া তোলে। তাহার ফলে দেহের প্রত্যেক যন্ত্রের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই জন্য পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিদিন সূর্যতাপ গ্রহণ করিলে ইহা দ্বারা বহু রোগ আরোগ্য হইতে পারে।

পুরাতন রোগে দেহের জীবতাপ প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক সময় কম থাকে। এই জন্য সমস্ত উত্তাপের যে মূল উৎস সেই সূর্য হইতে উত্তাপ আহরণ করিয়া দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি করিতে হয়।

দুর্বল রোগী অথবা যে-সকল শিশুর দেহ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে না অথবা যাহারা পিতামাতার নিকট হইতে দুর্বল দেহ পাইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এই স্নান বিশেষ উপকারী।

যে-সমস্ত রোগে দেহের বিভিন্ন যন্ত্রের রক্ত হইতে পুষ্টি গ্রহণ করিবার ক্ষমতা ক্ষীণ হইয়া আসে ঐ-সকল রোগে আতপ-স্নান বিশেষভাবে উপযোগী। এই জন্য মেহরোগ ও বহুমূত্র রোগে আতপ-স্নান গ্রহণ করা একান্তভাবে কর্তব্য। উহা দ্বারা দেহের জীবকোষ

গঠনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘদিন অজীর্ণ রোগে ভুগিয়া যাহাদের চর্ম শুষ্ক, শক্ত ও মৃতবৎ হইয়া গিয়াছে, প্রতিদিন সূর্যতাপ গ্রহণ করিলে তাহাদের চর্ম আবার সিক্ত, কোমল ও সতেজ হইয়া উঠে। সর্বপ্রকার স্নানবিক দুর্বলতা রোগ ইহাদ্বারা অতি অল্প সময়ে আরোগ্য হয়। যাহাদের রক্ত অপরিষ্কার থাকে আতপ-স্নানে তাহাদের রক্ত বিশুদ্ধ ও রক্ত অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরের হয় (quality is improved)। রক্তশূন্যতা রোগে ইহার দ্বারা দেহের ভিতর নূতন রক্ত উৎপন্ন হইবার যন্ত্রগুলি উন্নতি-লাভ করে এবং দেহের বিষ বাহির হইয়া যায়।

যে-সমস্ত রোগীর যকৃৎ শক্ত হইয়া যায় অথবা যাহাদের দেহের প্রধান কোন যন্ত্র দুর্বল হইয়া যায়, আতপ-স্নানে তাহারা আশ্চর্য ফল লাভ করে। পুরাতন বাতব্যাধি, গ্রন্থিপ্রদাহ ও সন্ধির যক্ষ্মারোগও (tuberculous joint disease) ইহা দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে।

কিন্তু সকল রোগেই আতপ-স্নান গ্রহণ করিতে নাই। সর্বপ্রকার জ্বর রোগে আতপ-স্নান সর্বতোভাবে বর্জনীয়। কিন্তু যদি অল্প অল্প মাত্র জ্বর থাকে তবে ফুসফুসের রোগে আতপ-স্নান গ্রহণ করা যাইতে পারে। তথাপি জ্বর থাকিলেই আতপ-স্নান চলিবে না, ইহাই সাধারণ বিধি। যে-সমস্ত রোগী বাতব্যাধি ও গ্রন্থি-প্রদাহ রোগে ভুগিতেছে, আতপ-স্নানের পর তাহাদিগকে খুব বেশী শীতল জলে অথবা অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্নান করাইতে নাই। শরীরে ঘা থাকিলেও খুব শীতল জলে স্নান ও ঘর্ষণ বর্জন করা উচিত। শীতল জলে স্নানের পর অন্যান্য রোগীদের দেহ ঘর্ষণ করিয়া উত্তপ্ত করিয়া লওয়া আবশ্যক। কিন্তু এই সকল রোগীরা ঘর্ষণের পরিবর্তে কোনরূপ ব্যায়াম করিয়া শরীরটা গরম করিয়া লইতে পারেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

উষ্ণ ও শীতল জলের সমস্যা

প্রাকৃতিক চিকিৎসায় কখনও দেহকে উষ্ণ করিতে হয়, কখনও দেহ শীতল করিতে হয়; কখনও দেহে গরম জল প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়, কখনও আমরা শীতল জল প্রয়োগ করি; কখনও শীতল মাটির পুলটিস দিতে হয়, কখনও গরম জলে ফ্লানেল ভিজাইয়া স্বেদ দেই। সুতরাং কখন গরম প্রয়োগ করিতে হইবে এবং কখন ঠাণ্ডা প্রয়োগ করিতে হইবে, প্রাকৃতিক চিকিৎসায় তাহাই অন্যতম প্রশ্ন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ইহাই, গরম জলের দ্বারা অথবা উষ্ণ প্রয়োগে যে কাজ হয়, শীতল জলের দ্বারাও অবিকল তাহাই হইতে পারে।

গরম জলের প্রয়োগে রক্তগুলি চর্ম পর্যন্ত প্রসারিত হয়। তাহাতে প্রসারিত লোমকূপের ভিতর দিয়া দেহের বিজাতীয় পদার্থ বাহির হইয়া যায়। শীতল জলের প্রয়োগে প্রথম রক্ত ভিতরে চলিয়া গেলেও, ক্ষণকাল পরেই রক্ত সেই শীতল স্থানকে উষ্ণ করিতে ছুটিয়া আসে। তখন সঙ্কুচিত শিরাগুলি প্রসারিত হয় এবং দেহের বিষ, দৃশ্য ও অদৃশ্য ঘর্ম ও গ্যাসের আকারে দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। এই জন্য গরম জলের দ্বারা যে-কাজ হয়, শীতল জলের দ্বারাও অবিকল তাহাই হইতে পারে।

কিন্তু যদিও শীতল জল প্রয়োগে উষ্ণ প্রয়োগের সমস্ত উপকার পাওয়া যায়, উষ্ণ প্রয়োগের যাহা অপকারিতা, তাহা ইহাতে মাত্রই থাকে না। শীতল জল প্রয়োগের ফল ক্ষণেকের জন্য একটু খারাপ মনে হইলেও ইহার

সুদূর প্রসারী ফল অত্যন্ত ভাল, কিন্তু গরম জল প্রয়োগে সদ্য সদ্য যথেষ্ট উপকার হইলেও তাহার শেষ ফল সময় সময় অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়।

শীতল জল প্রয়োগে প্রথম শিরাগুলি সঙ্কুচিত হয় এবং অল্প সময়ের জন্য রক্ত ভিতরে চলিয়া যায়। কিন্তু যেমনি শীতল জল চর্মের উপর পতিত হয়, অমনই স্নায়ুগুলি মস্তকে ফোণ করিয়া জানায়,—দেহ শৈত্য দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। মস্তক তখনই সেই স্থানে রক্তধারা প্রেরণ করে। সঙ্কুচিত শিরা ঠেলিয়া রক্ত হয় তো দ্রুত প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু আস্তে আস্তে রক্ত বিস্তার লাভ করিয়া দেহের সমস্ত চর্ম রক্তে ভরিয়া দেয়। তখন সঙ্কুচিত শিরাগুলি পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী প্রসারিত হয়, নীল রক্তহীন চর্মে গোলাপী আভা ফোটে, শীতল চর্ম উত্তপ্ত হয় এবং লোমকূপ খুলিয়া যায়। এই ফল অনেকক্ষণ পর্যন্ত থাকে।

আবার গরম জল অতি অল্প সময়ে রক্তকে চর্মে টানিয়া আনে এবং ঘর্ম উৎপন্ন করে। কিন্তু রক্ত যেমন দ্রুত আসে তেমনি আবার দ্রুত ভিতরে চলিয়া যায়। তখন বহির্ভাগের রক্তবহা শিরাগুলি পূর্বাপেক্ষা অধিক সঙ্কুচিত হয়, লোমকূপ গুলি বন্ধ হয়, চর্ম শীতল, রক্তশূন্য ও নীল-বর্ণ হইয়া যায় এবং বাহিরের চর্মের অবস্থা এরূপ হয় যে, যে-কোন মুহূর্তে ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুখ করিতে পারে।

এই জন্য শীতল জল প্রকৃত পক্ষে দেহকে গরম করে এবং গরম জল দেহকে শীতল করে।

গরম জলের ন্যায় দুর্বলতাকারী আর কিছুই নাই। ইহা অতি সাময়িক সুফল উৎপন্ন করে, কিন্তু ইহার শেষ ফল অত্যন্ত খারাপ। গরম জলের বাহ্য প্রয়োগ যেমন বহির্দেহকে দুর্বল করে, ইহার অন্তঃপ্রয়োগেও তেমনিই পাকস্থলী প্রভৃতি দুর্বল হইয়া যায়। শীতল জল বাহ্য প্রয়োগে যেমন, আভ্যন্তরীণ পানেও তেমনি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বলকারক টনিক।

দেহের কোন স্থানে প্রদাহ উপস্থিত হইলে, কেহ কেহ গরম জলের

সেক দিবার ব্যবস্থা করেন। ইহাতে গুরুতর ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। প্রদাহের স্থানে সুদীর্ঘ সময়ের জন্য সেক দিলে প্রায়ই তাহা পাকিয়া উঠে। অনেক সময় ডাক্তারেরা অন্ত্র, ডিম্বকোষ এবং মচকানো বা আঘাত-প্রাপ্ত স্থানে গরম সেক দিয়া ঐ-সকল স্থান পাকাইয়া তোলেন। তাহার পরিবর্তে ঐ-সকল স্থানে উষ্ণ পটি (heating compress) প্রয়োগ করিলে বেদনা ও প্রদাহ উভয়ই নষ্ট হয়। পটির নীচে যে মৃদু উত্তাপের সৃষ্টি হয় তাহা বেদনা কমায় এবং পটির শৈত্য প্রদাহ নষ্ট করে।

জল-চিকিৎসায় ষ্টিমবাথ প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ষ্টিমবাথের পর শীতল জলে হিপবাথ নেওয়ায় ও স্নান করায় কোন খারাপ ফল আসিতে পারে না। গরম জলে সেক দেওয়ার পরও সেকের স্থান সর্বদাই শীতল জলে ধোয়াইয়া ফেলা উচিত। যদি কেহ ষ্টিমবাথ প্রভৃতি নেয় এবং তাহার পর ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে স্নান প্রভৃতি না করে, তবে চর্মের ছিদ্রগুলি উত্তাপের প্রতিক্রিয়ায় এইরূপ ভাবে রুদ্ধ হয় যে, রোগীর অবস্থা পূর্বাপেক্ষাও খারাপ হয়।

কিন্তু শীতল জল প্রয়োগেরো একটা মাত্রা আছে। সাধারণত শীতল জল অল্প সময়ের জন্যই প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। অল্প সময়ের জন্য শীতল জলে স্নান করিলে, অথবা অন্য কোন ভাবে শীতল জল দেহে প্রয়োগ করিলে, শৈত্যের প্রতিক্রিয়ায় দেহে একটা উদ্দীপনার (stimulative effect) সঞ্চার হয়। কিন্তু প্রদাহ ও বেদনা প্রভৃতিতে সুদীর্ঘ সময়ের জন্য শীতল জল প্রয়োগ করা আবশ্যক। কারণ ঐ-সময় একটা শান্তিকর ফল (sedative effect) উৎপন্ন করা প্রয়োজন। কিন্তু সুদীর্ঘ সময়ের জন্য শীতল পটি ব্যবহারেও দেহের ঐ-অংশ অবসন্ন হইতে পারে। এই জন্য তরুণ প্রদাহ প্রভৃতিতে দুই এক ঘণ্টা শীতল পটি চালাইয়া তাহার পর মধ্যে মধ্যে অল্প কতক্ষণের জন্য সেক দেওয়া আবশ্যক।

কিন্তু রোগে ও স্বাস্থ্যে শীতল জল অত্যন্ত ফলদায়ক হইলেও রোগের কোন কোন অবস্থায় গরম জল ব্যবহার করাই আবশ্যক। রোগীর দেহে যখন শীত ও কম্প থাকে, তখন রোগীকে কখনও শীতল জল পান করিতে দিতে নাই অথবা তাহাকে শীতল জলে বাথ দিতে নাই। ঐ-সময় তাহাকে সর্বদাই গরম জল পান করান আবশ্যক এবং ষ্টিমবাথ প্রভৃতি প্রয়োগেরো তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। শীতল অবস্থার পর যখন অস্বস্তির সহিত 'গরম অবস্থা' আসে, তখন জলের উত্তাপ ক্রমশ কমাইয়া রোগীকে শীতল জল পান করিতে অথবা অন্য ভাবে ব্যবহার করিতে দিতে হয়।

যদিও রোগের সময় কখনও গরম জল ব্যবহার করা হয়, তথাপি সর্বদাই লক্ষ রাখা আবশ্যক, রোগী যাহাতে শীতল জলে দ্রুত অভ্যস্ত হইয়া উঠে। কারণ শীতল জলের মত জীবনীশক্তির উদ্দীপক আর কিছুই নাই।

ষোড়শ অধ্যায়

উপবাসে আরোগ্য

আমাদের আয়ুর্বেদে আছে, 'জ্বরাদৌ লঙ্ঘয়েৎ পথ্যং জ্বরান্তে লঘু ভোজনং'—জ্বরের আদিতে না খাইয়া থাকিবে এবং জ্বরের শেষে খুব লঘু আহার করিবে।

আয়ুর্বেদ জ্বর সম্বন্ধে যে-ব্যবস্থা দিয়াছেন, সকল কঠিন রোগ, বিশেষত সকল তরুণ রোগ সম্বন্ধেই তাহা প্রযোজ্য।

অসুখ হইলে আমাদের স্বাভাবিক আহারের ইচ্ছা তিরোহিত হয়। কারণ, তখন দেহের সমস্ত যন্ত্রই দেহ-সঞ্চিত বিজাতীয় পদার্থ সরাইয়া দিবার জন্য ব্যাপৃত থাকে। বমনোদ্বেগ, দুর্গন্ধ শ্বাস-প্রশ্বাস, ঘোলাটে মূত্র, এই সকল ইহাই প্রমাণ করে যে, প্রকৃতি তখন গৃহ পরিষ্কারে ব্যস্ত—গ্রহণ করা ও হজম করার মত অবস্থা তার নয়।

পাকস্থলী ও অন্ত্র দুইটির অভ্যন্তর ভাগ স্বাভাবিক অবস্থায় খাদ্যদ্রব্য হইতে রস শোষণ করিয়া লয়। কিন্তু প্রবল অসুখে ইহাদের স্বভাবের বিপর্যয় হয়। তখন এই স্পঞ্জের মত স্থান সঙ্কুচিত হইয়া যায় এবং যাহা রস গ্রহণ করিত, তাহা রসত্যাগে নিযুক্ত হয়। তখন তাহারা দেহের সঞ্চিত আবর্জনা দেহের নর্দমায় ঢালিয়া দেয়। হজম ও গ্রহণ করার কাজ তখন বহুলাংশে বন্ধ থাকে। এই জন্যই স্বভাবত অসুখের সময় ক্ষুধার উদ্রেক হয় না অর্থাৎ প্রকৃতি তখন কিছু খাইতে চায় না।

কিন্তু মূর্খ দরদীর দল, রোগীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া আর্তনাদ করিতে

থাকে, 'আহা, কিচ্ছু খেল না, শরীর থাকবে কেমন করে!' তাহারা জোর করিয়া রোগীর মুখে পথ্য ঢালিয়া দেয়। তখন যে-প্রকৃতি রোগ বিতারণে ব্যস্ত, তাহাকে বাধ্য হইয়া পথ্য হজম করিবার জন্য ফিরিয়া আসিতে হয়। কিন্তু তখন সে ভাল করিয়া হজম করিতে পারে না। সুতরাং তখন যে-খাদ্য রোগীকে দেওয়া হয়, তাহা রোগীর কাজে না আসিয়া, তাহার অন্ত্রে বিজাতীয় পদার্থের সঞ্চয়ই বৃদ্ধি করে। এইজন্য রোগীকে বেশী করিয়া খাওয়াইলে রোগ বৃদ্ধি হয় এবং রোগ সারিবার অল্প-কাল পরও বেশী খাইতে দিলে প্রায়ই রোগ ফিরিয়া আসে।

পল্লীগ্রামে দেখা যায়, গ্রামবাসীরা অনেক সময় উপবাস দিয়াই জ্বর সারায়। রোগের প্রারম্ভে দীর্ঘ উপবাসে এই জন্যই রোগ সত্বর আরোগ্য হয় যে, উপবাস দ্বারা দেহে নূতন বিজাতীয় পদার্থের সঞ্চয় হয় না এবং প্রকৃতি ঐ-সময় দেহ-সঞ্চিত দূষিত পদার্থ দগ্ধ করিয়া ফেলিবার এবং সমস্ত শক্তি রোগ বিতারণে নিযুক্ত করিবার অবসর পায়। আমরা যাহা খাই, নিশ্বাস বায়ুর সহিত গৃহীত অক্সিজেনের সংযোগে তাহা মৃদুভাবে দগ্ধ হইয়া আমাদের দেহের কাজে আসে। যখন আমরা উপবাস দেই, তখন শরীরে যে অক্সিজেন গৃহীত হয়, তাহা নূতন খাদ্যের অভাবে পুরাতন খাদ্যাবশিষ্ট এবং দেহের দূষিত পদার্থ ধীরে ধীরে দগ্ধ করিয়া ফেলে। এই জন্য উপবাসে রোগ আপনা হইতে আরোগ্য লাভ করে।

রোগের প্রথমে দীর্ঘ উপবাসে শরীর হয়তো অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু রোগ আরোগ্য হইবার পর ইহাতে শরীর আবার তেমনি দ্রুত ভাল হয় এবং অনেক সময় রোগের পূর্ব অবস্থা হইতেও দেহ অনেক ভাল হইয়া যায়। কারণ রোগ তাহাদের দেহের বিজাতীয় পদার্থ ঝাঁটাইয়া লইয়া যায়।

টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয় ও তরল ভেদের প্রথম অবস্থায় আহার করিলে গুরুতর বিপদ হইতে পারে। আমাদের হাত কি পা, অথবা

শরীরের অন্য কোন অঙ্গ অসুস্থ হইলে আমরা তাহা বিশ্রাম দেই, কিন্তু পেটের কোন অসুখ হইলে আমরা পেটকে বিশ্রাম দেই না। ইহার জন্যই অসুখ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

জ্বর প্রভৃতি রোগে সত্যকার ক্ষুধা না লাগিতে রোগীকে কিছুই খাইতে দিতে নাই। প্রকৃত পক্ষে যখন বিপদ কাটিয়া যায় তখনই কেবল ক্ষুধা ফিরিয়া আসে। যাহারা উপবাস দিতে একান্ত অনিচ্ছুক, সাধারণ অসুখেও অন্তত একটা দিন তাহাদের কিছু না খাইয়া থাকা কর্তব্য।

রোগীর যখন স্বাভাবিক ক্ষুধার উদ্রেক হইবে, তখনই কেবল সে পথ্য গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক ক্ষুধাকে দৃষ্টি ক্ষুধা বলিয়া ভ্রম করা উচিত নয়। স্বাভাবিক ক্ষুধার আবির্ভাব হয়, ভগবানের আশীর্বাদের মত। ইহার ক্ষীণ বেদনাদায়ক অনুভূতিতে সমস্ত মন আনন্দে ভরিয়া উঠে। তখন পথ্য গ্রহণ করিলেই তাহা দেহের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপকারে আসে।

রোগ সারিবার পরও বিশেষ সতর্কতার সহিত আহার করা আবশ্যক। হঠাৎ বেশী খাইবার জন্য অসুখ যাহাতে ফিরিয়া না আসে, সে-বিষয়ে সকলেরি সতর্ক হওয়া কর্তব্য। বড় রোগ এবং দীর্ঘ উপবাসের পর রোগীকে আহারে ক্রমশ অভ্যস্ত করাইয়া এবং ক্রমশ পথ্য বৃদ্ধি করিয়া আহার স্বাভাবিক করিয়া আনিতে হয়।

সুস্থ লোকের পক্ষেও মাঝে মাঝে উপবাস দেওয়া একান্ত আবশ্যক। সাত দিন পরিশ্রম করিয়া আমরা একদিন বিশ্রাম গ্রহণ করি। ইহাতে শ্রান্ত দেহ ও মন পুনরায় শক্তি সঞ্চার করে। কলওয়ালারা কল চালায়; নির্দিষ্ট সময় কল চালাইবার পর তাহারা কল বন্ধ রাখে। যন্ত্রকে ঐরূপ বিশ্রাম দিলে তাহার কার্যক্ষমতা আবার ফিরিয়া আসে। আমাদের পাকস্থলীও একটি যন্ত্র। তাহারও মাঝে মাঝে বিশ্রাম আবশ্যক। মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম পাইলে পাকস্থলীর হজম শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তাহাতে স্বাস্থ্যই উন্নতি লাভ করে।

এই জন্যই আমাদের মহাজ্ঞানী পূর্বপুরুষগণ একাদশী ও পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথিতে উপবাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত উপবাস যে কত প্রয়োজনীয় তাহা বলিবার নয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে কেবল এক বেলা উপবাসের বিধি আছে। একাদশীতে যদি কেহ দুই বেলা উপবাস করিতে অক্ষম হন, তবে অন্তত এক বেলা উপবাস করিতে পারেন। কিন্তু রোগে কি স্বাস্থ্যে কথনও নির্জলা উপবাস করিতে নাই। উপবাসের সময় সর্বদাই নেবুর রস সহ প্রচুর জল পান করা উচিত। রোগ অথবা উপবাসের সময় প্রকৃতি যে দূষিত পদার্থ দেহ হইতে বাহির করিয়া দিতে চায়, জল তাহা ধুইয়া নিয়া প্রকৃতিকে সাহায্য করে।

সপ্তদশ অধ্যায়

ব্যায়াম ও মর্দন

দেহ গঠন করিবার জন্য আহার যেমন আবশ্যক ব্যায়ামও তেমনি প্রয়োজনীয়। ইহা যে মানব দেহের পক্ষেই কেবল উপকারী তাহাই নয়, সকল জীবজন্তু, এমন কি বৃক্ষ লতার পক্ষেও ইহা সমভাবে আবশ্যক।

জীবজন্তুকে আহার অন্বেষণ, ক্রীড়া, আক্রমণ ও আত্মরক্ষার জন্য দৈনিক পরিশ্রম করিতে হয়। সেই পরিশ্রম তাহাদের ব্যায়ামের স্থান গ্রহণ করে। আবার বাতাস ও বৃষ্টির দোলনে গাছ ও লতার ব্যায়ামের কাজ হয়।

ব্যায়াম এক শ্রেণীর ধ্বংসকার্য। আমরা যখন কোন মাংসপেশী সঙ্কুচিত করি, তখন রক্তের সঙ্গে অকেজো জীবকোষ এবং বিজাতীয় পদার্থ বাহির হইয়া যায়। আবার যখন পেশী প্রসারিত করি, তখন রক্ত তাহার ভিতর দেহ গঠনের নূতন মশলা লইয়া আসে। আমাদের দেহ অনুক্ষণ এই ভাঙ্গাগড়ার উপরই চলিতেছে। মৃত জীবকোষ বাহির হইয়া গেলেই নূতন জীবকোষ সেখানে বিস্তার লাভ করিতে পারে। এই জন্য আমরা দেখি কর্মকারদের বাহু ও যাহারা সাইকেল চালায় তাহাদের পা ও জানু বিশেষ পুষ্ট হয়। সর্বদেহের ব্যায়ামে সর্ব দেহও ঐরূপ পুষ্ট হইতে পারে।

ব্যায়ামের সময় দেহের সর্বস্থানে, ভিতরে ও বাহিরে অণুতে পরমাণুতে পর্যন্ত রক্ত সঞ্চারিত হয়। রক্ত যেখানে যায় সেখানেই নূতন জীবন জাগিয়া উঠে। এই জন্য ব্যায়ামের দ্বারা মৃত চর্ম জীবন্ত হইয়া উঠে এবং

শিথিল মাংসপেশী সবল ও পুষ্ট হয়। আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলিও ইহা দ্বারা সমভাবে পুষ্টি ও শক্তি লাভ করে। ব্যায়ামের সময় রক্ত পাকস্থলী, যকৃৎ, ক্ষুদ্রান্ত্র ও হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি যন্ত্রের মধ্যে গভীরভাবে প্রবিষ্ট হয় এবং ঐ-সকল অঙ্গকে শক্তিসম্পন্ন করে। এইজন্য নিয়মিত ব্যায়ামের দ্বারা দুর্বল পাকস্থলী সবলতা পায়, অসাড় যকৃৎ কর্মক্ষম হইয়া উঠে, হৃৎপিণ্ড সবল হয় এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের পুষ্টিগ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

ব্যায়াম সম্বন্ধে সুশ্রুত সংহিতায় আছে, 'ব্যায়াম হইতে পরম আরোগ্য লাভ হয়। ব্যায়াম করিলে বিরুদ্ধ ভোজনও সহ্য হয়।

কতটা ব্যায়াম করিতে হইবে এবং অতিরিক্ত ব্যায়ামের কি ক্ষতি সুশ্রুত তাহাও বলিয়াছেন, 'আত্মহিতৈষী লোকেরা সকল ঋতুতেই প্রত্যহ বলের অর্ধেক পরিমাণ ব্যায়াম করিবেন ; কিন্তু তাহার অতিরিক্ত ব্যায়াম করিলে বলক্ষয় হইবে (চিকিৎসিত স্থানম্, ২৪।২৩—২৭)'।

প্রথম খুব হালকা ব্যায়াম করিয়া ক্রমশ ব্যায়ামের মাত্রা বাড়াইতে হয়। দুর্বল লোকেরা প্রথম দুই একটা বুক ডন এবং তিন চার বার বটকারি করিয়া ব্যায়াম আরম্ভ করিবেন। তাহার পর ক্রমশ অভ্যস্ত হইলে ধীরে ধীরে অতি ধীরে ব্যায়ামের সংখ্যা বাড়াইবেন। প্রবাদ আছে, 'প্রতিদিন বাছুর তোলা অভ্যাস করিলে, শেষে গরুও তোলা যায়'। ব্যায়াম করিতে করিতেই দেহ ক্রমশ অধিকতর শক্তিসম্পন্ন হয়। তখন তিন চার মাস পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত এবং অনেক কঠিন ব্যায়ামও করা যায়। প্রথমেই অনেকগুলি বুকডন করিলে অথবা একদিনেই অত্যন্ত গুরুভার উত্তোলন করিতে চেষ্টা করিলে যক্ষ্মারোগ পর্যন্ত হইতে পারে।

সবল লোকেরাও প্রতিদিনের ব্যায়ামে প্রথম খুব হালকা ডন করিয়া আরম্ভ করিবেন এবং কঠিন ব্যায়াম করিয়া শেষে আবার হালকা ব্যায়াম করিয়া ব্যায়াম শেষ করিবেন। ব্যায়াম যাহাতে খুব দ্রুত অথবা খুব আস্তে না হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ রাখা আবশ্যক।

পরিশ্রান্ত হইলেই ব্যায়াম পরিত্যাগ করিতে হয়। কখনো অতিরিক্ত ব্যায়াম করিতে নাই। এই ভাবে ব্যায়াম করিতে হইবে যেন ব্যায়ামের পর শরীরে নূতন বল আসে। কখনো যেন এমন হয় না যে, ব্যায়ামের পর দুর্বলতা ও ক্লান্তি বোধ হয়। 'অতিরিক্ত ব্যায়াম করিলে ক্ষয়, তৃষ্ণা, অরুচি, বমি, কাসি, শ্বাস ও জ্বর হইতে পারে (সুশ্রুত)'।

আহারের পর দেড় ঘণ্টা অথবা দুই ঘণ্টার মধ্যে কখনো কঠিন ব্যায়াম করিতে নাই। ব্যায়াম করিয়া আসিয়াও খাইতে বসা উচিত নয়। শরীর কিছুমাত্র শ্রান্ত হইলেই অন্তত পনের মিনিট বিশ্রাম করিয়া শরীর যখন ঠাণ্ডা হয়, তখন খাওয়া উচিত।

ব্যায়াম সর্বদা যথাসম্ভব মুক্ত হাওয়ায় করাই কর্তব্য। যত বেশী মুক্ত স্থান হইবে তত বেশী অক্সিজেন দেহে প্রবেশ করিবে এবং দেহের তত বেশী উপকার হইবে। বাহিরে ব্যায়াম গ্রহণ করিবার সুবিধা না হইলে ঘরের সমস্ত জানালা খুলিয়া ব্যায়াম করা উচিত। ব্যায়াম করিবার সময় সর্বাঙ্গ বিশেষত তলপেটের মাংসপেশীগুলির যাহাতে ব্যায়াম হয়, তাহার দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ রাখা উচিত।

কিন্তু যাহারা ক্যান্সার, যক্ষ্মা, হৃৎরোগ, হাঁপানি, মৃগীরোগ প্রভৃতি কঠিন রোগে ভুগিতেছে, তাহারা কখনই পরিশ্রম সাধ্য ব্যায়াম করিবে না। রুগ্ন ব্যক্তি সর্বপ্রকার ব্যায়াম পরিত্যাগ করিবে। বিশ্রামই রোগের প্রধান চিকিৎসা। তাহারা একমাত্র সকালে ও সন্ধ্যায় মুক্ত হাওয়ায় ভ্রমণ করিতে পারে। তাহাই তাহাদের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যায়াম।

ব্যায়াম করা যাহাদের চলে না, তাহারা মর্দন করিয়াই ব্যায়ামের অনেকটা ফল পাইতে পারে।

দেহের কোন অংশ মর্দন করিলেই সে-স্থান লাল ও গরম হইয়া উঠে। তাহার অর্থ ইহাই যে, রক্ত সেখানে যাইয়া উপস্থিত হয়। রক্ত যখন যায়, তখন তাহার সঙ্গে নূতন জীবন লইয়া যায় এবং ফিরিবার পথে অকেজো

জীবকোষ বহন করিয়া নেয়। সুতরাং ইহাতে ব্যায়ামের অনেকটা ফল পাওয়া যায়।

যদি এই মর্দন স্নানের পূর্বে তৈলযুক্ত হয়, তবে ইহার উপকারিতার ইয়ত্তা থাকে না। প্রতিদিন শরীরে যদি বিশুদ্ধ সরিষার তৈল যথেষ্টরূপে মর্দন করা যায়, তবে দেহ অতি দ্রুত পুষ্টিলাভ করে। আমরা যাহা আহার করি তাহা যেমন দেহের কাজে আসে, চর্মে মর্দন করিলেও তাহা অনেক সময় দেহের কাজে আসে। যে-সকল দুর্বল লোকের অজীর্ণ আছে, তাহাদের কডলিভার অয়েল খাওয়া চলে না। কিন্তু গায় মালিশ করিয়া তাহারা প্রায় সমানই ফল পায়; অনেক সময় বেশী ফলও হয়। এইজন্যই আমাদের আয়ুর্বেদে আছে, ঘৃতাৎ অষ্টগুণং তৈলং মর্দ্দনাৎ ন তু ভক্ষণাৎ'—ঘৃতের আটগুণ তেল বেশী উপকারী, কিন্তু তাহা খাইলে হইবে না, মর্দন করিলে হইবে।

ছোট ছোট শিশুদের দেহ তৈল দ্বারা ভালরূপ মর্দন করিয়া শুকনা মাটির উপর রৌদ্রে তাহাদিগকে ফেলিয়া রাখিলে তাহাদের দেহ আশ্চর্য রূপ উন্নতি লাভ করে। একবার আমার দিদির দুইটি যমজ সন্তান হয়। ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহারা এত কৃশ ও ক্ষুদ্র ছিল যে, লোকে ঐরূপ ছোট শিশু দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া যাইত। কেহ বলে নাই যে, তাহারা বাঁচিবে। তখন একটি ভদ্র মহিলার নিকট শুনিয়া আমার দিদি ছেলেদের গায় প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণ তৈল মর্দন করিতে লাগিলেন। মর্দন করিয়া তাহাদিগকে তিনি রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিতেন। এইরূপ তিন মাস তৈল মর্দন করিবার পর তাহারা সুস্থ শিশুর মত সবল ও মোটা হইয়া উঠিল।

তৈল মর্দনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় শীতকাল। গ্রীষ্মকালেও ভোরে তৈল মর্দন করা যায়। সরিষার তৈল অপেক্ষা আরও অনেক বেশী ফল পাওয়া যায় যদি কডলিভার অয়েল মর্দন করা হয়। দুর্বল শিশু ও ক্ষীণ

লোকদিগকে কডলিভার অয়েল মাখাইলে তাহাদের দেহের আশ্চর্য পরিবর্তন হয়।

মর্দন সম্বন্ধে সুশ্রুত লিখিয়াছেন, 'ব্যায়ামের পর সর্বশরীর মর্দন করিবে। তাহাতে শরীরের কান্তি বৃদ্ধি হয়, অঙ্গসমূহ সুবিভক্ত হয়, শরীরে দৃঢ়তা, লঘুতা ও চাকচিক্য আসে, শ্রম, পিপাসা এবং শীত-গ্রীষ্মাদি সহ্য করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং অগ্নির দীপ্তি হয় (চিকিৎসিত স্থানম্, ২৪।২৩—২৯)।'

মর্দন সর্বদাই ধীরে ধীরে সুদীর্ঘ সময়ের জন্য করা আবশ্যক। ইহাতে চর্মে রক্ত আসে, নাড়ি শক্তিসম্পন্ন ও নাড়ি-স্পন্দনের মাত্রা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস গভীর ও অপেক্ষাকৃত অল্প হয়। মর্দনের দ্বারা চর্মের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং শুষ্ক চর্ম তৈলাক্ত ও কোমল হয়। কিন্তু মর্দন যদি অত্যন্ত সজোরে হয়, তবে তাহা হৃৎপিণ্ড দুর্বল করে, শ্বাসকষ্ট আনে এবং অনেক সময় মূত্রে এ্যালবুমিন (albumin) দেখা দেয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

স্বাস্থ্য কোন্ পথে?

সুশ্রুত বলিয়াছেন, 'আয়ুর্বেদের প্রয়োজন দুইটি—রোগীর রোগ-মুক্তি আর সুস্থের স্বাস্থ্যরক্ষা (সূত্র স্থানম্, ১।১২)। ইংরেজীতে প্রবাদ আছে, অসুখ আরোগ্য করা অপেক্ষা, অসুখ যাহাতে না হইতে পারে, তাহা করাই ভাল। অসুখ অর্থ—ন-সুখ, যেমন disease অর্থ dis-ease —want of ease। এই জন্য অসুস্থ না থাকা অর্থই সুস্থ থাকা। কিন্তু পৃথিবীতে সব কিছু যেমন অর্জন করিতে হয় এবং রক্ষা করিতে হয়, 'স্বাস্থ্যও তেমনি অর্জন করিতে হয়—ঔষধের বোতল হইতে ইহা পান করা যায় না।'

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অতি নিয়মিত জীবন যাপন করা আবশ্যক। অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। অতি সকালে উঠিলে দিনটি কেমন যায়, একবার কয়দিন সকালে উঠিয়া তাহা পরীক্ষা করিলে সকলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। সূর্যোদয়ের এক ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া শয্যা ত্যাগ করা উচিত।

শয্যা হইতে উঠিয়া শীতল জলে চোখ ধুইয়াই পায়খানায় যাওয়া কর্তব্য। বেগ না হইলেও নিয়মিত সময়ে পায়খানায় যাইতে হয়। প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে পায়খানায় যাওয়া অভ্যাস করিলে নির্দিষ্ট সময়ে বেগ আপনিই হইবে। যাহাদের কিছুতেই কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, তাহারা

বদ্ধ বাথরুমে পায়খানায় না যাইয়া তলপেটের নীচে একখানা গামছা পরিয়া অনাবৃত দেহে জঙ্গলের ভিতর পায়খানায় বসিবেন। গ্রামের লোকেরা ইহা অনায়াসেই করিতে পারেন। এইরূপ করিলে কঠিন যে কোষ্ঠবদ্ধতার রোগী তাহারও কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে।

পেট ভাল রাখিবার জন্য এবং মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট করিবার জন্য নিয়মিত দন্ত ধাবন করা একান্ত ভাবে আবশ্যক। মাটি থাকিতে আর কিছুই দন্ত ধাবনের সময় ব্যবহার করা উচিত নয়। বাজারের পেষ্টগুলিতে এমন সমস্ত ঔষধ থাকে যে, তাহারা দন্তের সূক্ষ্ম অংশগুলিকে পীড়ন করিয়া তাহাদের ভিতর হইতে মল টানিয়া আনে। ইহাতে দাঁত পরিষ্কার হইলেও, দাঁত ক্রমশ অসাড় ও দুর্বল হয় এবং বার্ধক্যের পূর্বেই দাঁতগুলি পড়িয়া যায়। বিশুদ্ধ বেলে মাটি ব্যবহার করিলে দন্তের কোন অংশের উপর রাসায়নিক ক্রিয়া হয় না। বালুকার সূক্ষ্ম কণা দাঁতের ভিতর প্রবেশ করিয়া দন্তের সমস্ত আবর্জনা বাহির করিয়া লইয়া আসে। আবর্জনা অভাবে দন্তের কীট দাঁতে বাসা করিতে পারে না এবং এই জন্য বালিমিশ্রিত মাটি ব্যবহারে দাঁত দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়।

কেহ কেহ ইচ্ছা করিলে, মাটি দিয়া দাঁত মাজিবার সময় ভাল শক্ত ব্রাস ব্যবহার করিতে পারেন; কিন্তু ইহা যেন মনে থাকে, অপরিষ্কার ব্রাস আর মেথরের ঝাঁটা সমান জিনিস। সুতরাং সপ্তাহে অন্তত দুই বার ভালরূপে ব্রাস পরিষ্কার করা উচিত। কেহ কেহ ব্রাস জলে সিদ্ধ করেন। কিন্তু পূর্ণ দশ মিনিট ফুটন্ত জলে ব্রাস না রাখিলে ব্রাস বিশুদ্ধ (sterilised) হয় না। এ-সব ঝঞ্ঝাট না করিয়া তিন চার দিন অন্তর অন্তর কতকটা লবণ ব্রাসের উপর দিয়া এক রাত্রি রাখিয়া দিলেই ব্রাস নির্দোষ হয়। ব্রাস ব্যবহার করিয়া ব্রাস হইতে জল ঝাড়িয়া ফেলিয়া মুক্ত স্থানে রাখা উচিত। যাহারা দিন রাত্রি একবার মাত্র ব্রাস ব্যবহার করেন, রাত্রে খাইয়া উঠিয়া তাহা তাঁহারা ব্যবহার করিবেন। তাহা হইলে কোন আবর্জনাই দাঁতে জমিতে পারিবে না।

দন্ত মঞ্জনের পরই ব্যায়াম ও মর্দন করা উচিত এবং তাহার পরই স্নান করা কর্তব্য। মর্দন করিলে যে শরীর গরম হয়, সেই গরমটুকু থাকিতে থাকিতে প্রাতস্নান করিতে পারিলেই স্নানের ঠিক উপকার হয়। স্নান করিয়া আসিয়াই শরীরটাকে গরম কাপড় প্রভৃতি দ্বারা জড়াইয়া পুনরায় গরম করিয়া লওয়া উচিত। তাহার পর বিশ্বাস অনুযায়ী কতকটা সময় ঈশ্বর চিন্তায় অতিবাহিত করিতে কাহারই অন্যথা করা উচিত নয়।

দেহের পক্ষে যেমন ব্যায়াম আবশ্যক, মনের পক্ষেও তেমনি ব্যায়াম প্রয়োজনীয়। মনকে ভগবচ্চরণে এক কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টাই মানসিক ব্যায়াম। ক্রমশ এইরূপ চেষ্টাতেই মন নিশ্চল হইয়া আসে। এই চেষ্টার নামই সাধনা।

মন যত সংযত হইয়া আসে, মনের বল তত বৃদ্ধি পায় এবং আত্মার আনন্দে ততই জীবন মধুময় হইয়া উঠে। দেহের সহিত মনের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বলিয়া চিত্ত সংযমিত হইলে দুর্বল দেহেও মত্ত হস্তীর বল আসে।

আহ্নিক সমাপ্ত করিয়া প্রত্যেকেরই যথাসম্ভব কতকটা সময় মুক্ত স্থানে ভ্রমণ করা উচিত। বেড়াইয়া ফিরিবার পথে সূর্য উঠিবে, এই রকম হইলেই ঠিক ঠিক সময় বেড়ান হয়।

বাড়ি আসিয়া এক গ্লাস শীতল জল পান করা উচিত। এই জল যখন দেহ হইতে বাহির হইয়া যাইবে, তখন খুব অল্প করিয়া কিছু খাবার খাওয়া যাইতে পারে। যাহাদের কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ আছে, বেড়াইয়া আসিয়া তাহারা ফল প্রভৃতি এমন কিছু খাইবেন যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কারের সহায়তা হয়। প্রাতের খাবার অত্যন্ত কম হওয়া উচিত। ভোরবেলা অনেকগুলি খাইলে দশটা এগারটার মধ্যে তাহা হজম হয় না এবং একটা খাদ্য হজম না হইতে তাহার উপরে দ্বিপ্রহরের নূতন খাদ্য পড়ায় পাকস্থলীতে বিশেষ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। যাহারা রুগ্ন ও অসুস্থ তাহারা ভোরের আহার বর্জন করিলে উহা দ্বারাই অনেক সময় রোগমুক্ত হইতে পারে।

প্রাতে বা অপরাহ্নে জলখাবারের সময় আর যাহাই খাওয়া যাউক, চা ও বিস্কুট না খাওয়াই ভাল। পেটের অসুখ উৎপন্ন করিতে ইহাদের জুড়ি নাই। চায়ের ভিতর 'ট্যানিক এ্যাসিড্', 'কাফিন' প্রভৃতি বিষ আছে। উহারা কোষ্ঠবদ্ধতা আনয়ন করে। গরম জল ক্ষণেকের জন্য জীবনীশক্তিকে উদ্দীপ্ত করিলেও ইহার প্রতিক্রিয়ায় পরিপাক যন্ত্রের অত্যন্ত দুর্বলতা জন্মে। চায়ের অপকারিতার কথা বলিলে ফিরিস্তি কিছু দীর্ঘ হয়; কিন্তু একবার খবরের কাগজে ইহার একটা উপকারিতার কথা পড়িয়াছিলাম। কাগজ খুলিয়া দেখিলাম, এক স্থানে লিখিয়াছে,—চা-পানের উপকারিতা। আমি আশ্চর্য হইয়া সংবাদটা পড়িলাম,—একটি ভদ্রলোকের ঘরে চোর ঢুকিয়াছে। রাত্রি তখন দু'টা। কিন্তু ভদ্রলোক দীর্ঘদিনের চা-খোর, সুতরাং জাগিয়া আছেন। যেমনি চোর ঘরে আসিয়া সিন্ধুক ধরিয়াছে, অমনি চোরকে ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন, 'জানিস নে বেটা, আমি চা খাই!'

প্রাতে স্নান করিলে দ্বিপ্রহরে স্নানের বড় আবশ্যক হয় না। কিন্তু প্রত্যেক দিন নিয়মিত সময়ে আহার করা উচিত। আহার্য যথাসম্ভব পুষ্টিকর হইবে কিন্তু কখনও দুষ্পাচ্য (rich) যেন না হয়। সহরের লোকেরা আহার করিয়াই অফিস প্রভৃতিতে দৌড়ান। ইহা অত্যন্ত ক্ষতিকর। আহারের পর অন্তত অর্ধ ঘণ্টা বিশ্রাম না করিয়া কোথাও যাইতে নাই। 'খেয়ে উঠে দৌড়ে যায়, তার পিছু মৃত্যু ধায়।' যাঁহাদের সকাল সকাল অফিসে যাইতে হয়, তাহারা বরং আরও অর্ধ ঘণ্টা পূর্বে আহার করিবেন, তথাপি খাইয়া উঠিয়াই দৌড়াইবেন না।

দিবানিদ্রা সাধারণত উচিত নয় এবং গ্রীষ্ম ব্যতীত অন্য সময় দিবানিদ্রা দিলে গুরুতর পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু গ্রীষ্মের সময় দ্বিপ্রহরে খুব অল্প সময়ের জন্য নিদ্রা মন্দ নয়। অনেক সময় পনের মিনিট বিশ্রাম করিয়া লইতে পারিলেই আবার কর্মক্ষমতা ও বল ফিরিয়া আসে।

দিনের প্রধান আহারের পর রাত্রির আহারের মধ্যে কিছু খাইতে হইলে পূর্বের আহারের অন্তত চার পাঁচ ঘণ্টা পর তবে খাওয়া উচিত। অপরাহ্নের আহার যথাসম্ভব অল্প হইলেই ভাল। নিয়মিত দুইটি আহারের মধ্যে কাহারো অনুরোধে কখনো কিছু মুখে দিতে নাই।

অপরাহ্নে কাজের পর কেহ যেন ঘরে বসিয়া না থাকেন। সেই সময় মুক্ত স্থানে ভ্রমণ করিতে অথবা ক্রীড়া করিতে কাহারই অন্যথা করা উচিত নয়। সুবিধা অনুযায়ী ভ্রমণের পূর্বে অথবা পরে অবশ্যই সায়ং স্নান করা উচিত।

রাত্রিতে খুব সকাল সকাল আহার শেষ করিতে হয়। কারণ ভুক্ত খাদ্য হজম না হইতে ঘুমাইলে নিদ্রার সময় ভুক্ত পদার্থ ভাল করিয়া হজম হয় না।

আহারের মত প্রতিদিন নিয়মিত সময়েই নিদ্রা যাওয়া উচিত। যে-শিশুর এক মাস বয়স, তাহার দৈনিক ১৮ হইতে ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত নিদ্রা আবশ্যক। এক বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশু অন্তত ১৬ ঘণ্টা নিদ্রা যাইবে। দুই বৎসর বয়স পর্যন্ত তাহার দৈনিক ১২ ঘণ্টা নিদ্রা দরকার। বালক ও বালিকারা ৯ ঘণ্টা হইতে ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত নিদ্রা যাইবে এবং বয়স্থ লোকেরা দৈনিক আট ঘণ্টা ঘুমাইবেন।

শয়নের সময় খুব শান্ত মনে শয়ন করিতে হয়। সুনিদ্রার মত দেহের গঠনকর্তা ও জীবনীশক্তির উৎপাদক আর কিছুই নাই। প্রতিদিনের কার্যে আমাদের যে জীবনীশক্তির ক্ষয় হইতেছে, কেবলমাত্র সুনিদ্রার দ্বারাই সেই ক্ষয় পূর্ণ হইতে পারে। নিদ্রার সময় আমাদের দেহের রক্ত কণিকাগুলি গঠিত হয়। এই জন্য কেহ কোনদিন রাত্রি জাগিলে পরের দিন তাহাকে ফ্যাকাশে দেখায়। এই সব কারণে একরাত্রি না ঘুমাইলে দেহের যে ক্ষতি হয়, কোন পান আহারেই সেই ক্ষতির পূরণ হইতে পারে না। এই জন্য কেহ নিদ্রা গেলে, তাহাকে জাগান আমাদের দেশে পাপ

বলিয়া গণ্য হয়। ঘরে যদি আগুন লাগে তবেই মাত্র এক জনকে ঘুম হইতে ডাকা যাইতে পারে, অন্যথা নয়।

স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে চরক কতগুলি প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছেন। কথাগুলি খুব ছোট, কিন্তু উপকারিতায় তাহা অমূল্য। চরক বলিয়াছেন, 'সর্বদা প্রসন্নমনা হইবে। শ্রান্তি বোধ না করিবার পূর্বেই শ্রম পরিত্যাগ করিবে। অতি নিদ্রা, অতি জাগরণ, অতি স্নান, অতি পান ও অতি ভোজন করিবে না। স্নান করিয়া আকাচা কাপড় পরিধান করিবে না। মলাদির বেগ হইলে মলাদি পরিত্যাগ না করিয়া অন্য কার্য করিবে না এবং প্রকৃতিমভিক্ষং স্মরেৎ—সর্বদা প্রকৃতির অনুসরণ করিবে। যাঁহারা স্বাস্থ্যরক্ষার এই সকল নিয়মের সম্যক অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহারা অব্যাধি হইয়া, শতবর্ষ জীবিত থাকিবেন (সূত্রস্থানম্, ৮।১০-২৫)'।

প্রকৃতিকে অনুসরণ করাই স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায়। প্রকৃতি যে-অঙ্গকে যে-জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে সেই কার্যেই নিযুক্ত করা কর্তব্য। দাঁতের কাজ পাকস্থলীকে করিতে দেওয়া এবং নাকের কাজ মুখকে দিয়া করান উভয়ই প্রকৃতির বিরুদ্ধে অপরাধ। যাহারা মুখ দিয়া নিঃশ্বাস গ্রহণ করে, তাহারা সাধারণত অল্পায়ু হয়। মুখ দিয়া কখনও নিঃশ্বাস নিতে নাই, সর্বদাই নাক দিয়া নিতে হয়।

সর্বদাই খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত। Cleanliness is next to godliness। শুচিতাই আর্যত্বের অন্যতম লক্ষণ ছিল। কিন্তু যে-জিনিসটি যত ভাল, তার বিকৃতি তত খারাপ। আজ এই শুচিতা বিকৃত হইয়া ভারতের নাভিশ্বাস সৃষ্টি করিবার উপক্রম করিয়াছে।

বাসী, ময়লা, দুর্গন্ধযুক্ত কাপড় কখনো পরিতে নাই। পরিষ্কার কাপড় পরা বিলাসিতা নয়। শীতের সময় ব্যতীত অন্য সময় সর্বদাই খুব হালকা জামা পরিধান করা উচিত। তাহাতে চর্ম তাহার স্বাভাবিক কার্য

সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারে। যাহাতে গায় আলো ও বাতাস লাগিতে পারে, এরূপ সুযোগ কখনো উপেক্ষা করিতে নাই।

পরিশ্রম করিলেই তাহার পর বিশ্রাম করা আবশ্যক। শ্রমের পর বিশ্রাম করিলে আবার নষ্ট শক্তি ফিরিয়া আসে। তখন আবার শ্রম করা চলিতে পারে। শ্রমের পরেই আবার শ্রম করিলে দেহ অত্যন্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

কখনও খুব উত্তেজিত হইয়া কাজ করিতে নাই। উদ্বেগ সর্বদা বর্জনীয়। জীবনে কিছু মাত্র ত্বরা থাকিবে না। জীবনটা যেন 'মন্দাক্রান্ত তালে' চলিবে। কিন্তু তাহার জন্য আলস্যও থাকিবে না। লৌহ-যন্ত্রের পক্ষে যেমন মরিচা, দেহ যন্ত্রের পক্ষে আলস্য তেমনি সর্বনাশকর। সর্বদা কাজ করিতে হইবে, কিন্তু কোন প্রকার উত্তেজনা ও উদ্বেগ না রাখিয়া কাজ করিতে হইবে, ইহাই কর্মের কৌশল।

তথাপি স্মরণ রাখিতে হইবে, দিন কাজের জন্য এবং রাত্রি বিশ্রামের জন্য। ছাত্র ব্যতীত আর কাহারও রাত্রিতে পরিশ্রম করা উচিত নয়। অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া কাজ, সকলের পক্ষে বর্জনীয়।

সর্বদাই প্রফুল্ল থাকা উচিত এবং মনে আশা রাখা উচিত। মানসিক প্রফুল্লতা স্বাস্থ্য গড়িয়া তোলে। হাসিবার অবসর পাইলেই হাসিতে হয়। এইরূপ ভাবে হাসা উচিত যেন জুতার শুকতলি পর্যন্ত স্পন্দিত হইয়া উঠে। হাসিবার ক্ষমতা একটা মস্ত গুণ। যাহারা খুব হো হো করিয়া হাসিতে পারে, বুঝিতে হইবে, তাহাদের পশ্চাতে গড়ের মাঠের মত একটা উদার মন রহিয়াছে।

ফ্রান্সের একজন ডাক্তার (Dr. Pierre Vachet) নূতন রকম একটি চিকিৎসালয় (The Institute of Psychology) খুলিয়াছেন। তাহাতে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে হাঁসপাতালের সকল রোগীকে একটি হলঘরে একত্র হইতে হয়। সকলে আসিলে তাহারা সমস্বরে এই বলিয়া চীৎকার করে, 'আমার রোগ সারিয়াছে, আমি ভাল হইয়াছি, আমার গায়

বল হইয়াছে।' তাহার পর তাহাদিগকে হাসিতে বলা হয়। সকলে তখনি হো হো করিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে। ইহাতে তাহাদের রক্তের ভিতর জীবনীশক্তির একটা স্রোত মুক্ত হয় এবং তাহার পর তাহারা অনেক ভাল বোধ করে। সেই হাঁসপাতালে আনন্দে রাখাই চিকিৎসার প্রধান উপকরণ (The Indian Naturopath, Jan, 1936, p. 9)।

একবার আমি আমার একটি বন্ধুর বাসায় গিয়াছিলাম। তিনি সন্ধ্যা-বেলা আমাদের সহিত বসিয়া গল্প করিতেছেন। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'ওঃ আজ তো খোকাকে হাসান হয় নাই' বলিয়া তৎক্ষণাৎ খোকাকে লইয়া আসিয়া নানাভাবে কতক্ষণ হাসাইয়া আবার তাহাকে রাখিয়া আসিলেন। আমি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

ভয়ও সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত। ভয় পাওয়ার জন্য এক মুহূর্তে দেহে কঠিন ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে। পারশ্য ভাষায় অসুখকে বিমারি বলে। বিম অর্থ ভয় এবং অরি অর্থ আনীত। অর্থাৎ ভয়ের দ্বারা যাহা আনীত তাহাই অসুখ।

ভয়ের জন্যই অনেক সময় দেহে রোগ বিস্তারের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়। এই জন্য আমাদের দেশে কলেরা প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হইলে, হরি-সঙ্কীর্তন করিবার নিয়ম আছে।

অসুখ হইলে কখনও ভয় করিতে নাই। বিশ্বাস করিতে হয় যে, রোগ ভাল হইবেই। বিশ্বাসে জীবনী শক্তির বৃদ্ধি হয় এবং ভয় আরোগ্যের গতি প্রতিহত করে।

আনন্দে থাকিতে হইবে, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা সর্বথা বর্জনীয়। ক্ষণিক সুখের আশায় দেহের যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহা অবহেলায় বিকাইয়া দিতে নাই। বীর্যই দেহের অনেকটা জীবনী শক্তি। এই বীর্য ধরিয়া রাখিতে পারিলে ইহা দ্বারা অসাধ্য সাধন করা যায়। কিন্তু জোর করিয়া কেহ বীর্য ধারণ করিতে পারে না, ঈশ্বর আরাধনা ও নিঃস্বার্থ পরোপকারই বীর্য

ধারণের উপায়। মনকে কোন মহৎ কার্যের ভিতর এমন ভাবে নিযুক্ত রাখিতে হয়, যেন সেই কাজের আনন্দে মন আপনিই ভোগের বিষয় হইতে উঠিয়া আসে। ইহাই চিত্তজয়ের প্রধান উপায়।

বিবাহের পূর্বে ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা একান্তভাবে কর্তব্য। বিবাহের পরও যথেচ্ছাচার করা উচিত নয়। যে স্বেচ্ছায় যতটা সংযম অবলম্বন করিতে পারে, তাহার ততটা দীর্ঘ জীবন লাভ হয়। রোগের অথবা রোগ আরোগ্যের সময় কঠোর ভাবে ইন্দ্রিয় সংযম করা উচিত। রোগের সময় ইন্দ্রিয় সুখ অন্বেষণ করিলে দেহের সমস্ত যন্ত্র এরূপ দুর্বল হইয়া পড়ে যে, রোগ আরোগ্য ও দেহ সুস্থ হইতে অনেক বিলম্ব হয়—অনেক সময় আর কখনো সুস্থই হয় না।

কুচিন্তাও সর্বতোভাবে বর্জনীয়। কুকার্য ও কুচিন্তার ভিতর পার্থক্য খুব অল্প! কুচিন্তা মনকে অণুতে পরমাণুতে পর্যন্ত বিষাক্ত করে। কুচিন্তা পরিত্যাগ করিলেই কেবল কুকার্য হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

চরক ও সুশ্রুত পড়িলে ইহা দেখিয়াই আশ্চর্য হইতে হয়, উহাঁদের ভিতর কত উচ্চ নীতিধর্ম রহিয়াছে!

চরক বলিয়াছেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তি লোভ, শোক, ভয়, ক্রোধ, অভিমান, নির্লজ্জতা, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, কর্কশ, মিথ্যা ও অকালযুক্ত বাক্য ও চৌর্যের বেগ ধারণ করিবেন (সূত্রস্থানম্, ৭।২৩)। সর্বদা প্রসন্নমনা হইবে; যে-কারণে কাহারও উন্নতি হইয়াছে, সেই কারণের প্রতি ঈর্ষা করিবে, কিন্তু সেই কারণের ফলের প্রতি ঈর্ষা করিবে না; নিশ্চিন্ত, নির্ভীক, উৎসাহী, ক্ষমাবান, ধার্মিক ও আস্তিক হইবে; সর্বপ্রাণীর প্রতি বন্ধুভাব প্রদর্শন করিবে, অন্য স্ত্রী অভিলাষ করিবে না, পরশ্রীকাতর হইবে না; স্বজনের সহিত বাস করিবে এবং একাকী সুখভোগ করিবে না (সূত্রস্থানম্, ৮।১০-২২)। জীবনের মূল হিতোপচার এবং তাহার বিপরীত যাহা তাহা মৃত্যুর কারণ (বিমান স্থানম্, ৩।৪১)।

দেহ ও মন পরস্পর অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। দেহ ভাল রাখিতে হইলে, মনও ভাল রাখিতে হয় এবং মন ভাল রাখিতে হইলে দেহও ভাল রাখা আবশ্যক। যে-পথে মন ভাল থাকে, তাহাই দেহকে ভাল রাখে। দেহ ভাল রাখার যে-চেষ্টা তাহাও এক প্রকার সাধনা অথবা তাহাই সাধনার ভিত্তি শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম সাধনম্।

যে প্রাকৃতিক চিকিৎসার প্রথম কথা স্বাস্থ্যনীতি, আধ্যাত্মিকতাই তাহার শেষ অধ্যায়।

সমাপ্ত

বিস্তৃত-সূচী

বিষয়			পৃষ্ঠা

শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

দৈনন্দিন রোগের জল-চিকিৎসা

এই পুস্তকে প্রত্যেকটি রোগ ধরিয়া চিকিৎসার বিধি দেওয়া হইয়াছে। জল, মাটি, উত্তাপ, বায়ু, আলো, পথ্য, উপবাস, ব্যায়াম ও মর্দন প্রভৃতির দ্বারা সকল রোগ আরোগ্যের পদ্ধতি গ্রন্থকার এই পুস্তকে দিয়াছেন। ইহাতে সাধারণ জ্বর, ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড, সর্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, প্লুরিসি, ডাইরিয়া, আমাশয়, কামলা, কলেরা, বসন্ত, এ্যাপেণ্ডিসাইটিস, পাঁচড়া, ব্রণ, ফোড়া, কার্বাঙ্কল, ক্ষত, বাঘি, চোখ উঠা, প্লেগ, সন্ন্যাস, গণোরিয়া, সিফিলিস, মূত্ররোধ, বাত, বেদনা, দন্তশূল, মাথাধরা, পেটফাঁপা, হিক্কা, শোথ ও অনিদ্রা, বমি প্রভৃতি সচরাচর দৃষ্ট সকল তরুণ রোগের (acute disease) পরিপূর্ণ চিকিৎসা ও পথ্যবিধি দেওয়া হইয়াছে। মূল্য—এক টাকা চারি আনা মাত্র।

পুরাতন রোগের জল-চিকিৎসা

এই পুস্তকে অজীর্ণ (dyspepsia), অম্ল, হাঁপানি, যক্ষ্মা, পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস, পাথুরি, হৃদ্রোগ, ব্লাড প্রেসার, পক্ষাঘাত, উন্মাদ-রোগ, ডায়াবিটিস, পুরাতন ক্ষত, অর্শ, হার্নিয়া, একজিমা, জননেন্দ্রিয়ের দুর্বলতা বিভিন্ন রোগ, দন্তরোগ, পাকস্থলীর ক্ষত এবং দৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি সচরাচর দৃষ্ট সকল পুরাতন রোগের চিকিৎসা ও আধুনিকতম পথ্যবিধি বিস্তৃত ভাবে দেওয়া হইয়াছে। মূল্য—এক টাকা চারি আনা মাত্র।

আনন্দবাজার বলেন,—অনেক পড়াশুনা করিয়া এবং দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা হইতে গ্রন্থকার এই পুস্তক লিখিয়াছেন। রোগের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত জল, মাটি, উত্তাপ ও পথ্য প্রভৃতি কখন কি ভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা বেশ পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে। আমরা আশা করি দেশের জনসাধারণ এই পুস্তকের দ্বারা বিশেষ ভাবে উপকৃত হইবেন।

দেশ বলেন,—গৃহচিকিৎসার পক্ষে ইহা যে অতি উপাদেয় পুস্তক তাহাতে আমাদের অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে রোগের চিকিৎসা করা যে কিরূপ ব্যয়সাধ্য হইয়াছে, তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি। আমরা আশা করি, এই পুস্তক ঘরে রাখিলে বহু ক্ষেত্রেই ডাক্তার ডাকিবার আবশ্যক হইবে না।

অমৃতবাজার বলেন,—এই চিকিৎসায় যেমন খরচ নাই তেমনি ইহা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

যুগান্তর বলেন,—অতি সাধারণ লোকের পক্ষেও এই পুস্তকের সাহায্যে নিজেদের বিভিন্ন রোগ চিকিৎসা করা সম্ভব হইবে।

এ্যাডভান্স বলেন,—অত্যন্ত জটিল বিষয়গুলি জলের মত সরল করিয়া লেখা হইয়াছে।

প্রবর্ত্তক বলেন,—ব্যক্তিগত ভাবে উপকৃত হইয়াছি।

লেখকের উপন্যাস গ্রন্থাবলী

পল্লীর আলো

২য় সংস্করণ—মূল্য ১।০

Amrita Bazar Patrika (7-10-28) বলেন,—

The book is interesting like the stories of the Arabian Nights.

Forward (9-10-28) বলেন,—

The author has exhibited exceptional abilities in expressing the thoughts of the day in an interesting way.

স্বামীর ঋণ

নারী-জাগরণের বই—মূল্য ১।০

Advance (3-5-31) বলেন,—The novel has a distinct propagandist stamp on it but the credit of this author lies in the fact that he has been able to combine artistic excellence with his mission.

আনন্দবাজার (১১-৮-৩৯) বলেন,—এই উপন্যাসে তরুণ দম্পতীর প্রেম ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং আনন্দ দান করে।